ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্ত-শাস্ত্রী

একাদশ সংস্করণ।

সারস্বত লাইব্রেরী
১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সন ১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠ।

—:*:—

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

প্রকাশক—

শ্রীরবীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সারস্বত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩, ডি নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদন

ব্রহ্মচারীর দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা দূরীভূত হইয়াছে। কৈশোর অতিক্রম না করিতেই বালকেরা শরীরের অপক্ক বীর্য্য ক্ষয় করিয়া, চিরজীবন বলহীন, বুদ্ধিহীন উৎসাহহীন ও চিররোগী হইয়া অশেষ ক্লেশে জীবনাতিবাহিত করিতেছে। দেশের অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ দুর্দ্দশা, আবার তাহাদের সন্তানগণ আরও দুর্ব্বল রুগ্ন হইয়া জন্মিতেছে। সংযম, সাধন, আনন্দ, মনুষ্যত্ব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এ সময় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবাহিত-জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়,—কেমন করিয়া তাহা হয় এবং বালকের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও অত্যাচারে অনাচারে যাঁহারা জীর্ণ দীর্ণ ও হতবীর্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মচারিগণের আশা পূর্ণ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

(উপন্যাস)			
পথের আলো	১॥০	জীবনযজ্ঞ	১৸০
সতীর পতিপূজা	২৲	বরবিনিময়	১।০
মিলন-মন্দির	২৲	স্বর্ণকুটীর	১॥০
সোণারকঙ্কণ (মকমলে বাঁধা)	১৸০	সেনাপতির গুপ্তরহস্য	১॥০
অগ্নিসাক্ষী	২৲	বৈরাগীর হাট	১॥০
বিনিময়	১॥০	প্রতিদান	১॥০
বিদেশিনী	১॥০	(যোগ ও ধর্ম্ম)	
যোগরাণী	১॥০	যোগতত্ত্ব বারিধি	২৲
ছিন্নমস্তা	১।০	প্রেততর্পণ	১॥০
সোণারকণ্ঠী	১৸০	দেবতা ও আরাধনা	১॥০
স্বপ্নসুন্দরী	১৲	জন্মান্তর রহস্য	১॥০
লুকোচুরী	১॥০	যোগ ও সাধন রহস্য	২৲
জাহানীরা	২৲	ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা	১॥০
কনক-প্রতিমা	১।০	রসতত্ত্ব ও শক্তি সাধনা	২৲
ভবানীর মঠ	১৲	পুরোহিত দর্পণ	২৸০
লোহার বাঁধন	১৸০	বাঁধাই	৩।০
ভৈরবী	৸০	প্রেততত্ত্ব	॥০
হেমচন্দ্র	১॥০	রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব	২৲
লাল পল্টন	১॥০	দীক্ষা ও সাধনা	১॥০
নরকোৎসব	১৲	সাধনা	১॥০
জনরব	১॥০	রাধাতন্ত্র	১॥০
		গৃহস্থের যোগ শিক্ষা	১৲

পথের আলো (উপন্যাস) জগতের সাররত্ন-বাঙ্গালীর মুখে মুখে এই পুস্তকের প্রশংসা। নূতন করিয়া কি বলিব? অজ্ঞানের দেব-মন্দিরে ভক্তির ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া তুলিয়া অজ্ঞানের অন্ধকার পথ আলো করিবে। ছাপা বাঁধা সব প্রথম শ্রেণীর, মূল্য ১৷৹ টাকা।

কাঙালিনী (উপন্যাস) সবে নূতন—বাহির হইল। ইহার সব নূতন—ভাব, ভাষা, চিন্তা ও ঘটনা-প্রবাহ—যেন স্বর্গ-মন্দাকিনীর পবিত্র বারি-ধারা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই পাঠ্য—পাঠে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ রস উপভোগ করিবেন। কাঙালিনীর করুণার্ত্ত স্বর বেহাগের রেসের মত প্রাণের কানে ছাপ রাখিয়া যায়। মূল্য ১৷৹ টাকা।

সতীর পতিপূজা (স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস) কামনা বাসনা শূন্য হইয়া রমণীগণকে কি প্রকারে শ্বশুর ভবনে সম্রাজ্ঞী হইতে হয় এবং স্বামী নিতান্ত বিপথগামী হইলেও প্রাণের কোন পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া তাঁহাকে নিতান্ত আপনার করা যায়, তাহা সরল তুলিকায় অঙ্কিত। অতি উচ্চ শ্রেণীর ছাপা কাগজ ও বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রতিদান (উপন্যাস) কামিনী ও কাঞ্চন—যদি প্রেমের সোহাগে প্রতিদান চাও, যদি স্নেহের সন্তানের মঙ্গল কামনা থাকে, যদি পত্নীকে মনের মত করিবার বাসনা হয়, তবে এই বই পড়। ছাপা বাঁধা কাগজ সব প্রথম শ্রেণীর, মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

দীক্ষা ও সাধনা (যোগ ও তন্ত্র—বিজ্ঞান ও মন্ত্র) শিষ্যকে মন্ত্র দিতে গুরুকে যাহা কিছু জানিতে হয়, আর মন্ত্র লইয়া শিষ্যকে যাহা কিছু করিতে হয়, তৎসমস্তই এই গ্রন্থে আছে। তদ্ভিন্ন যোগশিক্ষার অনেক বিষয় আছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই সন্ধ্যা, উপাসনা, আচমন তিলকধারণ জপরহস্য, পুরশ্চরণ মন্ত্রচৈতন্য, স্থির করা সমস্ত দেবতার ধ্যান, প্রণাম, স্তব, কবচ, বীজ ও বীজের অর্থ প্রভৃতি সব আছে। ষটচক্র ভেদ, সর্ব্বতোভদ্র মাতৃকা যন্ত্র, ঋণী, ধনী, ও রাশিচক্র দেবতার, বীজোদ্ধার, মন্ত্রের অর্থ—এক কথায়-এরূপ সংগ্রহ আর কোথাও নাই। মূ্য ১৷৹

ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচর্য্য কি?

শিষ্য। আমাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে হইবে।

গুরু। সুখের কথা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কথাটীমাত্র এখনও এদেশে বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মচারীর দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। যে জাতির যখন অধঃপতন-কাল সমাগত হয়, তখন তাহার মূল লইয়াই টানাটানি পড়ে। প্রাসাদ ভিত্তিহীন হইলেই পড়িয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের মহামহিম ভিত্তির উপরেই আর্য্যজাতির গৌরব-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল;—কিন্তু কালবশে সে ভিত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এই দিক্ দিয়াই আর্য্যের আর্য্যত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনকার এদেশের শিশু-শিক্ষা, তাহার দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যমাত্র। শিশুর বয়স পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতে, তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া, তাহার পিতার অবোধ্য একরাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ভার অর্পণ করা হয়,—বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহশিক্ষকের প্রবল তাড়নার মধ্যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখা হয়। কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া হয়ত দু'টি আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য—জ্ঞান নহে, চরিত্র-লাভ নহে, শারীরিক বলবিধান নহে, কেবল ছেলে বড় হইয়া সাহেবের বড় গোলামী করিবে—বড় বেতন পাইবে,— বড় লোক হইবে।

আর যুবকগণের দিকে চাহিতে হইলে চক্ষুর জল সংবরণ করা যায় না। যৌবনে বৃদ্ধ, শক্তিহীন, উদ্যম-অধ্যবসায়হীন—জীর্ণ দীর্ণ-শক্তি যাহার—উদর, প্লীহা-যকৃৎ-অম্ল ক্লেদে পরিপূর্ণ।

প্রৌঢ় জরা-জীর্ণ—স্থবির ও অকর্ম্মণ্য। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আর বড় কেহ জীবিতই থাকে না।

এ সকলের কারণ, গৌণভাবে আর কিছু থাকিলেও যে একমাত্র মুখ্যকারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, তাঁহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য—আমাদের দুর্ভাগ্য। বর্ত্তমানে দেশের সমস্ত বিষয়েরই উন্নতি করিবার প্রয়াস জনসাধারণের মনে উদয় হইয়াছে—কেবল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উদ্‌যোগই দেখা যাইতেছে না। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা না হইলে, কোন দেশের কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে নাই। ব্রহ্মচারী ভিন্ন, দেশের হউক, দশের হউক উপকার করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে আত্মোন্নতি লাভ হয় না। ব্রহ্মচারী না হইলে যোগী হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে স্মরণশক্তি,—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শান্তি ও সুখলাভ করিতে পারে না।

কিন্তু এ কথার আলোচনা নাই, এ বিষয়ের শিক্ষা-দীক্ষা নাই। তুমি যে আজি ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় শুনিতে চাহিতেছ, ইহাতে প্রীত হইলাম। তুমি এ বিষয়ে কি জানিতে চাহ?

শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্য কি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার উপকার কি, ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষার উপায় কি,—ইত্যাদি এতৎসম্বন্ধে বহু বিষয় জানিবার আছে,—আমি একে একে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গুরু। ভাল তাহাই হউক।

শিষ্য। প্রথম জিজ্ঞাস্য,—ব্রহ্মচর্য্য কি?

গুরু। শাস্ত্র বলেন ;—

বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্য শব্দে শুক্র, শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য প্রভৃতি বুঝায়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধ-সামর্থ্য সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। শরীরে যদি চরমধাতু বা শুক্র প্রতিষ্ঠিত থাকে,—বিকৃত না হয়, স্খলিত না হয়, বিচলিত না হয়, অটল অচল বা স্থির থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘ-জীবন লাভ হয়। চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়। রাগ-দ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়, কাম ক্রোধাদির হ্রাস হইয়া পড়ে।

শিষ্য। তাহা কি প্রকারে সংঘটন হয়? আমি সবিশেষরূপে অবগত আছি, অনেক লোকেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী,—কি করিয়া তাহা করিতে হয়, কি প্রকারে ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র—কিন্তু উপদেষ্টা পাওয়া যায় না, তাই হতাশের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মানবগণ মরণ-পথের পথিক হইতেছে। মুখে অনেকেই বলে, ব্রহ্মচর্য্যই ইহ পরকালের উন্নতিকর উপায় ; কিন্তু সে কার্য্য কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, তাহার প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি,—দয়া করিয়া এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। হাঁ, ব্রাহ্মণের কার্য্যই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করা। বেদবিৎ বৈদ্য শারীরিক রোগ চিকিৎসা করেন, বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন। যেখানে ব্রহ্মণ্য আছেন,—সেখানে ব্রাহ্মণত্ব

আছে, সেই স্থানেই ব্রহ্মচর্য্য আছে। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা না হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না—তাই সেকালে নবমবর্ষ বয়সে উপনয়ন দিয়া সন্তানকে ব্রহ্মচারী করিয়া গুরুগৃহে প্রেরণ করা হইত এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে, তবে সে সন্তান প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। যাহা হউক, এখন—এই দুর্দ্দিনে পুনঃ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। পতিত হতভাগ্য জাতির পুনরুত্থানের প্রয়োজন জ্ঞান করিলে—জীর্ণ দীর্ণ জাতির শারীরিক বলবিধানের আবশ্যকতা বুঝিতে,—সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠা লইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে বাঞ্ছা করিলে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন না করিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তুমিও বোধ হয় তাহা ভালরূপেই জান।

দেশে এখন স্বেচ্ছাচারের প্রবল রাজত্ব। আগে এদেশে সমস্ত নর-নারী ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত—মন্বাদি শাস্ত্রে অনুশাসিত ও দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানে পরিচালিত হইতেন, কিন্তু এখন সে দিন নাই। এখন সকলেই "দিশেহারা"—এখন অনেকেই আধুনিক স্বেচ্ছাচার মতাবলম্বী। ইহার ফলে দেশে মরণ-বিভীষিকা বাড়িয়া যাইতেছে,—নরনারী ক্ষীণশক্তি, হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। আবার এই সকল মানব-মানবী হইতে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিতেছে বা করিবে, তাহারা আরও ক্ষীণকায়, হীনবীর্য্য ও স্বল্পায়ুঃ হইবে। এইরূপে সত্বরেই যে ভারতভূমি জনশূন্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা চাই। পিতা মাতায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইলে

সন্তানে আদর্শ-ছায়া পতিত হইবে। পিতা মাতা যত্নপূর্ব্বক সে শিক্ষা সন্তানগণকে প্রদান করিবেন। ব্রহ্মচারী হইলে সে সন্তান দেশের ভরসাস্থল হইবে। ব্রহ্মচারী ব্যতীত কেহই স্বীয় চরিত্রের বলে দেশের ও দশের উপকার করিতে পারে না। হীনবীর্য্য ব্যক্তি কখনই কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে পারে না।

শিষ্য। এস্থলে আমার একটি কথা আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিলেন,—যখন এদেশের লোক মন্বাদি শাস্ত্রের অধীন ছিল, দশসংস্কারে সংস্কৃত ছিল, তখন ব্রহ্মচর্য্য ছিল, কিন্তু এখন স্বেচ্ছাচারী হইয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য প্রদেশের লোক অবশ্য মন্বাদি শাস্ত্রেরও অধীন নহে, দশসংস্কারেও সংস্কৃত নহে,—সে দেশের লোক তবে কি স্বেচ্ছাচারী? যদি তাহাই হয়, তবে কি তাহাদের মধ্যে কেহই ব্রহ্মচারী নহে? যদি না থাকে, তবে সে দেশের লোক দীর্ঘজীবী, কঠোর ব্রত এবং বলশালী হয় কি প্রকারে।

গুরু। বিলাতের লোক মন্বাদি শাস্ত্রের অধীন নহে, দশসংস্কারে সংস্কৃত নহে—কিন্তু তাহারা ধৃতবীর্য্য। যদিও সে দেশে স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত প্রবল, ব্যভিচার ও মাদকসেবনও অত্যন্ত অধিক,—কিন্তু আবার সেই মাদকসেবন ও ব্যভিচার নিবারণের যথেষ্ট উপায়ও আছে। সেখানে শত শত প্রতিভাশালী ব্যক্তি পাপাচার নিবারণে নিয়ত ব্রতী আছে। সহস্র সহস্র পুস্তকে বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল পুস্তক সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য। সেই জন্যই সে সকল দেশের যুবকেরা বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা সহজেই জানিতে পারে এবং জানিয়া সহজেই সতর্ক হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে সেরূপ পুস্তক

এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই,—অতি ক্ষুদ্র দুই একখানি পুস্তক যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও ঔষধ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনস্বরূপ।

শিষ্য। এদেশে পুরাকালেও কি এতৎসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই?

গুরু। হবে না কেন? তবে তাহা যোগ-সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কেননা, বীর্য্যরক্ষা কার্য্যটি সম্পূর্ণ যোগের উপরে নির্ভর করে। যদিও বিলাত প্রভৃতি স্থানে কেবল নৈতিক উপদেশে পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তথাপি তাহাতে ফল তাদৃশ উত্তম্ হয় না। আর যদি যোগের দ্বারা সাধনদ্বারা উহা সংরক্ষিত হয়, তবে ফল অতি উত্তম হয়। এদেশে পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম আশ্রম ছিল; সুতরাং বালক ও যুবকগণের পক্ষে অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্যক্ষয়ের সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আধুনিক এদেশীয় অধিকাংশ লোকেই দূষিত চরিত্র—কাজেই অধিকাংশ বালকই অধঃপতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার ঐরূপ দুশ্চরিত্র বালকের সংসর্গে অপর বালকও দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে; সুতরাং পাপের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকের চরিত্র বাল্যকালে দূষিত হওয়াতে শেষে পরিণত বয়সে অভ্যাসবশে চিরকালই দুষ্ক্রিয়ায় রত থাকে এবং অবশেষে নানাপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াও দুষ্ক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং অশেষ যন্ত্রণালয়ে দগ্ধ হইয়া মরে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে এ পাপ এদেশে ছিল না; সুতরাং ইহার অপকারিতা ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; তবে যোগশাস্ত্রে ইহার অপকারিতা ও ধারণের বা রক্ষার উপায় সুন্দরভাবেই লিখিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে বলেন;—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম। শিবসংহিতা।

"বিন্দুপাত হইলেই মৃত্যু হয়, বিন্দু ধারণ করিলেই জীবিত থাকে। অতএব যোগীরা যত্নপূর্ব্বক বিন্দু ধারণ করিবে।"

বিন্দু অর্থে শুক্র।

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥

শিবসংহিতা।

"বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়,—ইহা জানিয়া যোগিগণ নিয়ত বিন্দুধারণেরই অনুষ্ঠান করিবেন।"

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশোঽভবৎ॥

"যখন বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধি হয়? যার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার এতাদৃশ মহিমা হইয়াছে।"

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখদুঃখস্য সংস্থিতিম্।
সংসারিনাং বিমূঢ়াণাং জরামরণশালিনাম্।
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ॥

"জরা-মরণশালী বিমূঢ় সংসারিগণের, বিন্দুই সুখ-দুঃখের কারণ, অতএব যোগীদিগের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যোগ শুভকর হয়।"

সে যোগ শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের জন্য। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইলে তাহাই শিক্ষা করিতে হয়। আর্য্যগণ সন্তানদিগকে সে মহাশিক্ষা প্রদান করিতেন; তাই তাহারা শুক্রকে অটল, অচল ও অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিতে পারিত।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পাইয়া তদনুষ্ঠান করিলে, মানবগণ অকালমৃত্যুর

হস্ত হইতে রক্ষা পায়, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পাইয়া তদনুষ্ঠান করিলে, মানবগণ অকাল জরার হস্ত হইতে উদ্ধার পায়,—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পাইয়া তদনুষ্ঠান করিলে, মানবগণ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়,—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া তদনুষ্ঠান-কার্য্য করিলে, মানবগণ আত্মোন্নতি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ বা মোক্ষলাভে সক্ষম হয়।

ব্রহ্মচারী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, দীর্ঘজীবী ও নীরোগ হইয়া থাকে।

দেশ উৎসন্নের পথে যাইতে বসিয়াছে,—পুরুষ শক্তি হারা। যৌবনে বার্দ্ধক্য-যন্ত্রণায় পীড়িত, হীন ও দূষিত শুক্রোৎপন্ন সন্তান দিনে দিনে ভারতভূমি শ্মশানে পরিণত করিবে। দিনে দিনে ভারত নির্বীর্য্য ও মরণ-ভয়-ভীত ক্ষুদ্রকায় মানব-মানবীর আবাস-নিকেতন হইবে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না করিলে, আর নিস্তার নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মত।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, ইংরাজগণ শুক্র-রক্ষা ও শুক্র-ধারণ সম্বন্ধে অনেক হিতকথা বলিয়াছেন,—কে বলিয়াছেন এবং কিসে বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।

গুরু। বুঝিয়াছি, ইংরাজগুরুর মুখের কথা না শুনিলে তোমাদের আত্মতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চক্ষুর উপরে ভারতীয় নরনারীর যে অধঃপতন দর্শন করিতেছ, ইহাতেও কি বুঝিতেছ না যে,

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে? ইংরাজগণ এতৎ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, সে সকল পাঠ করিতে পারিবে। এস্থলে বিলাতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে শুনাইতেছি। কেন না, এ সকল বিষয়ে সাধারণ লোকের মত হইতে চিকিৎসকগণের মতই সমধিক আদরণীয়।

ইংরাজ ডাক্তার লুইস্ লিখিয়াছেন :—

All eminent Physiologists agree, that the most Precious atoms of the blood enter into the composition of the semen.

অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ সমস্ত শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শোণিতের শ্রেষ্ঠাংশ বা সারাংশই বীর্য্যরূপে পরিণত হয়।

এখন বুঝিয়া দেখ, পাশ্চাত্য সমস্ত শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে,—শোণিতের যাহা শ্রেষ্ঠাংশ বা সারাংশ, তাহাই বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণলোকেও দেখিতে পায়, রক্ত না থাকিলে মানুষ বাঁচে না,—কিন্তু রক্ত কি করে? না, তাহার সারাংশ দিয়া বীর্য্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া মানুষকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখে। আর সেই বীর্য্য যদি নষ্ট হয়, মানুষের থাকে কি?

প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিকল্‌স লিখিয়াছেন—

It is a Medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form elements of reproduction in both sexes In a pure and orderly life this matter is reabsorbed, it goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted it leaves him effeminate. weak and physically debilitated and prey to sexual irritation, disordered functions

morbid sensations disordered muscular movement, anb wretched nervous system, epilepsy. insanity and death,

The suspension of the use of the Generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual lifo.

অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে বা শারীরবিধান-শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, শোণিতের সারাংশই নরনারীগণের জনয়িত্রী-শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও নিয়মিত অর্থাৎ যিনি স্বেচ্ছাচারী বা ব্যভিচারী নহেন, তাঁহার শোণিতের সেই সারাংশ বা বীর্য্য শোণিতদ্বারা প্রবাহিত হইয়াই উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী সকল পুষ্ট করিয়া থাকে। ফলতঃ এই শুক্রই মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়কায়, ওজস্বী ও তেজস্বী উদ্যমশীল বা পরিশ্রমী এবং বীর্য্যবান্ বা বলশালী করিয়া থাকে। আর সেই শুক্রের অপচয় করিলে, মনুষ্য হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল ও চঞ্চলমতি বা অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া থাকে। যে বীর্য্যক্ষয় করে, তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীর-যন্ত্র সকলের ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম বা ব্যাঘাত হয়, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল বিকৃতি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণাদির শক্তি ক্ষীণ হয় (ইহাতেই পার্থিব সর্ব্ববিধ ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়)। মাংসপেশী সকলের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। স্নায়বিক যন্ত্র সকলও নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া যায় (এই জন্যই ধাতুদৌর্ব্বল্য বা নার্ভাস ডিবিলিটি নামক, যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ হয়) ও মূর্চ্ছা উন্মাদ প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু হয়।

* বীর্য্যধারণ করিলে শারীরিক ও মানসিক তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হইয়া সমধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ডাক্তার লুইস্ সেণ্টপল ও সার্ অইজাক্ নিউটনের উদাহরণ দিয়া লিখিয়াছেন ,—

She (nature) finds use for them all in buliding up a keener and nore vital and enduring nerves and muselcs.

অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী সেই রক্ত বিন্দুগুলি অর্থাৎ শোণিতের সারাংশ শুক্রবিন্দুগুলি দ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বিশিষ্ট মস্তিষ্ক এবং জীবনী-শক্তি পূর্ণ স্নায়ু পেশী সকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

ডাক্তার ক্যালিরেট লিখিয়াছেন :—

Debility of intellect and especially of the memory characterizes the mental allenation of the licentious.

অর্থাৎ ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, তদ্দ্বারাই তাহার মনের অধোগতি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এই তোমাকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত শুনাইলাম, কিন্তু ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা। ভারতের ঋষিগণ এতৎসম্বন্ধে যে সকল বিধি ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন—ভারতের নর-নারী ইহার যে প্রকার পুণ্যাদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতের কোন্ জাতি সে সকল তত্ত্ব এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কিন্তু হায়! ভূস্বর্গ ভারত নরকার্ণবে পতিত হইয়াছে। কত সহস্র বৎসরে আর্য্যসমাজে যে পুণ্য-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—অবসাদ হিমে তাহা গলিয়া চলিয়াছে,—যে স্বর্গীয় সমাজ গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সমাজ চূর্ণীকৃত ও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নন্দনকানন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কর্ত্তব্যজ্ঞান, এখানকার মনুষ্যত্ব, এখানকার ধর্ম্মানুশীলন সমগ্র জগতের আদর্শ ও অনুকরণীয় ছিল,—কালবশে, এখন ভারতবাসী অন্যদেশের "শুধু দুটি মুখের কথা" শুনিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের প্রয়াসী।

শুধু মুখের কথা এই জন্য বলিতেছি যে,—ভারতে যে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ছিল, যে কঠোরতা ছিল, অন্যদেশে তাহার শতাংশের একাংশও আছে কিনা সন্দেহ। তথাপি অন্য দেশে যাহা আছে, ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতম অধিষ্ঠান ভারতে এখন আর তাহাও নাই। ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে সমাজ-শৃঙ্খলার সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও বিলুপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচার স্থাপিত হইয়াছে। এখন আর পিতামাতার উপরে ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই। গুরুভক্তি দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, খুল্লতাত মাতুল এ সকল গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই,—আছে উশৃঙ্খলতা আর বাক্‌পটুতা। বালকগণ, অপরিণত বয়স্ক যুবকগণ ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে কোনও চিন্তা করিতে পারে না,—অথচ তাহারা স্বাধীন। কাজেই আপাত-সুখকর বিনাশের ঐ বিষাণ যন্ত্র বা মরণের হলাহল লইয়া রোগ-দীর্ণ ও অকালে কালকবলে পতিত হয়। আবার অপরপক্ষে পিতা মাতা বা গুরুজন বালকের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষাদানই তাঁহাদের সন্তানের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু যাহা শিক্ষা করিলে তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সাহস ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে,—যাহা শিক্ষা করিলে তাহারা নীরোগ ও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে;—যাহা শিক্ষা করিলে তাহারা নীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মবিৎ হইতে পারিবে, সে শিক্ষা দিবার দিক্ দিয়াও যান না।

এ দোষ তাহাদের যে অস্থিমজ্জায় গ্রথিত! তাহারা যে বীর্য্যক্ষয় করিয়া যৌবনে বৃদ্ধ সাজিয়া বসিয়া আছেন। রোগের লীলা-নিকেতন হইয়া আছেন! কিন্তু হায়! যে বিষে তাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়াছেন—যে আগুনে তাঁহারা পুড়িয়া অল্পদিনেই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন,—সে বিষ বা সে আগুন হইতে আপন আপন সন্তানসন্ততিগণকে রক্ষা করিবার কোন আয়োজন করেন না। হায়,

জানি না, কেন তাঁহাদের মনে হয় না যে, আমরা যে মহাপাতকের মহানলে দগ্ধ হইয়া যৌবনে বৃদ্ধ হইয়াছি—রোগের লীলানিকেতন হইয়াছি—অকালে মরণের পথে চলিয়াছি, কোন্ সাহসে আবার স্নেহের সন্তান সন্ততিগণকে সে মহাপাতকের পথ হইতে ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি না।

হায়, যে দেশের বালকগণকে নবম-বর্ষে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদিগকে তপস্যাবান্ গুরুসকাশে পাঠাইয়া সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা ও বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া, অবশেষে যথোপযুক্ত পরিণত বয়সে সমাবর্ত্তনানন্তর গার্হস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত করান হইত, এক্ষণে সেই দেশে, সে সকলের নাম গন্ধও নাই—আছে কেবল অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, আর বংশবৃদ্ধির পাশবিক ব্যবহার! ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যত কিছু উদ্‌যোগ আয়োজন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন না করা, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্মকৃত ও মহাপাতকের ফল।

শিষ্য। আপনি পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এতৎ-সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। আমি ঐ মহাপাতকের কুফল সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে চাহি।

গুরু। শুক্রধাতুই জীবের জীবন রক্ষার মূল কারণ,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই শুক্রধাতুর ক্ষয় হইলে যে, মানবের নানাবিধ রোগ ও

আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা আর সবিশেষ প্রকারে জানিবার কি আছে? তথাপি তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্য পুনরপি বলিতেছি,—ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ শুক্রক্ষয়ের কুফল অতি বিস্তৃতরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের মত এবং সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে হইলে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আরও বিশেষ কথা, তাহার কোন প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না। এস্থলে আমি তোমাকে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের শারীর বিধান পুস্তকের সারাংশ মাত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ডাক্তার কার্পেণ্টার, ক্লার্ক, লঙ্গেট, ফ্লোরেন্স, মেগণ্ডি. বাকন্ একটন্ রিচি, লেমার্ট, প্লেটিয়িয়স এবং রবার্টসন প্রভৃতি ভূয়োদর্শী ডাক্তারেরা এক বাক্যে বলেন যে,—"শুক্রক্ষয় দ্বারা শারীরিক ও মানসিক যে সমস্ত বিকৃতি জন্মে, তাহাকে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

১ম। মুখমণ্ডলে ব্রণ, শরীরের নানাস্থানে কণ্ডু (চুলকানি) ও স্ফোটক (ফোঁড়া) এবং শোণিতের বিকৃতি জন্য বিবিধ রোগ চক্ষুর পার্শ্বে নীলিমা, কপালের চর্ম্মের শিথিলতা ও সঙ্কোচ; শরীরের নানাস্থানে শিরার উদ্গম, শ্মশ্রুর বিরলতা, চক্ষু-নিমজ্জন (চোখ বসিয়া যাওয়া) মুখের কান্তি-নাশ ও বিবর্ণতা, স্বরের বিকৃতি।

২য়। সুপ্তি-স্খলন, পৃষ্ঠে ও মস্তকে বেদনা, স্মৃতি-ভ্রংশ ও দৃষ্টিক্ষীণতা, মল-মূত্র ত্যাগের সময় বীর্য্যক্ষয়, শুক্রোৎপাদক অণ্ডদ্বয়ের বিষমাকৃতি ও লম্বিত অবস্থা, অণ্ডের মধ্যে তীব্র বেদনা।

৩য়। শারীরিক শক্তির ক্ষয়, শারীরিক পরিবর্ত্তন-শক্তির ব্যাঘাত, নিদ্রাহানি সর্ব্বদা তন্দ্রা, আলস্য, অপস্মার (Hypochondria) বিমর্ষ, দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্রন্দন, হৃৎকম্প, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা, মূর্চ্ছিতা, মুখ হইতে চুণের মত লালা নিঃসরণ, কফ, জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস।

৪র্থ। মস্তকে, কক্ষে (পার্শ্বদেশে ও বগলে, মেরুদণ্ডে, কোমরে, পাকস্থলীতে ও অন্ত্রসমূহে এবং শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা, শরীরের কোন কোন অংশে স্পর্শানুভূতির অভাব অথচ সেই সেই অংশের আভ্যন্তরিক বেদনা।

৫ম। জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও শক্তিহীনতা, অত্যন্ত কারণে উপস্থের উত্তেজনা ও মল মূত্র ত্যাগের সময় শুক্র-স্খলন, প্রমেহ, কৃশতা, অণ্ডাদিতে অর্ব্বুদ (Tumour) জননেন্দ্রিয়ের অকর্ম্মণ্যতা।

৬ষ্ঠ। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বা পাথুরীরোগ (Stone) মলদ্বার হইতে তরল একপ্রকার দুর্গন্ধি পদার্থ নিঃসরণ, অর্শ, আমাশয় ও অতিসার প্রভৃতি উদরাময়।

৭ম। মনোবৃত্তিসমূহের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মনের চঞ্চলতা বিবেচনা শক্তির অভাব, বুদ্ধি-ভ্রংশ, ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা, অশান্তি ও বিরক্তি, আত্মগ্লানি, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, মনের ক্লেশে অশ্রুপাত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন, নিয়তভীতি।

বলা বাহুল্য, বীর্য্যক্ষয়কারী ব্যক্তিদিগের আত্মকৃত মহাপাতকের ফলে ও অবস্থার তারতম্য প্রথম হইতে সপ্তমাবস্থা ক্রমে ঘটিয়া থাকে।

উল্লিখিত চিকিৎসকগণের মন্তব্য প্রায় একই রূপ। তাঁহারা বলেন যে,—'জননেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি হইলেই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; সুতরাং মস্তিকের বিকৃতি ঘটিলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ ও পশুত্ব প্রাপ্তি হয়। মনুষ্যের মস্তিষ্ক ও জননেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণপ্রণালী অবেক্ষণ করিলে, অতি পামর নাস্তিকের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে। এমন বিচিত্র কৌশল ও সৃষ্টিনৈপুণ্য সৃষ্টির অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। যাহারা অনর্থক বীর্য্যক্ষয় করিয়া সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক ও

জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি সাধন করে, তাহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ও দুষ্কৃতি-পরায়ণ ঘোরতর পাপাত্মা জগতে আর নাই। জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিলে, রক্ত ও পাকস্থলী দূষিত হওয়ায় অতি কদর্য্য ও দুশ্চিকিৎস্য-রোগ সকল উৎপন্ন হয়; সুতরাং মনের সুখ শান্তি বিলয় পায়। তখন পৃথিবীতে জীবনধারণ করা কেবল নরক ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। তখন মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান হয় এবং সেই জন্যই অনেকে অসহ্য অনুতাপ দহনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আত্মহত্যা করে।"

উল্লিখিত ডাক্তার মহোদয়গণের পুস্তকসমূহে অনর্থক শুক্রক্ষয় জন্য বিস্তর রোগীর বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লেখা আছে; ডাক্তার মহোদয়গণ সেই সকল অনুতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের স্পষ্ট নাম প্রকাশ করেন নাই, অথচ লোক-শিক্ষার জন্য তাহাদের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তোমার অবগতির জন্য এস্থলে তাহার কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে কয়টি বিবরণ তোমাকে বলিব, তাহা ডাক্তার প্লেটিরিয়াস (Dr. Platerius) ও ডাক্তার লমার্ট (Dr. La'mert) এই উভয় চিকিৎসকের গ্রন্থ হইতেই বলিব।

১ম। জর্ম্মাণীর বার্লিন নগরে কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে অনর্থক শুক্রক্ষয় করিতে আরম্ভ করেন এবং যৌবনকালেই ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি বিবাহ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। সহবাস চেষ্টার সময় তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিত; তজ্জন্য উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতেন। উক্ত অবস্থায় ডাক্তার প্লেটিরিয়াস্ তাঁহাকে কতিপয় ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেন এবং স্ত্রীসহবাস করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তথাপি তিনি ঔষধের গুণ পরীক্ষার জন্যই হউক বা চিরাভ্যস্ত কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, বৃথা বিড়ম্বনা পরিত্যাগ করিতে পারেন

নাই,—তৎপরে একদিন তাঁহাকে ভার্য্যার বক্ষোপরি প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে যে, হঙ্গেরি দেশের একজন রাজাও (A king of the Huns) সঙ্গমকালে ভার্য্যাবক্ষেই প্রাণত্যাগ করেন।

(মহাভারতের পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন, মহারাজ পাণ্ডুও এইরূপে মাদ্রী-বক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর ন্যায় এ দেশে এখন কতশত ব্যক্তি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহার বিবরণ অবগত হইবার কি আছে?)

২য়। ইংলণ্ডের হন্টিংডন শায়ারে R,P. নামক একব্যক্তি বাল্যকালে তত্রত্য বিদ্যালয়ের এক যুবকের নিকট অনর্থক শুক্রক্ষয় করিতে শিক্ষা করেন। যুবক তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, এইরূপে শুক্রক্ষয় করিলে অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করা যায়। কিন্তু এই সুখের পরিণাম কিরূপ, তাহা বলে নাই। বালক ইহাতে ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক শুক্রক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়া, যৌবনের প্রারম্ভেই নানাপ্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্বীয় অবস্থার সম্যক্ পরিচয় দেওয়াতে ও চিকিৎসকের বিধানক্রমে চলাতে আরোগ্য লাভ করেন।

৩য়। L. D. নামক এক ব্যক্তি ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। সে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই অনর্থক বীর্য্যক্ষয় করিতে আরম্ভ করে। এই পাপাভ্যাসে সে এত আসক্ত হয় যে, দিবসের মধ্যে তিনবার শুক্রক্ষয় করিত। প্রত্যেকবারেই তাহার পেশীসমূহ অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত হইত; মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট এবং গলদেশ স্ফীত হইত! এইরূপে এক বৎসর গত হইলে, তাহার শক্তি একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইল। ইহাতেও তাহার চৈতন্য জন্মিল না। তৎপরে যখন তাহার জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইল,

যখন সে মানসিক বিবিধ বিকারে আক্রান্ত হইল, তখন চিকিৎসকের অধীন হইল; কিন্তু তখন তাহার নিম্নলিখিত রূপ অবস্থা হইয়াছিল; যথা;—

তাহার সর্ব্বদা মৃত্যুভয় হইত, উপস্থ ক্ষণিক উত্তেজিত হইলেই শুক্র নির্গত হইত। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। শরীরে সর্ব্বদা আক্ষেপ জন্মিত। সময় সময় সাত আট ঘণ্টাকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। কখন কখন গলদেশে তীব্র বেদনা অনুভব করিত এবং তজ্জন্য চীৎকার করিত। তাহার স্বর নিতান্ত কর্কশ হইয়াছিল। শরীরে কিছুমাত্র বল ছিল না। তাহার স্মৃতি-শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু সময় সময় গত জীবনের পাপানুষ্ঠান স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিত। তাহার শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছিল। মুখের দৃশ্য অত্যন্ত কদাকার হইয়াছিল। মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল। নাসিকা হইতে এক প্রকার অস্বাভাবিক বর্ণের শোণিত নিঃসৃত হইত। তাহার জীহ্বা স্ফীত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হইত। সে দুর্নিবার্য্য উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে শয্যাতে অজ্ঞাতসারে জলীয় মল ত্যাগ করিত। অন্ত্র হইতে অতি দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরিত হইত। তাহার চক্ষু জলপূর্ণ ও পলকবিহীন হইয়াছিল। নিশ্বাস ত্যাগের সময় সে সাতিশয় ক্লেশ অনুভব করিত। পদদ্বয় স্ফীত হইয়াছিল। তাহার মন অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। সে দুইটি বাক্য বলিতেও আয়াস বোধ করিত। সে অবশেষে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

৪র্থ। John H. De B. নামক কোন প্রচুর সম্পত্তিশালী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সম্ভ্রমসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু

তিনি যৌবনকালে কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন ;—তজ্জন্য তিনি সত্বর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তথাপি তিনি ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও অন্তঃসার-বিহীন হইয়া পড়িল। তাঁহার মানসিক শক্তিসমূহও নিস্তেজ হইল। তিনি কোনও গভীর বিষয় চিন্তা করিতে পারিতেন না ; তাঁহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তিনি অত্যল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি কখনও সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রা ভোগ করিতে পারেন নাই। সামান্য নিদ্রাবেশ আসিলেই নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিতেন এবং প্রায়ই সুপ্তি স্খলন হইত। তাঁহার মূত্রনালী (urethia) যৎপরোনাস্তি বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার ধ্বজভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে অত্যন্ত শোচনীয় যাতনাসমূহ ভোগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী এই হতভাগ্য যুবক কালগ্রস্ত হন।

ডাক্তার লেমার্টের নিকট চিকিৎসিত হইবার জন্য ক্ষীণবীর্য্য বহু-সংখ্যক রোগী আবেদন করিয়াছিল ; তন্মধ্যে একখানি আবেদন পত্র এইরূপ :—

মহাশয়, আমি আপনার রচিত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি যদি আমি আরও কিছুকাল পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে বোধ করি, আমাকে বর্ত্তমান সময়ের মত দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। আমি জঘন্য পাপের দাস হইয়া, এক্ষণে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এখন আমার শারীরিক ও মানসি ক্লেশের সীমা নাই। আমার চরিত্রের জন্য আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত রহিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমি লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকট পরিচয় দেই নাই, আপনার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনার নিকট স্বীয় অবস্থা বর্ণন করিতে ইচ্ছা

করিয়াছি, আপনার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই হেতু লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে আপনার নিকট আমার অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। ভরসা করি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে বিশেষ মনোযোগ স্থাপন করিয়া প্রতিবিধানের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

আমি ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় কোন কুসঙ্গীর নিকট কু-অভ্যাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার ঐ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিতাম,—পরে ক্রমশঃ উক্ত কু-অভ্যাস আমার মনের উপর এতাদৃশ আধিপত্য করিতে লাগিল যে, আমি দিবসে দুইবার শুক্রক্ষয় করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রিতে তিনবার শুক্রপাত করিতে চেষ্টা করি, দ্বিতীয়বারে অত্যল্প শুক্র নির্গত হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয়বারে কিছুমাত্র শুক্র নির্গত হয় নাই। সেইদিন হইতে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, আমি উক্ত কার্য্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু তৎপরে পাঁচ মাসের মধ্যে আমি স্ত্রী-সহবাস করিতে চারিবার চেষ্টা করিয়া কোনবারই কৃতকার্য্য হই নাই। প্রত্যেক বারেই শুক্র নিঃসরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু * * * * * আমি সুখভোগের আশায় তদ্রূপ চেষ্টা করি নাই। আমার জননেন্দ্রিয়ের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্যই তদ্রূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এক বৎসর হইয়া আসিল, একটি ধার্ম্মিক সুন্দরী যুবতীর সহিত আমার 'কোর্টসিপ' চলিতেছে। যদি বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে আমি কিরূপে উহার পাণিগ্রহণ করিব! এই জন্যই আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। বাহ্য দৃশ্যে আমার শরীরে কোন রোগের চিহ্ন কেহই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমার আভ্যন্তরিক দুরাবস্থার পরিসীমা নাই। সম্প্রতি আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ। আমি কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছি। তজ্জন্য আমাকে প্রত্যহ ৮।৯ মাইল ভ্রমণ

করিতে হয়। যদি আপনি আমার ব্যাধির প্রতিবিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে চিরজীবন আপনার নিকট বাধিত থাকিব।

ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণের গ্রন্থে উল্লিখিতরূপ রোগীর ও রোগের শত শত পরিচয় ও বিবরণ লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশের চিকিৎসকগণের গ্রন্থে সেরূপ বিবরণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার কারণ এইরূপ অনুমিত হয় যে, আমাদের দেশের রোগিগণ প্রায়শঃ কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হন না,— দেশের লোক দরিদ্র—সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ করিতে তথা হঠাৎ প্রাণনাশক ব্যাধি নিবারণার্থ চিকিৎসা ব্যয়-ভার বহন করিতেই তাঁহাদের অর্থ সঙ্কুলান হয় না,—কাজেই উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তারপরে এ দেশের চিকিৎসকগণের মধ্যে যাহারা ডাক্তার, তাঁহারা ইয়োরোপীয়দিগের পুস্তক অনুবাদ করিয়াই গ্রন্থ প্রণয়নকার্য্য সম্পন্ন করেন। এবং যাঁহারা কবিরাজ তাঁহারা সুশ্রুত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই গ্রন্থকার হয়েন। স্বাধীনভাবে—দেশের রোগ ও রোগের প্রকৃতি এবং রোগীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া কেহই পুস্তক প্রণয়ন করেন না; কাজেই দেশের লোকের সকল অবস্থাও তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইতে পারে না।

তবে যদি বলা যায়, আমাদের দেশে ঐরূপ মহাপাতক নাই এবং সেই জন্যই চিকিৎসকগণ গ্রন্থমধ্যে উহা লিপিবদ্ধ করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন হৃদয়-দ্বারে অনুসন্ধান করিয়া বলিবেন—এ মহাপাতক প্রত্যেকেরই হৃদয়ে বিদ্যমান। এই মহাপাতকেই প্রত্যেক ব্যক্তির সাহস, উদ্যম, স্মৃতিশক্তি, বাক্‌পটুতা, পুরুষত্ব এবং সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে;—এদেশের প্রত্যেক লোকই মহাপাতক-

বিধ্বস্ত স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্যের কত পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিতেছে, প্রতারকগণের প্রতারণাজাল-বেষ্টিত বিজ্ঞাপনের কুহকে পড়িয়া "মাদুলী, কবচ" প্রভৃতি ধারণ করিয়া হৃত-শক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু হায়! তাহাতে অর্থনাশ ও মনস্তাপ উভয়ই লাভ করিতেছে।

আমরা এই অনুসন্ধান ব্যাপারে পরিলিপ্ত হইয়া একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট এতৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে কয়খানি এইরূপ ;—

নাম প্রকাশ করিলে অবশ্যই পত্রলেখকগণ লজ্জিত হইবেন ; সুতরাং নামোল্লেখ করিব না।

১ম পত্র।—

"আমার বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। আমি যখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া এফ্ এ পড়ি, তখন নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক নানাবিধ উপায়ে শুক্রক্ষয় করিতাম। তারপরে ক্রমে ক্রমে আমার শুক্রপীড়া জন্মিয়া যায়। মস্তক সর্ব্বদা খালি বোধ হইত,—মনে উৎসাহ, উদ্যম, সাহস একেবারে ছিল না। আমি পীড়াক্রান্ত হইয়াছি ভাবিয়া পড়াশুনা পরিত্যাগ করিলাম। বাড়ী আসিয়া নানা প্রকারে চিকিৎসিত হইলাম,—রোগের উপশম হইল না। হইবে কি, তখনও আমার সে কু-অভ্যাস যায় নাই,—শরীর যে দিন একটু ভাল বোধ হইত, সেই দিনই পাপ-হৃদয়ে, পাপবাসনা প্রবল হইত। বাসনা জাগিবামাত্রই আমি শুক্রক্ষয় করিতাম—কিন্তু তখন ঐ পাপকার্য্যে কোনই আনন্দ ছিল না,—তথাপি কু-অভ্যাসের বশে উহা আমাকে করিতেই হইত। তারপরে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলাম, শুক্রক্ষরণের জন্য আমাকে আর কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না—মল-মূত্রের বেগে, হাঁচি কাসির বেগে, নিদ্রার সময়ে জলবৎ শুক্র নির্গত হইয়া যায়,—শরীরে সামর্থ্যমাত্র নাই। সর্ব্বদাই জরভাব—ক্ষুধা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

২য় পত্র।—

"জানি না, কোন্ অশুভ লগ্নে কুসঙ্গীর সহবাসে কু-অভ্যাসে রত হইয়াছিলাম; তাহার ফলে এখন আমি মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত। আশাভগ্ন, উদ্যম মাত্র নাই,—নিদ্রা না আসিতেই বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন আসিয়া আগেই মনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। যাহা অসময়ে অপব্যয় করিয়াছি, এখন সময়ে তাহা আর নাই। একটি বলিষ্ঠা ষোড়শী রমণী আমার স্ত্রী—সে পাছে সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, ইহাই আমার সর্ব্বদা ভাবনা। যদি কোন উপায় থাকে—এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যদি কোন ব্যবস্থা থাকে—এ জীবন্মৃত ব্যাধির যদি কোন ঔষধ থাকে,—ব্যবস্থা করিবেন।

৩য় পত্র।

"আমার বয়স সবে উনত্রিংশ বৎসর, কিন্তু এই বয়সেই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। শক্তি-সামর্থ্য ত নাই-ই অধিকন্তু অজীর্ণ ও অম্লরোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, বিবাহ করি নাই, করিবও না। বিবাহ করিয়া আর কি করিব,—যাহার জন্য বিবাহ করা, সে শক্তি আমার নাই।"

৪র্থ পত্র।—

"আমার ধ্বজভঙ্গ রোগ। বয়স বাইশ বৎসর। দ্বাদশ বৎসর হইতে আমি শুক্রক্ষয় করিতে আরম্ভ করি। অনৈসর্গিক উপায়েই একার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। আমার সর্ব্বদা এখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে, এক এক সময় বোধ হয়, আমি পাগল হইয়া গিয়াছি,—হাঁচি-টিকটিকীর শব্দে আমি চমকাইয়া উঠি—মনে সর্ব্বদাই ভয় লাগিয়াই আছে। সর্ব্বদা মাথা ঘোরে—কোষ্ঠে বায়ুপূর্ণ, ক্ষুধা নাই। ফলকথা, যদি ইহার চিকিৎসা না থাকে, সত্বরেই আমার মৃত্যু হইবে।

এই সকল কাহিনী পাঠ করিলে, সত্য সত্যই চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে;—আর মনে হয়, নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, বিষ্ণু-মন্দিরে দানবের আবির্ভাব হইয়াছে,—তাই যে দেশে বালক জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা হইত, আর এখন কুসঙ্গে কু-আমোদে তাহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে.—ইহা কেহ দেখিতেছে না, লক্ষ্য করিতেছে না। যে মহাপাতকের অনলে আপনি দগ্ধ হইয়া বজ্রদগ্ধ তরুর মত অবস্থান করিতেছি—সন্তান-সন্ততিগণকে ও আবার, সে পাপ-বহ্নিতলে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোগের কথা।

শিষ্য। শুক্রক্ষয়ে মানবের যে সকল অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা আপনি বিস্তৃতভাবে আমাকে বলুন। ইহাতে সমাজের সমূহ উপকার হইতে পারিবে। যাহারা ঐ মহাপাতকের কার্য্যে নিরত আছে, তাহারা সাবধান হইবে,—যাহারা কেবল কুসঙ্গে মিশিয়া ব্রতী হইতেছে, তাহারাও সাবধান হইতে পারিবে।

গুরু। আমি নিজে চিকিৎসক নহি, আমাদের দেশের কোন চিকিৎসকও এই মহাপাতকের বর্ণনা করেন নাই। দুই একজন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও অসম্পূর্ণ। কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার এতৎসম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন,—তাহার সার ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ ;—

কামেন্দ্রিয়ের অপরিমিত পরিচালন ও তন্নিবন্ধন অধিকতর শুক্রব্যয় হইলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয় ;— নানাপ্রকার উৎকট রোগের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব-বিহীন করে।

অপরিমিত স্ত্রীসংসর্গ, অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপতন এবং স্বপ্নদোষ অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় মনের চাঞ্চল্য হেতু শুক্র-নিঃসরণ এই তিন প্রকারে কামেন্দ্রিয়ের অপরিমিত পরিচালন হয়।*

বালকেরা যখন কুসঙ্গীর প্রবর্ত্তমান অনর্থ বীর্য্যপাত করিতে অভ্যাস

---

* ডাক্তার লেমার্ট বলেন "বহু পরীক্ষার পরে আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র সুপ্তিস্খলন হইলেই যদি শুক্রনিষ্ক্রমণের সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে তাহা হইতে যে ধ্বজভঙ্গ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা দুশ্চিকিৎস্য এবং তজ্জন্য দুর্ব্বলতা দুরপনেয়।"

করে, তখনই তাহাদের নির্দ্দোষ অবস্থা হইতে অধঃপতন হয়। পিতামাতা, অভিভাবক, গুরুজন ও শিক্ষকের নিকট তাহারা সলজ্জ হয়। কাহারও মুখের দিকে আর স্পষ্টভাবে চাহিয়া আলাপ করিতে পারে না। ইহাই পাপস্পর্শের প্রথম লক্ষণ।

কিছুদিন পাপ অভ্যাস করিলেই শুক্রমেহ (স্পার্ম্যাটোরিয়া) রোগের উৎপত্তি হয়। তখন প্রস্রাবের সহিত শুক্র নিঃসৃত হয় এবং স্বপ্নদোষ জন্মে,—কখন কখন মনের চাঞ্চল্যবশতঃ জাগ্রদবস্থায় দিবাভাগেও শুক্র স্খলিত হয়; তখন মন খিট্‌খিটে হয়। অল্প কারণেই মনে অসন্তোষের উদয় হয়;—সাহস কমিয়া যায়। ভীরুতা বৃদ্ধি পায়। নানাপ্রকারে কুচিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে। তখন কেহ অযথা অত্যাচার করিলেও অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সাহস না থাকায় ক্ষমাশীল হয়। কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেও পারে না। আপনার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে। প্রথমতঃ অধিক শুক্রব্যয় জন্য ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কিছুদিন অতিরিক্ত ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই পরিপাকশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং অপরিপাক জন্যই উদরমধ্যে বায়ু জন্মে এবং তজ্জন্য মন নিয়ত চিন্তাগ্রস্ত ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া থাকে; কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়া উদরে বেদনা জন্মে। তখন ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য উত্তেজক ঔষধ সেবন করিলেও সে অবস্থায় বিশেষ উপকার হয় না; বরং কোষ্ঠবদ্ধ রোগের বৃদ্ধি হয় এবং নিদ্রাবস্থায় অধিক পরিমাণে শুক্র-নিঃসরণ হয়;

পীড়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে, কপালে একটি দীর্ঘ দাগ হয়। কপালের চর্ম্ম শিথিল ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্থানে স্থানে শিরা সকল কুঞ্চিত হয়। অণ্ডকোষ মধ্যে কতকগুলি কঠিন গ্রন্থি দৃষ্টি হয়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় এবং মূত্রকোষ হইতে সমস্ত প্রস্রাব নির্গত হয় না।

তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কখন কখন কোষ্ঠ অত্যন্ত বদ্ধ হয় এবং মলদ্বার হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়।

ক্রমে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে। দাড়ি গোঁপ ও মাথার চুল পাতলা হয়। ক্রমে স্ত্রীলোকের স্বরের ন্যায় গলার স্বর হয়, কখন কখন শুক্রের সহিত রক্তও নিঃসৃত হয়,—প্রস্রাবগতি পাতলা ও পরিমানে অধিক হয়। ক্রমে পুরুষত্ব বিহীন হইয়া পড়ে, তখন কোন প্রকার চিকিৎসাই ফলপ্রদ হয় না। সুতরাং রোগী নিরাশ হইয়া কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে। হৃদয়-বিদারক চিন্তা আসিয়া তখন রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে। এই শোচনীয় অবস্থাকে ইংরাজী ভাষায় হাইপো-কন্‌ড্রিয়ান মলাঙ্কলি (Hyqochondrian Melancholy) বলে। ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী রোগ আর দ্বিতীয় নাই। শারীরিক যন্ত্রণা যতই ক্লেশপ্রদ হউক না কেন, এই মানসিক রোগের নিকট তাহা নগণ্য। এই অবস্থায় অনেকে বাতুল হয়, অথবা আত্মহত্যা করে।

ডাক্তার ডরুউইন তাঁহার প্রাণিতত্ত্ব (Loonsmie) নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিখিয়াছেন ;—

"কোন সম্পত্তিশালী ভদ্রলোককে একদিন শয্যাতে মৃত অবস্থায় দেখা গেল। তাহার মুষ্টিতে একটি পিস্তল আবদ্ধ ছিল। দর্শকগণ অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত ব্যক্তির শয্যায় একখণ্ড কাগজে এই কয়টি কথা দেখা গেল ;—আমার ধ্বজভঙ্গ হইয়াছে, আমি বাঁচিবার উপযোগী নহি।

অনেক রোগী লজ্জাবশতঃ চিকিৎসকের নিকটেও স্বীয় দুরবস্থার পরিচয় দিতে পারে না। পাছে অবজ্ঞাত হইতে হয়, এই ভয়ে অনেক রোগ গোপনে পোষণ করে এবং শীঘ্রই অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মরে।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হইলে দর্শন-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়,

এবং সন্তান-জনন শক্তি বিলুপ্ত হয়। ধারণা-শক্তি বা স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন করিলেও শুক্র নির্গত হইয়া মূর্চ্ছা বা মৃগী (Epilepsy) রোগেও অনেকে আক্রান্ত হয়। কখন কখন অতি ক্লেশদায়ক মেহ (Bastard Clap) রোগীকে আক্রমণ করে, তাহাতে মূত্র প্রণালীতে জ্বালা, বেদনা টাটানি উপস্থিত হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়।

কখন কখন নিম্নের অর্দ্ধাঙ্গের অবসন্নতা (পক্ষাঘাত Parplegia) উপস্থিত হয়।

অপরিমিত শুক্রক্ষয়ে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া অত্যন্ত বিকৃত হয়। রোগী স্মৃতিভ্রষ্ট, সদা অন্যমনস্ক ও কখন কখন উন্মাদ হয়। চলিতে গেলে গা ও মাথা টলে। উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে পারে না। সর্ব্বদাই বুক ধড় ফড় করে—যেন কঠিন হৃদ্রোগ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বদা ওষ্ঠ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়;—অত্যন্ত পিপাসা হয়। হস্ত, পদ চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা করে। গোলাপ জল প্রভৃতি ব্যবহার করিলে ক্ষণিক শান্তি হয়, —কিন্তু পরক্ষণেই ক্লেশ যেন দ্বিগুণ হইয়া পড়ে।

শুক্রক্ষয় করিলে শরীরের যেরূপ দুর্গতি হয়, মনের দুর্গতি তদপেক্ষাও অধিক হয়। মানসিক চিন্তা ক্লেশকর বোধ হয়, অথচ মন নিয়তই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকে। মনে সদাই ভয় উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ কোন বিষয় চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে। চক্ষুতে অন্ধকার দেখায়, চক্ষুর সম্মুখে দিবাভাগেও যেন তারা ভাসিতে থাকে। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আলস্য ও জড়তা আসিয়া শরীর ও মন যুগপৎ নিতান্ত অবসন্ন ও বিপন্ন করিয়া ফেলে। ধর্ম্মবুদ্ধি, বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদাসীনতা, পরোপকার প্রবৃত্তি কিছুই থাকে না। এ অবস্থায় মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপেই মনুষ্যত্ব হারায়।

অবশেষে বিষম অনুতাপে মন নিয়ত জর্জ্জরিত হয়,—কিন্তু অনুতাপ দ্বারা রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই।

শুক্রক্ষয় করিয়া মানুষ সজীব, সবল এবং কার্য্যক্ষম শরীর ও মন সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবেশিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ, ক্ষমা, দয়া, সংযমশক্তি, স্বাধীনতা, উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, ধৈর্য্য, বল, উৎসাহ, ঔদার্য্য প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সমস্ত অধিকার ও সমস্ত গুণেই একান্ত বঞ্চিত হয়।

মানুষের মনুষ্যত্ব হারাইবার—বল, বীর্য্য, আয়ু ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিবার একমাত্র হেতু শুক্রক্ষয়। শুক্রক্ষয় করিলে মানুষের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। শুক্র যাহাতে বিনষ্ট না হয়,—যাহাতে অবিচলিত ও অটুট থাকে,—প্রত্যেক মানুষের তাহা সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য। আরও বিশেষতঃ সন্তান সন্ততিগণের উপরে অভিভাবকগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহারা কিছুই জানে না—কিছুই বুঝে না—আপাত সুখাশয়ে সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। পুত্রের বয়স নয় বৎসর হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সকলেরই পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। সে শিক্ষা কি প্রকারে প্রদান করিতে হয়, আমি তাহাই তোমাকে বলিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধাতু-তত্ত্ব।

শিষ্য। শুক্রক্ষয়ে যে মানুষের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, একথা আপনার নিকট শ্রুত হইলাম; কিন্তু শুক্র বিনষ্ট হইলে কুঘটনা ঘটে কেন এবং এত অধিক রোগের উৎপত্তিই বা হয় কেন, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। জীবদেহ বর্দ্ধন ও রক্ষণজন্য দেহ মধ্যে সপ্তধাতু বিদ্যমান আছে। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্।
রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সাত পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যগণের দেহ ধারণ করে—তজ্জন্যই ইহাদিগকে ধাতু বলে।

এক্ষণে বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, মানব-দেহ ধারণের পক্ষে শুক্র কিরূপ প্রয়োজনীয়। মানুষ যাহা আহার করে, পান করে, গায় মাখে, আঘ্রাণ করে—সেই সমস্ত শরীর মধ্যে গিয়া প্রথমে রসের উৎপত্তি করে। তারপর রস হইতে রক্ত জন্মে—রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে তবে শুক্র জন্মে। ইহাতেই বুঝিয়া লও—শুক্র কিরূপ পদার্থ।

শিষ্য। চিকিৎসাশাস্ত্র ঐ সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু। চিকিৎসাশাস্ত্রও ঐ কথা বলেন। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

ভুক্ত-দ্রব্যের সারাংশকে রস বলে। সেই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। শুক্রের স্বরূপ কি?

গুরু। শুক্রের স্বরূপ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন :—

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবনাশ্রয় উত্তমঃ॥

শুক্র, সোমগুণাত্মক শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভবীজ, শরীরের সার (শ্রেষ্ঠাংশ) এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

শিষ্য। শুক্রের আশ্রয়-স্থান কোথায়?

গুরু। শাস্ত্র বলেন:—

"যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধের এবং গুড় যেমন ইক্ষু-রসের সর্ব্বতোব্যাপ্ত হইয়া থাকে, শুক্রও তদ্রূপ শরীরিগণের সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে।

উল্লিখিত সপ্তধাতুর সারস্বরূপ ওজঃ উৎপন্ন হয়। শার্ঙ্গধর এই ওজকে শুক্রের স্বরূপ বলিয়াছেন। যথা:—

ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থ স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্।
সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্॥

ওজোধাতু সর্ব্ব শরীরে অবস্থিত। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, শ্বেতবর্ণ সোমগুণযুক্ত এবং শরীরের বলকর ও পুষ্টিকর।

সুশ্রুত বলেন,—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুসমূহের যে পরম তেজোভাগ তাহাকে ওজঃ বলে। ওজঃ বলার কারণ। যথা:—

রসাদীনাং শুক্রান্তানং ধাতূনাং
যৎপরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলমিতি॥

বাগ্‌ভট বলেন :—

ওজশ্চ তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্‌।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহ-স্থিতি-নিবন্ধনম্‌॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টি-পুষ্টিবলোদয়াঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্‌॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজঃপদার্থ, তাহাই ওজঃ। হৃদয়ই ওজঃপদার্থের প্রধান স্থান হইলেও ইহা সর্ব্ব-শরীরব্যাপী। ওজঃ পদার্থের বৃদ্ধি হইলে তুষ্টি, পুষ্টি ও বলোদয় হয়। ওজঃপদার্থের নাশ হইলে সকলেরই মৃত্যু হয়। ওজঃ পদার্থ ই জীবনের অবলম্বন স্বরূপ। এই ওজঃ পদার্থ হইতে উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা (দেহের কান্তি ও শ্রী) প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাব বা গুণ উৎপন্ন হয়।

শুক্র হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ওজঃপদার্থ উৎপন্ন হয়;—সুতরাং বীর্য্যক্ষয় করিলেই যে ওজঃক্ষয় হয়, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহা উল্লিখিত হইল, বিবেচক ব্যক্তিগণের নিকট তাহাই যথেষ্ট। ইহার পরে বীর্য্যক্ষয়ের অপকার বর্ণনা করা নিতান্ত বাহুল্য মাত্র। যাহা বলা হইল, তাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণস্বরূপ শুক্রক্ষয় করিলে প্রাণের হানি হয়।

শিষ্য। শুক্রক্ষয় হইলে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, আপনি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা বল?

শিষ্য। যে সকল রোগ হয় বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা কি চিকিৎসকগণ ভূয়োদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, না নিদান-কথা?

গুরু। ভূয়োদর্শনই নিদান। তুমি বোধ হয়, আয়ুর্ব্বেদের নৈদানিক তত্ত্বের কথা বলিতেছ? আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যত কঠিন রোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তির কারণ প্রায়ই শুক্রক্ষয়। বলিতেছি শোন্ :—

অর্শরোগ,—

আয়ুর্ব্বেদ মতে অর্শ ছয় প্রকার। অর্শরোগের উৎপত্তির কারণ :—

প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অল্পাহার, তীক্ষ্ণ মদ্যপান এবং মৈথুন প্রভৃতি অর্শরোগের নিদান।

পাণ্ডুরোগ,—

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার। পাণ্ডুরোগ উৎপত্তির হেতু :—

ব্যবায়মম্লং লবণানি মদ্যং
মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্।

ইত্যাদি।

মৈথুন, অম্ল, লবণ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি পাণ্ডুরোগের নিদান।

রক্তপিত্ত,—

ঘর্ম্ম-ব্যায়াম-শোকাধ্ব-ব্যবায়ৈ-রতিসেবিতৈঃ।

ইত্যাদি।

আতপ, অতিশ্রম, শোক; পথশ্রম এবং মৈথুন ইত্যাদি রক্তপিত্ত রোগের কারণ।

রাজযক্ষ্মা,—

অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ॥

অতি মৈথুনপ্রযুক্ত রেতঃক্ষয় হইলে শরীরের সর্ব্বধাতুই ক্ষয় হয় এবং তজ্জন্য মানুষ শীর্ণ হইয়া পড়ে। এই ভীষণ রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর নিস্তার নাই। পার্শ্ববেদনা, হস্ত, পদের দাহ এবং সর্ব্বগত জ্বর ইহার লক্ষণ। ইহার চিকিৎসার সময় চিকিৎসক বিষম সঙ্কটে পতিত হন;—যে হেতু এই রোগে বমন বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা দেহ শোধন করা আবশ্যক। অথচ ক্ষয় রোগীর পক্ষে তাহা করাও বিপজ্জনক। কেন না—

শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবিতম্।
তস্মাদ্‌যত্নেন সংরক্ষেদ্ দক্ষিণো মলরেতসৌ॥

মনুষ্যের বল শুক্রায়ত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত বলিয়া ক্ষয়রোগীর শুক্র ও মল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এই কারণেই ক্ষীণশুক্র রোগীর চিকিৎসা করা কঠিন বলিয়া, চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং প্রায় সকল রোগীই চিকিৎসকের চিকিৎসায় পুনঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।

কাসরোগ—

পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।

ইত্যাদি।

বায়ু, পিত্ত, কফ, ক্ষত ও ধাতুক্ষয়, এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাসরোগ উৎপন্ন হয়।

স্বরভেদ,—

বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েণ চ।

ইত্যাদি।

বাতপিত্তাদি দ্বারা স্বতন্ত্র বা সান্নিপাতিক স্বরভেদ জন্মে এবং মেদ ও ধাতুক্ষয় জন্যও স্বরভেদ জন্মে। ধাতুক্ষয় জন্য যে স্বরভেদ জন্মে, তাহাতে বাক্‌রোধ পর্য্যন্ত হয়, সে রোগ অসাধ্য।

তৃষ্ণারোগ,—

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বা।

ইত্যাদি।

ভয় শ্রম ও বলক্ষয় দ্বারা তৃষ্ণারোগ জন্মে।

মূর্চ্ছারোগ,—

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বেগাঘাতাদভিঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ॥

ইত্যাদি।

ক্ষীণবীর্য্য ও হীনসত্ত্ব ব্যক্তি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়।

দাহরোগ—

ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ।
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ভৃশদারুণঃ॥

ধাতুক্ষয় জন্য দাহরোগে মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্ট হয়। ইহাতে অত্যন্ত আর্ত্ত হওয়ায় আশু মৃত্যুরও সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

বাতব্যাধি,—

রুক্ষশীতোল্পলঘ্বন্নব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।

রুক্ষ, শীতল, লঘু বা অত্যল্প পরিমিত অন্নভোজন এবং অতি মৈথুন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি কারণে বাতরোগ জন্মে।

ফল কথা, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রায় সমস্ত ব্যাধি-নিদান পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, শুক্রক্ষয় জন্য প্রায় সমস্ত রোগেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাতরক্ত, শূল, উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রক্ষত. অশ্মরী বিংশতি প্রকার মেহ, সোমরোগ, প্রমেহ-পীড়িকা, বিদ্রধি, ভগন্দর, উপদংশ, শূলদোষ, কুষ্ঠরোগ, বিস্ফোটক, মুখরোগ কর্ণরোগ, সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ, একাদশ প্রকার শিরোরোগ, প্রদর এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ নরক-যন্ত্রণাদায়ক দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগ সকল শুক্রক্ষরণেরই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। প্রাগুক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোন কোন রোগের নিদানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শুক্রক্ষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও বর্জ্জন-বিধিতে তদুল্লেখ বুঝিতে পারা যায়। নিদানের বর্জ্জন বিধিই চিকিৎসার উপায়। অতএব বর্জ্জন-বিধি দেখিয়াও নিদান বুঝিতে পারা যায়।

শুক্রক্ষয় যে যাবতীয় ব্যাধির নিদান; শুক্রক্ষয় হইতে যে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়, মরণের পথে অগ্রসর হয়, মনুষ্য নামের বহির্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সার এবং একান্ত সত্যস্বরূপ উপদেশ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাল্যজীবনের সাবধানতা।

শিষ্য। শুক্রক্ষয়ের এই ভীষণ পরিণাম অবগত হইতে পারিয়া, আমি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলাম। আপনার এই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেক বালক—যাহারা যৌবনের প্রথম সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে, তাহারা সাবধান হইতে পারিবে। আপনার এই সকল কথা শুনিতে পাইলে ও ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাহারা সাবধান হইবে এবং পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবে।

গুরু। শ্রীভগবান্ তোমার আশা পূর্ণ করুণ। তুমি বোধ হয় মহাভারতে পাঠ করিয়াছ, বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বার্ত্তা কি, আশ্চর্য্য কি, পথ কি, আর সুখ কি? প্রজ্ঞাবান্ যুধিষ্ঠির ঐ চারিটি প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

প্রত্যহ প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত, হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যাহারা জীবিত থাকিতেছে, ভাবিতেছে—আমরা বুঝি চিরকালই বাচিয়া থাকিব,—ইহার পরে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

আমাদের দেশের কিশোর-বয়স্ক বালক বা যুবকগণের সম্বন্ধেও ঐ কথাটি খাটিতেছে। তাহারা দেখিতেছে শুনিতেছ—তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষেরা বীর্য্য ক্ষয় করিয়া কি প্রকার দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে,—কি

প্রকার রোগের আকর হইয়া পড়িয়াছে—দেখিয়া শুনিয়া তথাপি তাহারা নিবৃত্ত হইতেছে না—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! আমার বোধ হয়, প্রবল কামই তাহাদের জ্ঞান ও সাহসকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

বালকগণই আমাদের আশা ভরসাস্থল। তাহারা বল, বীর্য্য, সাহস, স্বদেশ-হিতৈষণা, পরোপকার, প্রবৃত্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, পবিত্রতা ও দীর্ঘ-জীবন প্রভৃতি লাভ করিলে, তবেই আমাদের সমাজ আবার মনুষ্য সমাজ নামে অভিহিত হইতে পারিবে। কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই,—আর্য্য সমাজে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ছিল,—আর্য্যগণ সন্তানের নবমবর্ষ বয়স হইলে, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবিষ্ট করাইয়া, তবে গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইতেন। গুরু ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার বিষয়ে সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন, মুক্ত বাতাসে, খোলা প্রান্তরে তাহাদিগের কৃষি ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যখন দেখিতেন, ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাহাকে বেদাদি অধ্যয়ন করাইতেন। ধৃতবীর্য্য ছাত্র স্মৃতি-শক্তি-মণ্ডিত, কবিত্বরসে আপ্লুত ও পূর্ণস্বাস্থ্যে অভিষিক্ত থাকিত,—তখন তাহারা অতি অল্প দিনে—অতি অল্প সময়ে, অধীত বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত এবং অধীত বিষয় অভ্যস্ত করিতেও সময় নষ্ট হইত না। তারপরে তাহারা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিত এবং প্রজা সৃষ্টি করিত ও দেশহিতকর কার্য্যে নিষ্কামভাবে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিতে অবসর প্রাপ্ত হইত।

আর বর্ত্তমান সময়ে পিতামাতা সন্তানগণকে অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যাধ্যয়ন করানকেই আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ সীমা বলিয়া জানেন। মানুষকে যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করান যায়, সে শিক্ষা এখন আমাদের বালকগণ প্রাপ্ত হয় না। পিতামাতা তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না, স্কুলের শিক্ষকগণ অর্থকারী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত,—

বালকগণ কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া কদাচার ও কুব্যবহারে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেইজন্যই তাহারা অল্প বয়স হইতে প্রণয়-গাথা প্রণয়লীলাময় গ্রন্থপাঠ থিয়েটার দেখা প্রভৃতি ব্যসন-বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অল্প বয়স হইতেই ইন্দ্রিয়চালনা করিতে অভ্যস্ত হয় এবং তাহার ফলে যৌবন না আসিতে আসিতেই জীর্ণ-শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যৌবনে পদার্পণ না করিতে করিতেই কিশোর বয়স্কগণ এক মহা-পাতকের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা শুক্রক্ষয় করিয়া আত্মহত্যার আয়োজন করিয়া বসে। এ মহাপাতকে পাতকী নহে, এমন লোক বর্ত্তমানে অতি কম। কিন্তু কতদিন এ মহাপাতক হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; তবে অনুমান করা যাইতে পারে, যত দিন হইতে পুণ্য ব্রহ্মচর্য্য সাধনা হিন্দু-সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,— তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতেই এই মহাপাতক হিন্দু-সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। এখন ইহার পূর্ণ ও প্রবল প্রতাপ। এই রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় এখনও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা।

দেশের যুবকদিগের দিকে চাহিয়া দেখিলে, বাস্তবিকই চক্ষুতে জল আসে,—হৃদয়ে নিরাশার গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া বসে। স্বীকার করিতে হয় যে, দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানের নবীন উষা প্রকাশ পাইয়াছে—দেশের লোক-হৃদয়ে অনেক সুভাব-আশা সকল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে —দেশের লোক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, বক্তৃতা করিয়া হৃদয়ের অনেক উচ্চ আশা প্রকাশ করিতেছেন;—কিন্তু কাজ হইতেছে না। কাজ করিবে কে? জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার বাঙ্গালী আকণ্ঠ অম্লজীর্ণ ক্লেদ প্রভৃতিতে পূর্ণ, উদর প্লীহা-যকৃতের লীলা নিকেতন! উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে, আলস্য, জড়তা, মানসিক চঞ্চলতা ইহাদের সর্ব্বদা জাগিয়া আছে, কাজ করিবে কে? দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ে

দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অধ্যবসায় চাই এবং তাহার জন্য দেশের লোকের পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর তাহা নাই। কেন নাই, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে,—ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠার অভাব।

অনেকে বলেন,—ম্যালেরিয়ার জন্যই এদেশের লোকের এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে; একজন মিতাচার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া দেখ,—একজন ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হিন্দু-বিধবার পবিত্র জীবনের দিকে চাহিয়া দেখ,—দেখিবে, তাঁহারা কেমন নীরোগ ও দৃঢ়কায়।

যদিও দেশে ম্যালেরিয়া মৃত্যুর প্রধান দূত স্বরূপ বিচরণ করিতেছে, তথাপি ব্রহ্মচারীর নিকটে সে পরাভূত। কর্ষিত ভূমিতে বীজাঙ্কুর শীঘ্রই উপ্ত হয়, পাষাণে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা কখনই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বাদিসম্মত কথা। ব্রহ্মচর্য্য-পালনে দেহ দৃঢ় রক্ত পরিশোধিত ও সবল এবং দেহস্থ পেশী, শিরা ও কৈশিকা প্রভৃতি দৃঢ় ও সুস্থ থাকিলে, সে শরীরে ম্যালেরিয়াদির বীজ সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; প্রবিষ্ট হইলেও পাষাণে প্রক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

মানবজন্ম দুর্ল্লভ জন্ম। এ জন্মে অনেক সাধনা হয়,—অনেক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়,—কিন্তু ক্ষণিক সুখের জন্য সে কর্ত্তব্য, সে কীর্ত্তি, সে দায়িত্ব বিনষ্ট করা মানুষের কখনই উচিত নহে।

মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ দৃঢ় করা। তৎপরে উচ্চবৃত্তি সকলের অনুশীলন দ্বারা মরত্বে অমরত্ব লাভ করা। এ শিক্ষা, এ দীক্ষা, পিতা মাতা নিজে গ্রহণ করিবেন এবং সন্তানসন্ততিগণ যাহাতে সম্যক্-প্রকারে ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করে, তাহার চেষ্টা করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের অধিকারী।

শিষ্য। শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, মানব মাত্রকেই তিনটি দায়িত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মানবের অদৃষ্টসঞ্জাত গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ—এই ত্রিবিধ দায়িত্ব বিজড়িত হয় এবং এই ত্রিবিধ দায়িত্বের মধ্যেই জগতের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন, উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির সংজ্ঞা নিহিত আছে। ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা ঋষিগণ, সুতোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রাদিকে আবার ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য নিষেধ করা হইয়াছে, কেন? যদি তাহারাও মানুষ,—তাহারাও ত্রিবিধ ঋণে (দায়িত্বে) আবদ্ধ, তবে তাহারা তদনুষ্ঠান করিয়া ঋণের দায় হইতে মুক্ত না হইবে কেন? বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালনে যখন মনুষ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ হয় এবং না করিলে সর্ব্ব বিষয়ে অবনতি হইয়া থাকে, তখন শূদ্রাদি সে মহৎ কার্য্যে বঞ্চিত থাকিবে কেন?

গুরু। না না, শূদ্রাদিকে কোন সাধনাতেই বঞ্চিত করা হয় নাই। ত্রিবিধ ঋণ কি, তাহা তুমি উত্তমরূপে অবগত আছ কি?

শিষ্য। আজ্ঞা না, কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। সম্প্রতি আমি "যোগী যাজ্ঞবল্ক্য" নামধেয় পরম উপাদেয়

যোগশাস্ত্র গ্রন্থের যে বাংলা টীকা করিতেছি। তাহাতে এ বিষয় লিখিত হইয়াছে। তোমার অবগতির জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গাধীন কথাটা তাহা হইতে বলিতেছি, শোন :— "

মানবমাত্রেই দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিনটি ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে,—অর্থাৎ মানব জন্মগ্রহণ করিলেই ঐ তিনটী ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণ মানবাত্মাকে তাহার উন্নীত জন্মলাভের জন্য—প্রজ্ঞা-সাধনের জন্য যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহারই পরিশোধার্থ নিজ নিজ বর্ণোচিত আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণ, সুতোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। জীবনের তিনটি আবরণ আছে—তাহা অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষনামে প্রসিদ্ধ। অন্নময় কোষ আমাদের আহার্য্য অন্ন (যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভূলোকের দৃশ্য অংশের ন্যায় কঠিন, তরল ও বায়ব্যাণু দ্বারা গঠিত। অন্নময় কোষের নামান্তর স্থূল দেহ। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় যন্ত্র সমুদায় স্থূল দেহেই বর্ত্তমান। ঋষিগণের দ্বারা ইহার উন্নীত অবস্থা বা ক্রমপরিবর্ত্তন হইয়াছে—ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা সে ঋণের পরিশোধ হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও শুক্রধারণ অভিন্ন। শুক্র শ্রেষ্ঠ ধাতু। শুক্র অবিচলিত ও অবিকৃত থাকিলে মানুব দৃঢ়কায় ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; বুদ্ধি অধ্যবসায়, একাগ্রতা প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে; এক কথায় মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। ঋষিশক্তি সেই উন্নত অবস্থা প্রদান করিয়া মানুষকে মানুষ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন পূর্ব্বক সে শক্তি সঞ্চার করিয়া ঋষিশক্তির নিকট সে শক্তি পরিশোধ করিতে হয়। অতঃপর প্রাণময় কোষ ও পিতৃগণের কথা।

প্রাণময় কোষ ভূর্লোকে অদৃশ্যাংশের ন্যায় ব্যোমপদার্থে গঠিত। প্রাণই জীবনশক্তি। বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক, ও তড়িৎশক্তি-সমুদায় ইহারই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু জীবনীশক্তিতে তদ্ব্যতীত আরও কিছু আছে,— এই কোষদ্বয় ভূর্লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মানব পিতৃ-শক্তি লইয়াই মানব হইয়াছে—অর্থাৎ পিতৃশক্তিতেই মানুষ তাহার জীবনীশক্তি; বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক, ও তড়িৎশক্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা পিতৃশক্তিকে পুনরায় প্রদান করিতে হইবে,—তাই পুত্রোৎপাদন করিয়া সে শক্তির দায় বা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়। মানব জগৎ হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে; তাহা ফিরাইয়া না দিলে, সে শক্তি বলে তাহাকে আকর্ষণ করিবে—বিকর্ষণ করিবে, পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করাইবে। অনন্তর মনোময় কোষ ও দেবঋণের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মনোময় কোষ দুইভাগে বিভক্ত। উহার মধ্যে ঘনতর অংশ ভূর্লোকের সহিত সম্পর্কযুক্ত,—তাহাতে কামনাসমূহ অবস্থিত। সূক্ষ্মতর অংশ স্বর্লোকের সহিত সম্পর্কিত—তাহা ভাব ও ভাবনার ক্রীড়াভূমি।

যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয়। যজ্ঞের প্রধান কার্য্য অর্পণ বা নিবেদন। পরের নিমিত্ত আত্মত্যাগ বা আত্মতর্পণই যজ্ঞ,—এই সৃষ্টি-কার্য্যই প্রথম যজ্ঞ বা ত্যাগ কার্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য অনন্ত ঈশ্বরকে ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ।" যে দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞদ্বারা ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তাহারই নাম কর্ম্ম। ভূত পদার্থে আবদ্ধ হওয়ার নাম আধ্যাত্ম-ভাষায় মৃত্যুশব্দে অভিহিত হয়,— সুতরাং ঈশ্বর আত্মত্যাগরূপ যজ্ঞদ্বারা আপনার অংশকে বহুত্ব প্রদান পূর্ব্বক জীবসমূহ কল্পনা করিয়া প্রকৃতির আবরণমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম প্রকৃতির বহুমূর্ত্তির আবির্ভাবঃ হইয়াছে। এই প্রথম

যজ্ঞ,—ইহাই যজ্ঞবিধির মূল। ইহারই দ্বারা আমরা যজ্ঞের বা ত্যাগের প্রকৃত অর্থ অনুভব করিতে পারি। পরের জন্য নিজের প্রাণাহুতিই যজ্ঞ। দেবসত্তা মানবেতর জাতিতে নাই, মানবে আছে;—তাই মানব দেবগণের নিকট ঋণী। সে ঋণ, যজ্ঞ বা আত্মত্যাগের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়।

শূদ্র কেবল তমোগুণান্বিত বলিয়া কোন কোন স্থলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য-বিধি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহা বিশেষ বিধি নহে,—অতি সাধারণ। বিশেষবিধি শূদ্রেরও আত্মসংযম বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিকল্প বিধির উদ্দেশ্য এই যে, শূদ্রাদি তমোমলিন—যাহারা তমোলিপ্ত তাহারা কেবল ব্রাহ্মণাদির সত্ত্বগুণের সাহায্যে উৎকর্ষ লাভ করিবে,—আর যাহারা উন্নত গুণাশ্রিত, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম আচরণে নিযুক্ত হইবে।—সঙ্গগুণে যে একে অপরের ধর্ম্ম ও স্বভাব অনুক্রামিত হয়, এ কথা বোধ হয়, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই স্বীকার করিবে।

অতএব শূদ্রের পক্ষে যে স্থলবিশেষে ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল অত্যন্ত অজ্ঞানের জন্য—জ্ঞানবানের জন্য নহে। খুব নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বা শূদ্র জাতি,—যাহাদের কোনরূপ আত্মজ্ঞান বা দায়িত্ব বোধ নাই,—সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা-দীক্ষা শূন্য; তাহারাই উচ্চশ্রেণীর জাতির সেবাদি-রূপ সঙ্গ করিয়া জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবে; আর সকলেই—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের উন্নতি করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য।

শিষ্য। আপনি কি তবে বলিতে চাহেন, বিবাহ করিয়াও সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা যায়?

গুরু। হাঁ, বিবাহিতজীবনে নিশ্চয়ই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন হইতে পারে। তুমি কি মনে কর, বিবাহের পূর্ব্বে যে পুণ্যময়, কল্যাণময় ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে হয় এবং এইরূপ করিবার জন্যই কি সে স্বর্গীয় শিক্ষা—সে পবিত্র দীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল? ব্রহ্মচর্য্যজীবনে যাহা শিক্ষা—বিবাহিত-জীবনে তাহার ফলভোগ। তবে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি এবং তোমার মত অনেকেই একথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যাইবে। কেন না, ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে সহবাস পরিত্যাগ করা, অথবা কামরিপুকে বশীভুত করা। ব্রহ্মচারী কথাটা "সহবাস পরিহার করা" এইরূপ সহজে বুঝিতে পারা যায় এবং সকলেই এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন। কথাটাও উহাই।

কিন্তু বিবাহিত-জীবনে তাহা হইবে কি প্রকারে? এ আশঙ্কা স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমি তৎসম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিতে চাহি;—প্রনিধান করিয়া শুনিয়া যাও।

জগতের একটা সৃষ্টি-প্রবাহ আছে। সকলেই কিছু বনচারী সন্ন্যাসী সাজিয়া, গায়ে ছাই মাখিয়া থাকিলে সৃষ্টি-প্রবাহ চলে না। আর আপনার মুক্তি কামনায়—আপনার উদ্ধার মানসে সংসারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া—সমাজের হিতসাধনারূপ মহান্ কার্য্যভার ছাড়িয়া দিয়া, অরণ্য-প্রান্তে জীবন কাটানও সকলের কর্ত্তব্য নহে।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম মনুষ্য-জীবনের সারধর্ম্ম। পরিণীতা সহধর্ম্মিণীর সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সন্তান-উৎপাদন সন্তান প্রতিপালন, সন্তানের সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করাই মনুষ্যের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে—আমাদের নীতিশাস্ত্রে এই সকল কর্ত্তব্যপন্থা, এই সকল উপায় অতি পরিষ্কৃত ও সরলভাবে লিখিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সকল নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া দীর্ঘজীবী, দৃঢ়কায়, মেধাবী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সৎসাহসী ও উৎকৃষ্ট সন্তানের জনক ছিলেন। আর এখনকার দিনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ও উপদেশ প্রদান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের সমাজের এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়গণেরও বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের সহবাস সম্বন্ধে অতিশয় ভুল ধারণা থাকায়, যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন, অথবা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দুই একটি শিক্ষা ও সতর্কের কথা বলা, বোধ হয়, অপ্রকৃত হইবে না।

স্ত্রী-পুরুষের সহবাস-সম্বন্ধীয় বিষয়টি অত্যাবশ্যক হইলেও ভদ্রতা-বিগর্হিত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সহবাস-কার্য্যে অতিশয় দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের গোচরে প্রকৃত এবং প্রাচুর্য্যভাবে কদাচিৎ আনয়ন করা হয়। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত থাকিয়া এই বিষয় যেরূপে সংঘটিত হয়, জীবনে অন্য কার্য্য কচিৎ সেরূপে সংঘটিত হয়। পশুপালকগণও সহবাসের উপযুক্ত করিয়া শিশুদিগকে প্রস্তুত করেন। তাঁহারা দেখেন যে, (স্ত্রী পুরুষ) পশু দুইটি উত্তম

বল ও স্বাস্থ্য পাইয়াছে এবং উত্তম আহার পাইতেছে ও উভয়ের মধ্যে কেহই অতিশয় পুষ্ট নহে, কিংবা কেহই শীর্ণ নহে এবং উভয়ের কোন পীড়াদি নাই ; ইত্যাদি।

মানুষের সে জ্ঞান আছে, কিন্তু নিজেদের বেলা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে সম্পূর্ণ তাচ্ছল্য পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ জ্ঞানরাজ্যে শ্রেষ্ঠ জীব ; মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতাদ্বারা শোভিত, কিন্তু মানুষ কি পশুদিগের সন্তানের চেয়ে আপন সন্তানদিগকে কম ভালবাসেন ? সমস্বরে সকলেই বলিবেন, কখনই নহে। আপন আপন সন্তানকে সকলেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। প্রাণ দিয়াও সকলে আপন সন্তানের কল্যাণকামনা করিয়া থাকে। আমি বলিতে পারি না, মানুষ যদি সন্তানকে ভালবাসিত— তবে আপনার সামান্য কাম-বৃত্তির ক্ষুধা নিবারণের জন্য সন্তানগণকে অন্ধ, খঞ্জ, বাতুল, দুর্ব্বল পীড়াগ্রস্ত ও অমেধাবিরূপে জন্ম দান করিত না। যে কার্য্যে তাহার সৃষ্টিধর জন্মিবে সে কার্য্য এমন তাচ্ছল্যভাবে, পাগলের মত সম্পাদন করা হইত না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই এই তাচ্ছল্য এই অজ্ঞতা নিশ্চয়ই অতিশয় ঘৃণাজনক এবং লজ্জাকর। এইরূপ একটি অবিবেচনার কার্য্যে যে কুফল উৎপন্ন হয় এবং তাহার জন্য সন্তানদিগকে অসীম শাস্তিভোগ করিতে হয়, তাহার প্রকৃত জ্ঞান থাকা একান্ত ও সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়।

আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন অথবা অমান্য করিলে, প্রকৃতিদেবী সর্ব্বসময়ে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন,— কখনই ক্ষমা করেন না। জীবজগতে কর্ম্মশক্তি বিনষ্ট হইবার নহে,— কর্ম্ম করিলে, তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। সুকর্ম্ম করিলে সুফল, এবং কুকর্ম্ম করিলে কুফল ভোগ করিতে হইবে।

সহবাসবিষয়ক বিধিসম্বন্ধে আমাদের আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য

চিকিৎসাশাস্ত্রে তারস্বরে বারংবার হিতকথা বলিয়া আসিয়াছেন,—কিন্তু আমরা বধির! তাই আজি জগতের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই দেখিবে—জড়, উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, মেধা ও শক্তিহীন সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। সে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আর জন্মিতেছে না। সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সে বাল্মীকি, বেদব্যাস, সে ভীম, দুর্য্যোধন,—অধিক কি, সে শিবাজী, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস,ভবভূতিও জন্মগ্রহণ করিতেছে না। যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিতেছে না। আসিতেছে না, ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়া। তোমরা আবার সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হও—এই ব্যাপারে বিশেষ এবং প্রগাঢ়ভাবে মনোযোগ প্রদান কর। ত্রিকালদর্শী মহান্ ঋষিদিগের সন্তানসন্ততিরূপে এবং কার্য্যতঃ মনুষ্যসমাজের হিতার্থিরূপে তোমরা এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান-বিস্তার করিতে বাধ্য হও।

আমি সমাজের হিতার্থে এ সকল কথা তোমাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছি এবং হিন্দুর প্রধান অবলম্বন ও আশ্রয় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল কথা বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, কিন্তু এতৎসম্বন্ধীয় শরীরতত্ত্ব এস্থলে বলা সবিশেষ প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম না। কারণ,তাহা হইলে এই গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যাইবে,অধিকন্তু পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আভাষও প্রদত্ত হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে, শরীরবিজ্ঞান (Anatomy) এবং জীবতত্ত্ব (Physiology) নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট এবং বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে যে, স্ত্রীসহবাস দ্বারা স্ত্রীলোকের জরায়ুতে পুরুষের বীর্য্যদ্বারা গর্ভাবস্থা হয় এবং তাহাই প্রকৃত ও স্থির বিষয়। বীর্য্যকণিকাসম্বন্ধে একটী বিষয় বিশেষভাবে তোমার জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য; যথা—রক্তবাহিকাযন্ত্রের (Nerve) কণিকার সহিত ইহার সাদৃশ্য বর্ত্তমান। প্রকৃতিতে উভয়ে শরীর-সম্বন্ধে শাস আঁঠি (nuclic and nucleoli) ধারণ করে এবং উভয়ের শস্যাদি হইতে

উৎপন্ন বীর্য্য (Sraunlar matter) পরিপূর্ণ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন এবং উভয়ের অবিচ্ছিন্ন। অভিন্নতা মাত্র এই যে, রক্তকণিকার (nerve corpuscle) একটি ভিন্ন অনেকগুলি পদ্ধতি (কার্য্য করিবার নিয়ম ও উপায়) আছে; এবং বীর্য্যকুঠীর কেবল একটিমাত্র বিষয়েই ভূষিত। উল্লিখিত আকৃতিগত সাদৃশ্যে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।—

(ক)—ক্রমাগত মানসিক কর্ম্ম ও পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ বলক্ষয় ও উত্তেজনা হয়, বীর্য্যক্ষয়ের আতিশয্যেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তাহদের বলক্ষয় এবং উত্তেজনাবশেও ক্রমে সেহবাসকার্য্যের অতি ভয়ানকরূপে অনিষ্ট করে, তাহা সকলেই অনুমান করেন ও জ্ঞাত আছেন।

(খ)—যে সমস্ত ঔষধদ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়, তাহারই সহবাস যন্ত্রের উন্নতি এবং তেজস্বিতা আনয়ন করে এবং বীর্য্যকের গর্ভধারণ জন্য অধিক উপযোগী করে।

তাহার পরে আর একটি বিষয় মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য সাধারণ জন্তুর তুলনায় দামড়া, খাসি ইত্যাদি জন্তু (অর্থাৎ যাহাদিগকে খোজা করা হইয়াছে) সাধারণ নিয়মে লাজুক হয় এবং তাহাদিগের সাহস ও সহিষ্ণুতার অভাব হয়। স্বভাবে স্ত্রীলোকের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল কার্য্য ও ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দুইটি অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা,—

(১)—বলশক্তির নিয়মের সহিত সহবাস-শক্তির নিয়ম প্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রব আছে।

(২)—শুক্রকণিকা যদিও রক্তকণিকার সহিত তুল্য নহে, তথাপি অন্ততঃ ইহার আরম্ভ একই প্রকারে হয়।

মনুষ্যেতর জন্তুদিগের সহবাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১)—মনুষ্যেরা যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে পশুগণ যখন তাহাদের স্বাস্থ্য অতি ভাল থাকে, সেই সময়ে সহবাসকার্য্যে নিযুক্ত হয়।

(২)—যে সময়ে জরায়ু সন্তানধারণের উপযোগী হয়, সেই সময়েই তাহারা সহবাস করে,—উচ্চশ্রেণীস্থ পশুদিগের মধ্যে এই সন্তানধারণকার্য্য বৎসরে একবার মাত্র সাধিত হয়। অনেক পশু আবার আরও অধিক দিন পরে ধারণ করিয়া থাকে।

(৩)—এই কার্য্যে একবার মাত্র এবং পরস্পরের বীর্য্যক্ষয় সন্তান উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট এবং তাহাতে নিশ্চয় সন্তান জন্মে।

(৪)—গর্ভধারণ করার পরক্ষণ হইতে—এবং সন্তান প্রসূত হইলে তাহাকে দুগ্ধ দেওয়ার সময়ের পর যে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীপশুগণ কামাভিলাষী পুরুষ পশুর চেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়া থাকে।

বৃক্ষসকলের মধ্যে ও আমরা ঐরূপ সদৃশ-পদ্ধতি চালিত হইতে দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবী পাদপপুঞ্জকেও স্বজাতীয় বৃক্ষোৎপাদক যন্ত্র দিয়াছেন, তাহা পুষ্প, মুকুল ইত্যাদি। ইহাও প্রকৃত ঋতুতে এবং যখন তাহারা সতেজ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে। যখন ক্রিয়াকর্তৃগণ (বায়ু, পক্ষযুক্ত কীটগণ, অলি প্রভৃতি) পুংশুক্র অর্থাৎ পুষ্পরেণু, স্ত্রীক্ষেত্র অর্থাৎ জরায়ুতে নিক্ষেপক কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে এবং যখন জরায়ু প্রকৃতভাবে উর্ব্বর (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, তখন পুরুষের সংস্রবে থাকিলেও আর উহা ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

জীবজগতের নিম্নস্তরে খনিজ জগতেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। রসায়ন বা খনিজ জগতের কার্য্যপ্রণালী-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান রাসায়নিক

সংযোগের প্রথম নিয়মই এই যে, তৃতীয় একটি বস্তু উৎপন্ন করিতে বস্তু-সকলকে রাসায়নিক কার্য্যক্ষম করিতে পারে না। আমাদিগকে আরও জ্ঞাত করায় যে এইরূপ সংযোগ কোন পরিজ্ঞাত সুবিধাজনক অবস্থাতে অসম্ভব। পুনরায় আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, উপযুক্ত (মিল যুক্ত) সংযোগ জন্য বস্তুদিগকে ভাল করিয়া মিশ্রিত করা আবশ্যক, অর্থাৎ যে বস্তু যে বস্তুর জন্য অতিশয় আকর্ষণ প্রকাশ করে, সেই সেই বস্তুর সংমিশ্রণে অতিশয় স্থায়ী মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে, জগতে নিম্নস্তর হইতে ফলদায়ক প্রমাণগুলি কেবল একই পথ প্রদর্শন করে; অর্থাৎ কেবল সন্তান বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সহবাস সম্বন্ধবিধিপূর্ব্বক উপভোগ্য হইতে পারে এবং ঐ বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রশ্রয় বা আতিশয্য নীতি ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-বিগর্হিত এবং অস্বাভাবিক।

এখন মানুষ ও মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখ। মানুষের উন্নত বা অবনত অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দুই প্রকার স্বভাব আছে। একথা কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি ধার্ম্মিক এবং কি নৈতিক সকল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। কি প্রকারে সেই মহৎ স্বভাব মানুষে আগমন করে, তাহা সকলেরই চিন্তনীয়। মানুষ মানসিক, নৈতিক এবং শারীরিক বল ও গঠন পারিপাট্যে উচ্চতা লাভ করিতে পারে। সহবাস বিধিতে নিজে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিলে, সেই ব্রতোৎপন্ন সন্তান সর্ব্বগুণ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসামর্থ্য ও সর্ব্বাবয়ব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কে না কামনা করে, তাহার সন্তান সর্ব্বগুণযুক্ত ও লোকাভিরাম হয়? কিন্তু আত্মকৃত মহাপাতকে—ক্ষণিক নারকীয় প্রবৃত্তির তাড়নে মানব আত্ম বংশ কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে মানুষ আপনার ও আপনার সন্তানগণের অবস্থা উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন। মানুষ

তাহার জন্ম-বিধিতে দৃষ্টিপাত করিলে নিজের ও নিজের সন্তানগণের পবিত্রতা, নৈতিকতা এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আনয়ন করিতে পারেন! সে কার্য্য একমাত্র সহবাস-বিধির উপরে নির্ভর করে।

যদি মনুষ্য তাঁহার স্বভাব অনুসরণ করিয়া চলেন, অর্থাৎ যদি তিনি তাঁহার জ্ঞানকে আপনার উপরে প্রধানভাবে কার্য্য করিতে দেন এবং যদি তাঁহাতে মূলতঃ বিবেচনার উপযোগী অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, বংশানুগত নিয়ম সন্তানদিগের কেবল দৈহিক বিষয়ে নহে, আরও অধিক পরিমাণে তাহাদের মানসিক ও নৈতিক স্বভাবকেও নিয়মানুযায়ী করে।

মানুষ শিশু উৎপাদকের (Cattle breeders) প্রতি উত্তম মনোযোগী হইলে দেখিতে পাইবেন যে,—তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক সহবাস-কার্য্যে তাঁহার পালিত পশুদিগকে প্রস্তুত করেন। সন্তানের গঠন লক্ষ্য করিতে মাতার কল্পনাশক্তি প্রভৃতির শক্তি ও অবগত হওয়া যায়। পশুর উৎপাদকগণ স্ত্রীপশু গর্ভধারণ করিলেই তাহাকে তাহার জাতীয় উত্তম জন্তুকে তাহার দৃশ্যের নিকট বর্ত্তমান রাখে। তদ্ভিন্ন তাহাকে তখন হাটে বাজারে লইয়া যায় না—এবং দুরন্ত বা হীনাঙ্গ পশুর নিকটে থাইতে দেয় না। ইহার কারণ এই যে, মাতার কল্পনা ও চিন্তার ফল গর্ভস্থ সন্তান-গঠনের অনেকটা সহায় হয়।* ইহা আরও বিশেষভাবে জানা আছে যে, পৈতৃক উত্তরাধিকার-সূত্রের নিয়মগুলি কেবল যে জন্তুদিগের মধ্যে আছে, তাহা নহে, মনুষ্যসম্বন্ধেও এই নিয়ম বিধিবদ্ধ।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সন্তান সন্ততিগণ পিতামাতার শারীরিক আকৃতির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়; যথা—পিতামাতার গঠনের ন্যায় গঠনের লালিত্য; পিতামাতার বিশেষ কোন পীড়া, কেবল অঙ্গহানি মুখের সাধারণ ভঙ্গী ইত্যাদি সন্তানেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও দৃষ্টান্তদ্বারা জানা

আছে যে, যে পিতামাতার শরীর সবল ও সম্পূর্ণ অনিন্দ্য,—তাঁহাদের সন্তানের শরীরও সবল এবং অনিন্দ্য হয়। আরও মানসিক ও নৈতিক গুণসকলের উত্তরাধিকারত্ব এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, একপক্ষে সাহসিকতা, ধার্ম্মিকতা, দয়ালুতা ও অন্যপক্ষে নিষ্ঠুরতা, হিংস্রভাব ও ব্যসনাসক্ত ভাবগুলিও পিতামাতা হইতে সন্তানেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমুদয় হইতে উহা অবগত হইতে পারা যায় যে, সহবাসসম্পর্কীয় স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করাতেই পিতামাতার গঠনের সহিত সন্তানের গঠনের পার্থক্য হয়। তবে গৌণ কারণদ্বারা যাহা সাধিত হয়, সে কথা স্বতন্ত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রত-ধারণ।

শিষ্য। আপনি যে সকল বিষয় বলিলেন, তাহা হইতে সহবাস-কার্য্য স্থির করিয়া চালিত হইবার জন্য মানবগণ কি উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। এতৎসম্বন্ধে মানুষ যে উপদেশ প্রাপ্ত হয় অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাউক।

১।—প্রথমতঃ একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সত্য মনে উদিত হইবে যে, যাহা স্বভাব তাহাতে কোন ছত্রভঙ্গ বা হঠাৎ উৎপত্তি নাই। পরিবর্ত্তনের যেরূপ উন্নতি হইতে থাকে, কার্য্যের যন্ত্রাদি ও সেইরূপ নানাপ্রকার

স্বতন্ত্রতা হইতে থাকে। সহবাস-কার্য্যও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে; এমন কি, এইরূপ নিয়ম যেমন ধাতুজগতের কার্য্যের মূলকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করে, উদ্ভিদ্ কিংবা জান্তব-জগতের উচ্চ জাতিরও এই নিয়ম পরিচালিত হইতে মূলতঃ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক ধাতুজগৎ হইতে জান্তব জগৎ পর্য্যন্ত অতিশয় পার্থক্যসত্ত্বেও সহবাসপদ্ধতি উভয়ের পক্ষে প্রায় একই রূপ। মানুষের বল-শক্তির বহু স্বতন্ত্রতা থাকাতেই যে, এই নিয়মের অন্যথা হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। যদিও মানবের উচ্চ শৃঙ্খলাবদ্ধ বল-শক্তি আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ চর্চ্চাও উপযুক্ত ব্যবহার করিবার জন্য মানসিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভূমি তাহার সম্মুখে আছে,—তাহাতেই মানবের সে উচ্চশক্তি প্রয়োগ করা উচিত। সহবাস রূপ গর্হিত কর্ম্ম প্রতিদিন নিষ্পন্ন করিলে কখনই উৎপত্তিকারক যন্ত্রের শক্তি অতি অসঙ্গত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না। পরন্তু, তাহার শক্তি অত্যধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্তই হইয়া থাকে। সেই জন্যই জ্ঞানাদি উচ্চশক্তিসম্পন্ন মানবের উচ্চজাতীয় জন্তু অপেক্ষাও এই ক্ষয়কারী কার্য্য যাহাতে অতিশয় কম হয়, তাহা করা উচিত।

২।—দ্বিতীয়তঃ যদি উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম স্বভাবের কার্য্য হয় এবং এমন কি, ইহা মানসিক ও নৈতিক জগতে কার্য্য করে, তবে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,—যখন উভয় পক্ষের মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক স্বভাব অসম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হয়, কিংবা প্রকৃতভাবে কার্য্য করিবার নিয়ম অপেক্ষা অন্যরূপ হয়, তখন সহবাস কার্য্যের পরিচালনা করা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং দোষাবহ।

৩।—তৃতীয়তঃ মনুষ্যের কিংবা জন্তুর পরিমিত ব্যয়ের জন্য যেখানে কোন কার্য্যই নাই;—যাহা কেবল সন্তোষের পরিচায়কস্বরূপে ব্যবহৃত হয়,—এরূপ ব্যবহারের ফল যে অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ, তাহা সকলেই

বুঝিতে সমর্থ। আর যদি এই কার্য্য যথাযথরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কার্য্যই সন্তোষজনক এবং উপকারী হয় এবং যন্ত্রেরও সুখোৎপাদন করে। সহবাস কার্য্যও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি মনুষ্য তাঁহার নিজ স্বভাব অনুসরণ করিয়া চলেন,—আর এই সকল উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন,তবে তিনি নিজে অপরিমিত সুখী হইবেন এবং বংশকে পবিত্র করিতে পারিবেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ তাঁহার স্বভাবে সত্যভাবে থাকেন না। মানুষ স্বভাবধর্ম্ম পরিত্যাগী ও কামান্ধ। বহুকাল পর্য্যন্ত কামের আচরণে অভ্যস্ত থাকায়, যখন উৎপাদনকারী যন্ত্রের কার্য্য কেবল সন্তানোৎপাদন জন্যই ব্যবহার করা উচিত, এই সত্যালোক তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তখন ইহা কলুষিত হইয়া যায়। মানব ধাঁধাঁগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতি ধাঁধাঁগ্রস্ত না। প্রকৃতি সেই কামান্ধতার দণ্ডস্বরূপ তাহাকে পীড়িত, অমেধাবী, অঙ্গহীন, কদাকার, অল্পায়ু ও রুগ্ন কতকগুলি সন্তান প্রদান করেন,—কিন্তু সেই সকল সন্তানের জনকও তখন ঐ সকল হীনশক্তি সন্তান প্রতিপালনের উপযুক্ত কি শারীরিক কি মানসিক বলহীন—তখন তাহার জীবন নানাকারণে দুঃখের ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলে।

আমি আশা করি যে,—প্রত্যেক দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। যে সকল কথা এতক্ষণ বলিলাম, প্রত্যেক দম্পতী তাহার প্রতি মনোযোগ করেন এবং যে ইন্দ্রিয়-শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া হৃদয়কে মসী-মলিন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বিদূরিত করেন। মানুষ পশু নহেন,—উন্নত জ্ঞান ও কঠোর দায়িত্বের অধিকারী—তবে যাহা পশুতেও করে না, এমন কার্য্যে তিনি আত্মহারা হইবেন কেন? হৃদয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগরিত করুন। "অল্প—অথচ সুস্থ, সুন্দর, মেধাবী, বলশালী ও বুদ্ধিমান্ প্রজা

(সন্তান) উৎপাদন করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জল করুন,—এবং ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া কতকগুলি রুগ্ন, হীনবুদ্ধি, কদাকার, সন্তান উৎপাদন করিয়া নিজের অবস্থার অতীত ব্যয়ভার বহন করিতে গিয়া, দারিদ্র্যজ্বালা ডাকিয়া আনিয়া আপন জীবন অশান্তির দাব-দাহের বিষম দহন হইতে রক্ষা করুন।

এই সকল ব্যক্তিগত ও দৈহিক বিবেচনা ব্যতীত বিবাহিত নরনারীর আর একটি উচ্চ দায়িত্ব আছে,—যাহা মানবমাত্রেরই অবশ্য বিবেচনা করিবার বিষয়। মানব মাত্রেরই বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত যে—যে সমাজে তাঁহারা বাস করিতেছেন,সেই সমাজে ভাল এবং উপযুক্ত ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়া সমাজ ও মাতৃভূমির উন্নতি করা—এবং স্বীয় বংশকে উন্নীত করা। তাঁহাদের সমাজ—তাঁহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ আশা করেন যে, তাঁহারা সুসন্তান জন্মাইয়া, তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করেন; কিন্তু তাঁহারা কি রুগ্ন, মূর্খ, উন্মত্ত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত এবং ধর্ম্ম-নীতি বিগর্হিত কর্ম্মাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ সন্তান জন্মাইয়া, তদ্দ্বারা মাতৃভূমির অঙ্ক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইবেন? তাঁহারা কি তাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞানের নিকট বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোষী হইবেন না? এরূপ সন্তান উৎপাদন করিয়া দেশের উন্নতি করা দূরের কথা বরং সাহায্যভাণ্ডার (রিলিফফণ্ড) খুলিয়া হাঁসপাতাল, কারাগার, পাগলাগারদ এবং সংশোধন কারাগার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া এবং সাধারণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলিশ সৈন্য এবং অন্যান্য আদালত স্থাপন করিতে বাধ্য করিয়া সমাজের বলক্ষয় করা হয় মাত্র। পরিবর্ত্তনের মূলভিত্তি যাহা মনুষ্যের গুণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যদি মনুষ্য অসাবধানভাবে এইরূপ কদাকার, দুর্ব্বল, ধর্ম্ম-নীতিহীন সন্তান দ্বারা মাতৃ-ভূমি পূর্ণ করিতে থাকে,—তাহা হইলে সমাজের উন্নতির আশা নিশ্চয়ই সুদূরপরাহত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, কলির মধ্যকালে মানবের আত্মকৃত মহাপাতকে তাহাদের অতি বৃদ্ধের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসরের অধিক হইবে না। সে কথা ভারতবাসীর—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর উপরে বিশেষরূপেই খাটিয়া উঠিতেছে। সে আত্মকৃত মহাপাতক—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ক্রমেই আমাদের আয়ুর পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে—শক্তি সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখনও যদি সাবধান না হওয়া যায়,—বিষ্ণুপুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। যদি কেহ বলেন, পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই ফলিবে;—সাবধান হওয়া যাইবে না। সে কথা ভুল, আত্মকৃত মহাপতকে ঐরূপ হইবে, লিখিত হইয়াছে; যদি সে মহাপাতক হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের সন্তান সন্ততি দীর্ঘজীবী হইবে। পুরুষকারের ফল কোথাও যায় না। যাঁহারা দেশের কল্যাণকামী—যাঁহারা সমাজের হিতকারী,—যাঁহারা সমাজের ও বংশের উন্নতিপ্রয়াসী; তাঁহারা এ বিষয়ে কখনই উদাসীন হইবেন না। এই বিষয় কখনই উপেক্ষণীয় নহে—বরং গম্ভীরভাবে চিন্তনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও তৎক্রিয়া।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বিবাহ না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়।

শ্রীগুরু। অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছ—আমি এরূপ বলি নাই যে, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থে স্ত্রীর সহিত দৈহিক সংযোগের একান্ত অভাব।

তবে বলিয়াছি এই যে,—তাহা মনুষ্যোচিত জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করাই উচিত এবং তাহা অত্যন্ত নিয়মিত অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য যাহা, তাহাই সাধন করার জন্য নিস্পৃহ হওয়া উচিত।

শিষ্য। আপনার এই মত সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবে বলিয়া ভরসা করা যায় না।

গুরু। কেন?

শিষ্য। আপনি বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের যুবকগণের সহবাস-স্পৃহা নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত পাত্রের অভাব হইলে, অর্থাৎ বিবাহ না দিলে, তাহারা যে সমস্ত কু-অভ্যাস ও কুকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা অতি ভয়াবহ। তৎপরে আমাদের সমাজের পিতামাতা-গণ সহবাসকার্য্যের যেরূপ প্রশ্রয় দেন তাহাও অতি ভয়াবহ। অতএব আপনার কথিত প্রকারে কার্য্য হইবে কি প্রকারে। আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই অধঃপতনকর কার্য্য কেবল বর্ত্তমান কালেই হইতেছে —পূর্ব্বে এরূপ ছিল না?

গুরু। না, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না? থাকিলে তখন উন্নত মানব দ্বারা সমাজ পূর্ণ হইত না।

শিষ্য। তখন ছিল না, আর হঠাৎ এ মহাপাতক কেন আমাদের সমাজে জড়াইয়া বসিল,—ইহারি কারণ কিছু অবগত আছেন কি?

গুরু। হ্যাঁ, যাঁহারা সমাজের এই মহাপাতক দর্শনে ব্যথিত—তাঁহারা তাহার কারণও নির্ণয় করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে যখন দেশের অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ অরাজকতা পূর্ণ ছিল এবং যখন লোকের দেহ বা সম্পত্তি তরবারির অগ্রভাগে রক্ষা করিতে হইত সেই সময় উপভোগ কার্য্য অতি অল্পপরিমাণে সম্পন্ন হইত,—কারণ সেই সময় আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্য এবং গৃহযুদ্ধে লোকের মন এতাদৃশ

ব্যাপৃত থাকিত যে, অদমিত সহবাস-ব্যসনে নিযুক্ত থাকিবার সময় ও উৎসাহ ক্বচিৎ প্রাপ্ত হইত। কারণ মানসিক ও দৈহিক নিষ্কর্ম্মতা (অলসতা) এইরূপ ব্যসনের উৎপত্তিকারক।

ধর্ম্মদ্বারা এই প্রবৃত্তির দমন হইয়া থাকে,—বর্ত্তমান সময়ে নাস্তিকতা ও কুসংস্কার সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, এবং সেই সকল কারণেই আমাদিগের মধ্যে সহবাস জ্ঞান এত অনিয়ন্ত্রিত এবং দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন বেদ হইতে মনুর শাসনকাল পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের ব্যক্তিগণ ধর্ম্মানুশাসন মানিয়া চলিতেন ও ভক্তি করিতেন—সেই সময়ে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, সাধারণতঃ সমাজের সকলে—অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অভ্যাস করিতেন।

তোমরা যদি পূর্ব্বকালের গ্রন্থাদি মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ কর, তাহা হইলে এ সকল কথা সম্যক প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হও। অধিকদিনের কথা নহে, কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশ গ্রন্থে" রঘুবংশীয়দিগের বর্ণনাকালে—"প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্" (সন্তানের জন্য বিবাহ করিতেন, নিজের সুখের জন্য নহে)—লিখিয়া প্রাগুক্ত সত্য চিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। যদি বলা যায়, কালিদাস একজন বিখ্যাত কবি, কাব্যের ছন্দে যাহা সমাজের হিতকর, তাহাই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন —অতএব উহাই যে বস্তুতঃ সত্য অর্থাৎ রঘুবংশীগণ যে ঐরূপই করিতেন তাহার ঐতিহাসিক সত্য ঐ বর্ণনায় নাও থাকিতে পারে।

তাহা হইলেও ইহা সত্য; এ কঠোর কাহিনী তুমি পুরাকালীন সমস্ত গ্রন্থেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ম্ভু মনুর কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির বিবাহ-বর্ণনা পাঠ করিলে, আমার কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এ প্রমাণ নাই কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে, মনু তাঁহার অনুরোধে তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছিলেন

এবং এই অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত এই রমণীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিবাহ বন্ধন বর্ত্তমান থাকিবে,—অর্থাৎ তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ রূপে বসবাস করিবেন। কর্দ্দম ঋষি নিজেই এই অঙ্গীকারের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সন্তান উৎপন্ন হইলেই তিনি সংসার পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী তৎপরে সেবা ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহুকষ্টে কয়েক বৎসর স্বামীর আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং একদিন কর্দ্দম ঋষি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে আমি তোমার কার্য্য-দৃঢ়তায় ও আত্মসংযমে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" দেবহূতি তাহাতে সন্তান কামনা করেন। সেই কামনার ফলে—সেই প্রণয়ের যোগে তাঁহাদের দৈহিক সংযোগ হয়। সেই যোগগৃহে—সেই সংযোগের ফলে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা মহামুনি কপিলের সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে এইরূপ বর্ণনা কতশত প্রাপ্ত হইবে। ফলকথা তখন নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সেবার জন্য পরম পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইত না, স্ত্রী-পুরুষের উভয় শক্তি লইয়া গৃহস্থালীর তথা জীবনের মধুর ও পরম শান্তিকার্য্য সম্পাদনের জন্য এবং দীর্ঘজীবী, সৎকর্ম্মশালী, স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মে হিতকামী সন্তান উৎপাদন জন্য বিবাহকার্য্য সম্পাদন করা হইত। বিবাহের মন্ত্রগুলির অর্থও তাহাই। স্বামি-স্ত্রীতে যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তখন দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া বরকন্যা এরূপ প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন। একটি মন্ত্রের কথা বলিতেছি, শোন,—

গৃহ্ণামি তে সৌভাগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সঃ। ভগোহর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বা দুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সাত্বমস্য-মোহহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং। তাবেহি বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্

বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্ ॥

অর্থাৎ—"কল্যাণি! আমার কান্তি, শ্রী, মাহাত্ম্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মাদির পরিপূরণের নিমিত্ত আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমার আত্মা যেন আর কখনই আমার আত্মা হইতে বিযুক্ত না হয়। যেন আমার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি বৃদ্ধতা প্রাপ্ত হইতে পার। ভগ, অর্য্যমা এবং সবিতা প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে আমাতে সম্মিলিতা করিয়া দিয়াছেন। তুমি আমার গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবে। কল্যাণি! তোমার দ্বারা আমার শান্তি, শ্রী ও কান্ত্যাদির বিকাশ হইবে,—অতএব তুমি লক্ষ্মীস্বরূপা। তুমি না হইলে আমার কান্তি, শ্রী প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না—অতএব আমি একক লক্ষ্মীশূন্য পদার্থ। হে মঙ্গল্যে! আমি একক লক্ষ্মীশূন্য ছিলাম, তোমাকে লাভ করিয়া আমি এখন লক্ষ্মীমান্ হইলাম। হে আয়ুষ্মতি আমি সামবেদস্থানীয় তুমি ঋগ্বেদস্থানীয়া। ঋক্ আর সামের সহিত যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ঋগ্ ব্যতীত যেমন সামের পরিপুষ্টি বা অস্তিত্ব রক্ষা হয় না, তুমি ব্যতীতও তেমনি আমার আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদির পরিপুষ্টি বা অস্তিত্ব থাকে না। হে অর্দ্ধাঙ্গি! আমি আকাশ স্থানীয়, তুমি পৃথিবী-স্থানীয়া, পৃথিবী এবং আকাশের যেমন ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ আছে, তোমার আত্মা এবং আমার আত্মারও সেইরূপ ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ হইয়াছে। অতএব হে কল্যাণি! তুমি আত্মসমর্পণ কর, আমাদের বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় হউক। আমাদের উভয়ের রেতঃসংযম করিতে হইবে; পরে যথাসময়ে দৈহিক সংযোগ দ্বারা সুপুত্র উৎপাদন করিব,—পরে পুত্রসুখানুভব করিব। এইরূপ বিধানানুসারে পুত্র উৎপাদন করিলে তাহারা

চিরজীবী (দীর্ঘজীবী) হইবে। মঙ্গল্যে! তোমার এবং আমার একাত্মতারূপে সমাসক্তি হইলে, উভয়ের জ্যোতির্বৃদ্ধি হইবে, —উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া সমুন্নত হইবে, আমরা শত শত বৎসর জীবিত থাকিব, শত শত বৎসরের ঘটনা দেখিতে শুনিতে পাইব।"

বিবাহ করা নিকৃষ্ট রিপুবিশেষের চরিতার্থতা সাধনের জন্য নহে, তাহা উক্ত বিবাহের মন্ত্র শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিবে। আরও বোধ হয়, স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে যে, বিবাহকালে স্বামী স্ত্রীকে বলিলেন যে, আমাদিগের উভয়কেই রেতঃসংযম করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা দীর্ঘজীবী ও সুপুত্রের পিতামাতা হইতে পারিব। রেতঃসংযম না করিলে, অল্পায়ুঃ অমেধাবী কুপুত্রের জনক জননী হইতে হইবে। আজ সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ,—সর্ব্বত্রই অসংযমতা—এবং সর্ব্বত্রই জীর্ণ-দীর্ণ কঙ্কালসার সন্তান-সন্ততি, সর্ব্বত্রই অকালমৃত্যুরকরাল ছায়া,—সর্ব্বত্রই অমেধাবী বা অল্পমেধাবী এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য সন্তানের জন্ম। ইহার কারণ কি? পুনরায় কি বলিতে হইবে যে, রেতঃসংযমের অভাবে—ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাবে, এই অবনতি, এই সমাজে ও বংশবিলোপকারী সর্ব্বনাশ?

বিবাহ করিবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ স্ত্রী ও পুরুষ আত্মার একত্ব সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মাচরণ—সে ধর্ম্মের ক্ষেত্র গৃহস্থলী। দ্বিতীয়তঃ সুপুত্র জন্মান। শাস্ত্র বলেন,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করা নহে, বিলাসের বিনোদিনী বানাইয়া বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া বংশ এবং নিজ শরীরকে ধ্বংস করিবার জন্য বিবাহ করা নহে। বিবাহ করা সংযম সাধনের জন্য এবং সুপুত্র লাভের জন্য। হায়! আমরা সব ভুলিয়া গিয়াছি,—পুণ্যধামে অপুণ্যের করাল ছায়া ঘনাইয়া বসিয়াছে। তাই আমরা বিবাহ করিয়া তাহার ক্রিয়াসাধনে পশুরও অধম হইয়া পড়িয়াছি।

আমি তোমাকে আবার বলিয়া দিতেছি, বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়—বিবাহিতা স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মাচরণ সংযম সাধনের নামান্তর। সংযমেই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাল্পনিক সৃষ্টি।

শিষ্য। আপনি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কথা বিবৃত করিলেন, তাহা সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। রোগ চিনিতে পারিলেই, তাহা আরোগ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না। এক্ষণে কি প্রকারে এ রোগ—এই সমাজ ধ্বংসকর রোগের চিকিৎসা হইতে পারে, তাহা বলুন।

গুরু। হাঁ, তাহা বলিব। এক প্রকারে বলিলে তদ্দ্বারা কার্য্য হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে বলিব। এক্ষণে কি প্রকারে দম্পতীর প্রথম জীবন গঠিত হইতে পারে, তাহার একটি সুন্দর আদর্শ কল্পনায় গঠন করিয়া আলোচনা কর দেখি।

আমি যে সকল আত্ম-শাসন বিষয়ে এতক্ষণ বলিয়া আসিয়াছি, সেই সকল বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য যে সকল দৈহিক; মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার আবশ্যক, তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। উদাহরণ স্বরূপে কল্পনাবলে এক আদর্শ দম্পতী গ্রহণ কর এবং তাহাদের বাল্যজীবন হইতে পিতামাতার কর্ত্তব্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার বিষয় অঙ্কিত করিয়া লও। তৎপরে আমরা তাহাদের

সহবাস কার্য্যের জন্য আয়োজন এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা সকল—যাহা এই বিশেষ সময়ে মাতার কল্পনাকে উন্নত করে, তাহাদের সাধারণ স্বভাব বর্ণনা করিব।

মনে কর, আমাদের কাল্পনিক দম্পতীর মধ্যে পুরুষের বয়স পঞ্চদশ বৎসর,—এই সময়ে তাহার সহবাস-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনে কর, তখনও তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন,—সজীব স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধি, উচ্চাশা, প্রকৃত নীতিজ্ঞান এবং ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি দ্বারা ভাসমান হইতেছেন। তাঁহার দৃঢ়কায়, উজ্জ্বল নয়ন, সুন্দর স্বাস্থ্য।

মনে কর, ঐরূপ একটি কিশোর-বয়স্ক মানবকে তুমি শিক্ষা দিতে গ্রহণ করিয়াছ। তারপরে, তাহাকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অধীনে রক্ষা করিয়াছ,—সমস্ত উত্তেজক এবং অতিশয় মসলাযুক্ত খাদ্যাদি যথা, মাংস, মিঠাই ও উত্তেজনাকারী মাদক দ্রব্য ও তামাক সেবন ইত্যাদি সমস্ত ব্যসন হইতে দূরে রক্ষা করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন দ্বারা তাহার যন্ত্রের কার্য্য সমস্ত প্রকৃত নিয়মাধীন রাখিয়া নাটক, নভেল এবং অলস সঙ্গী প্রভৃতি যাহাতে কামরিপুর কার্য্যে উত্তেজিত করে, তাহা হইতে দূরে রাখিয়া ও তৎপরে মানসিক এবং দৈহিক কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া ধর্ম্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিষয়ক ও অর্থকরী জ্ঞানবিষয়ক, গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়াছ,—এক কথায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ যাহাতে হয়, তাহাতে শিক্ষিত করিয়াছ।

আমার কথিত বিষয়গুলি যদি তুমি উক্ত বালকটীকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়া থাক এবং যদি দৈববিড়ম্বনায় পূর্ব্ব ঘটনা দ্বারা বালকটি হতভাগ্য না হয়, তাহা হইলে দেখিবে যে, তুমি কি প্রকারে একটি আদর্শ পুরুষ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছ।

প্রাগুক্তরূপ শিক্ষিত যুবকে সহবাস জ্ঞান, অপরিপক্ক অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত হওয়া অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। তাঁহার স্বভাবের সকল দিক্ প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাম্য ও শাসন করিয়া সমপরিমিত বিবর্ত্তন হইতে থাকে।

যে শিক্ষার কথা উপরে বলা হইল, সেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার অধীনে থাকিয়া আমাদের কাল্পনিক যুবক যৌবনের প্রারম্ভকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনে কর—তিনি, মানবের উপকার করিতে পারেন, এইরূপ কোন পথ-অবলম্বনের গভীর আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের কঠোরতম ধর্ম্মের সুন্দর অংশে ভূষিত হইয়াছেন।

তখন তুমি ঐ কাল্পনিক-যুবকের দ্বারা কি আশা করিতে পার?

শিষ্য। নিশ্চয় আশা করিতে পারি ঐরূপ যুবকের দ্বারা মানব-সমাজের,—কেবল মানব-সমাজের কেন, সমগ্র জীব-সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।

গুরু। না না,—সে আশা এখনও করিতে পারা যায় না। যে অবস্থা পর্য্যন্ত গঠিয়া তুলিয়াছ, তাহাতে ঐ যুবকের স্বভাবে দুর্ব্বিনীততা অশান্ততা ও কর্কশতা বিদ্যমান আছে। সে গুলিকে কোন শিষ্ট সূত্রধরের বাটালীর সাহায্যে কাটিয়া সুশোভিত করিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। সে সূত্রধর কাহাকে বলিতেছেন?

গুরু। কেন, স্ত্রীলোক।

শিষ্য। আপনি বোধ হয়, এইবার বিবাহের কথা তুলিবেন?

গুরু হাঁ।

শিষ্য। কেন, বিবাহ না করিলে কি মানব জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না?

গুরু। না, সমাজের মঙ্গলকর শিক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারাই হইয়া থাকে

তুমি দেখিতে পাও না, অবিবাহিত সন্ন্যাসি-জীবন সমাজের আদর্শ নহে? তাই শাস্ত্র উপদেশ দেন,—গৃহীর বিবাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

শিষ্য। তবে কি স্ত্রীলোকেই পুরুষের শিক্ষয়িত্রী?

গুরু। না; কেবল স্ত্রী পুরুষের শিক্ষয়িত্রী নহে। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষয়িত্রী, আবার পুরুষ স্ত্রীর শিক্ষক। স্ত্রীলোকের সংসর্গে পুরুষের কর্কশতা এবং বক্রতা দূরীভূত হইবে; আবার পুরুষের সংসর্গে রমণীর শান্ত এবং মানসিক উত্তেজনাপূর্ণ স্বভাব উন্নত ও বিচারক্ষম হইবে।

শিষ্য। এরূপ হইবার কারণ?

গুরু। পুরুষের ব্যঞ্জিকা বা বহির্গমনশীল শক্তি;—স্ত্রীজাতির গ্রাহিকা বা পরিপোষিকা শক্তি। উদ্যম, উৎসাহ; সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি পুরুষের শক্তি বা প্রকৃতি। প্রেম, দয়া, লজ্জা, ভক্তি প্রভৃতি স্ত্রীজাতির শক্তি বা প্রকৃতি। উদ্যম উপস্থিত হইলে,—সাহস উপস্থিত হইলে এই গুণগুলি যেন হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিতে চায়, অর্থাৎ সাহসাদি গুণসকল বহির্গমনশীল গুণ, এ গুলি ভিতরের জিনিষ নহে;—ঐ গুলি উপস্থিত হইলে, যেন সেগুলি বাহিরে কোন কার্য্য করিতে চায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরুষের প্রকৃতি স্বভাবতঃই বহির্গমনশীল। আবার স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ইহারই ঠিক বিপরীত! লজ্জা উপস্থিত হইলে; যেন হৃদয়ের কোন পদার্থ বাহিরে গিয়াছে—অমনি আবরণ দিয়া—ঘোমটা দিয়া তাহা হৃদয়ে আনিতে ইচ্ছা হয়। একটি শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে, অমনি দয়া উপস্থিত হ ল, যেন শিশুকে ধরিয়া হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ গুণগুলি বাহিরের জিনিষ নহে, উহা অন্তর্গমনশীল শক্তি। অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীজাতির প্রকৃতি গ্রাহিকা বা

পরিপোষিকা। এই বিভিন্ন প্রকৃতিকে এক করিবার প্রধান উপায়, স্ত্রীপুরুষের এক হওয়া। সেই জন্যই তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের কথিত আদর্শ যুবককে এই সময় বিবাহ দিতে হইবে। বিবাহিত জীবনে যুবক ও যুবতী পরস্পর পরস্পরের স্বভাবে যাহা অত্যুত্তম, তাহা দিয়া পরস্পরে পরিবর্ত্তনের সাহায্য করিবে। এইরূপে উভয়ের প্রেম এবং স্বার্থত্যাগের উন্নত ধর্ম্মকে অজ্ঞানিতভাবে শিক্ষা করিয়া থাকে।

শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা বা ব্রহ্মচারীকে বিবাহ করিতে হয়, এ কথা কি শাস্ত্রে আছে?

গুরু। যদি কেহ আজীবনকাল ব্রহ্মচারী অর্থাৎ চিরকুমার থাকিবে, এমন সঙ্কল্প করে, তবে তাহাকে যে বিবাহ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে সকলের পক্ষে সে বিধান নাই,—ব্রহ্মচর্য্য পালনের পরেই বিবাহ করিতে হয় এবং তুমি বোধ হয়, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণের কথা মনে রাখিয়াছ,—অতএব মানুষকে ক্রমে ক্রমে ঐ তিন অবস্থায় আসিতে হয়। কিন্তু বিবাহ করিলেই ব্রহ্মচর্য্য যায় না, বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে। যেরূপে থাকে, তাহাই বলিব।

শিষ্য। আমরা যে কল্পিত আদর্শ-দম্পতীর বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম,—তাহার পুরুষটির শিক্ষার কথা বলিয়াছেন, স্ত্রীর শিক্ষার কথা বলেন নাই।

গুরু। হাঁ তাহা এইবারে বলিব।

শিষ্য। আমাদের সমাজ কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী।

গুরু। না না—যাহা প্রকৃত শিক্ষা, সে শিক্ষার বিরোধী আমাদের সমাজ কোন কালেই নহে। তবে যে শিক্ষায় রমণী দানবী হয়,—হৃদয়বৃত্তি কলুষিত হয়, বিলাসিতা আসিয়া সংযমের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, সেইরূপ শিক্ষা দিতেই আমাদের সমাজ নারাজ। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন,—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

"কন্যাকেও এইরূপে পালন করিবে ও অতি যত্নে শিক্ষা দিবে এবং তৎপরে ধনরত্ন সমন্বিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে প্রদান করিবে।"

ইহাতে বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ, আমাদের কল্পিত আদর্শ-দম্পতী 'এক সৃষ্টিছাড়া' কল্পনাসম্ভূত নহে। আমাদেরই শাস্ত্র বলেন,—কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া তৎপরে জ্ঞানবান্ বরকে প্রদান করিবে; কন্যার সে শিক্ষা আমাদের সমাজে এখন আর নাই,—সে জ্ঞানবান্ বরও আর নাই; কাজেই সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দশা। তাই আজ আমাদিগকে ঐরূপ দম্পতী কল্পনায় আঁকিয়া লইতে হইতেছে।

শিষ্য। এক্ষণে তবে বলুন, আমাদের আদর্শ-দম্পতীর মধ্যে স্ত্রী কিরূপ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

গুরু। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যে কিশোরী অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাকে আমাদের সেই কাল্পনিক রমণী মনে কর। স্বীকার করিয়া লও যে, এই সময়ের পূর্ব্বে সে বয়স ও ক্ষমতানুরূপ সমস্ত মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষা সকল প্রাপ্ত হইয়াছে,—এবং গৃহকর্ম্মাদি যতদূর সম্ভব, শিক্ষা করিয়াছে। মনে কর, সমস্ত লঘুচিত্ত এবং পাপাসক্ত সংসর্গ হইতে এবং অপকারক প্রেমের গল্প হইতে সুরক্ষিতা ও সামান্য লঘু, পুষ্টিকর এবং অনুত্তেজক আহার দ্বারা পরিপুষ্টি হইয়াছে। তৎপরে উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা মলমূত্রের যন্ত্রসকল সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত কিশোরীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া নিজের বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত দৈবিক এবং ইন্দ্রিয়সুখকর-বিষয়-পরিত্যক্ত প্রেম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্চকাল্পনিক গল্প সকল তাহার নিকটে বলিতে

থাক ; আর শরীরের কোন স্থানের রক্ত চলাচলের অনায়াস-গতির ক্ষতি-কারক পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারাদির দ্বারা বৃথা গর্ব্ব কিংবা প্রচলিত রীতির জন্ম ভূষিত অথবা অলঙ্কৃত না কর, তাহা হইলেই কাল্পনিক কিশোরীর শিক্ষার-জন্ম যাহা করা উচিত, তাহা তাহা করা হইল। এক্ষণে জানিয়া রাখ, প্রাগুক্তরূপে শিক্ষিতা কিশোরী যৌবনে পদার্পণ করিলেও অথবা যৌবনের পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইলেও পুরুষের বাহুপাশের জন্ম লালায়িত হইয়া কখনই কষ্ট অনুভব করিবে না।

নিশ্চয়ই জানিও যে আমাদের অস্বাভাবিক এবং অস্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন জন্মই আমাদের কামরিপুর এত দুর্দান্ত প্রতাপ,—এবং প্রেম-আলিঙ্গনকে আমরা কামরিপুর সন্তোষ-বিধায়ক বলিয়া মনে করি। অনেক সময়ে ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রচুর আহার করি এবং সন্তানদিগকেও ঐরূপ অতিরিক্ত আহার করিতে বাধ্য করি। কেবল রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্ম নিশ্চিত ক্ষতিকারক এবং উত্তেজক জানিয়াও আমাদের পাকস্থলীতে অনেক খাদ্য-দ্রব্য প্রবিষ্ট করাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির এত অন্ধ ভক্তিদ্বারা আমাদের সমস্ত দেহপ্রণালী বহুকাল-স্থায়িরূপে আক্রান্ত এবং উত্তেজিত হয়,—ইহাতে দেহের যন্ত্রবিশেষে রক্ত সঞ্চয় হইয়া বিবিধ রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে। মুক্ত সমীরণ, দ্রুত শারীরিক ব্যায়ামাদির দ্বারা এই মন্দ ফলের কতক পরিমাণে নিবারণ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের যুবকেরা সে বিষয়েও একেবারে বিমুখ। এই স্থানেই মন্দের শেষ হইল না,—এই অকর্ম্মণ্য জীবন এবং অতিশয় পরিপক্ক ও উত্তেজক রিপুসকল কামেচ্ছার উত্তেজনা অবস্থাতে দেহ-প্রণালীকে রক্ষা করিতে অপারগ হইল বলিয়াই যেন, মানসিক উত্তেজক বিষয় সকলকে—যাহার তাহাদের সূক্ষ্মভাবপ্রযুক্ত অধিক ক্ষমতাশালী এবং অধিক হৃদয়ভেদী—ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক নভেল, ভাবরস-

পূর্ণ প্রেমের গল্প, গাথা ও কবিতা-আকারে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। হয় ত যখন যুবকেরা বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম বা জনহিতৈষণা বিষয় লইয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন,—এমন সময় ঐ সকল বিষয়ে তাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইলে তাহারা একেবারে মজিয়া মরিয়া ডুবিয়া যায়।

যুবকগণকে বিধ্বংস করিবার আর এক মোহমুদ্গর, আমাদের সমাজের প্রৌঢ়গণ। নিষ্কর্ম্মা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিহীন ও জীবনের দায়িত্বপরিশূন্য অনেক প্রৌঢ় ঐ সকল যুবকগণের সম্মুখে অবৈধ প্রণয়প্রসঙ্গের গল্প করিয়া, কিংবা কোন ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকের সতীত্বধর্ম্ম ও সৎনাম বিনষ্ট করিয়া আনন্দ উপভোগ করে; অথবা সমাজ-কণ্টক বেশ্যাগণকে আনাইয়া তাহাদের নৃত্যগীত ও হাবভাব লইয়া আমোদ উপভোগ করে, অথবা তাহাদের বিষয় লইয়া গল্পগুজব করে, কিংবা তাহাদের নরকালয়ে যাতায়াত করিয়া থাকে। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিতেছি যে, এইরূপ নৈতিক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক—যাহারা সাধারণতঃ আমাদের সমাজের আদর্শ স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে—তাহাদের সংখ্যা সমাজে অল্প পরিমাণে বিদ্যমান নাই। এক কথায় ঐ সকল অসৎ আক্রমণ হইতে আমাদের কাল্পনিক যুবককে রক্ষা করিতে হইবে।

আরও এক উপসর্গের কথা বলিতেছি,—আমাদের দেশে যে বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ঘৃত মানবের স্বয়ম কল্যাণপ্রদ পদার্থ হইলেও উহার আধিক্য বা অপব্যবহারে যেমন ঘোরতর অনিষ্ট ফল উৎপাদন করে। তদ্রূপ বর্ত্তমানকালে ঐ বাল্যবিবাহ অত্যন্ত কুফল উৎপাদন করিতেছে। আমাদের দেশের পিতা মাতা বা আত্মীয় অভিভাবকগণ কিশোরবয়স্ক পুত্র, ভ্রাতা বা আত্মীয়ের সহবাস-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সহজে অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠেন এবং একটি কিশোরীকে আনিয়া তাহার সহশায়িনী করিয়া দিয়া আপন আপন দায়িত্ব হইতে মুক্ত

হইলেন ভাবিয়া আনন্দিত হয়েন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, কিশোরী এ অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্বামীর শয্যার নিকট যাইতে শিহরিয়া উঠিয়াছে,—কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে—ভয়ে থর থর কাঁপিয়াছে; কিন্তু তথাপি বালিকার শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, এমন কি মাতা, ভগিনী প্রভৃতি সেই কিশোর-কিশোরীকে নানাপ্রলোভনে—নানা কৌশলে—বহুবিধ তাড়নায়, স্বামীর সহিত এক গৃহে—এক শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। কিসের জন্য জান কি? দুঃখ, পীড়া এবং ক্ষুদ্র জাতি বিস্তারের জন্য। কিন্তু মাঝি যদি ভাল থাকে, তবে প্রবল ঝড়-তুফানেও যেমন নৌকার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষায় যুবকের মনে যদি ধর্ম্মজ্ঞান দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া থাকে—তাহা হইলে, ঐ সকল অসৎকার্য্য তাহার চিত্তকে কোনরূপে বিচলিত বা কলুষিত করিতে পারে না। কিন্তু হায়! আজি কালি চারিদিকেই সেই দৃঢ় ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিতে প্রত্যেক চেষ্টাই সংসাধিত হইতেছে। অতএব দৃঢ়বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ যুবক কোথায় যাইবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কল্পনার দ্বিতীয় প্রবাহ।

শিষ্য। আমরা যে কাল্পনিক সৃষ্টিতে কিশোর ও কিশোরীকে আদর্শ করিয়াছিলাম, এই স্থলেই তাহাদের বিবাহ হওয়া প্রয়োজন বলিয়াছেন;—এক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত?

গুরু। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। বিবাহ হইলেও উভয়ে

উভয়কে লইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। উচ্চ আদর্শ, উচ্চভাব—উচ্চ কর্ম্ম লইয়া উভয়ে আলোচনা করিবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম তাহাদিগের আলোচনার বিষয় হইবে। কি প্রকারে সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিদূরিত হইবে, কি প্রকারে দেশের, দশের ও সমাজের অভাব অভিযোগ বিনষ্ট হইবে, তাহার চিন্তা ও চেষ্টা করিবে এবং নিজ পরিবারবর্গ—আত্মীয় স্বজন কিসে সুখী হইবেন, কিসে আনন্দিত হইবেন,—এই চেষ্টাতে সতত নিযুক্ত হইবে। সহবাস-ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপায় এই সকল সৎকর্ম্মে সতত নিযুক্ত থাকা। ক্রমে উভয়ে পূর্ণযৌবনে উপস্থিত হইবে।

উভয়েই পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মের অধীন থাকিয়া শিক্ষিত হইয়াছে, নীরোগ এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন,—একটি কণিকারও পাপজনক কিংবা অবৈধ আমোদে অপব্যয় হয় নাই;—অতি নিয়মিত এবং মিতাহারী স্বভাবপ্রযুক্ত তাহাদিগকে লোলুপ সহবাস-ক্ষুধাতিশয্য উত্তেজিত করে নাই। ফল কথা, আমাদের কাল্পনিক দম্পতী অতি উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের জীবন কেবল উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, বরং জীবন যে গভীর দায়িত্ব ও কঠোর কর্ম্মের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ লক্ষ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা উভয়েই যেন পরস্পরকে পবিত্র বিবাহ-বন্ধন দ্বারা উন্নত করিতে—ভক্ত করিতে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্রমাভিব্যক্তির উন্নতি সাধন করিতে অভ্যাস করিয়াছে এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাহাদের কর্ম্ম-সকলকে সরল এবং একসুরে গাঁথাগাঁথি করিয়া দিয়াছে। তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে,—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"—অর্থাৎ মানুষ সর্ব্বদা বিষয়ের চিন্তা করে, সেই বিষয়ের জন্য তাহার আসক্তি হয়। অথবা—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিস্তস্য চ তাদৃশী"—অর্থাৎ যাহার যে প্রকার ভাবনা, তাহার সেই প্রকার সিদ্ধি—এই সতর্ক বাক্যের তেজ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই জন্য

তাঁহাদের অন্তরে পবিত্র, কোমল অতিশয় প্রেমবারিপূর্ণ এবং সাহায্যকারী ভাবনা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় না। তাহারা জানিয়াছে যে, মানুষ তাহার হৃদয়ে যেরূপ চিন্তার ছবি অঙ্কিত করে,—স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহাই প্রতিফলিত হয়। ইহা অবগত হইতে পারিয়াই তাহারা মহৎ আদর্শের উচ্চস্থান অধিকার করিবার জন্যই যেন জ্ঞানপূর্ব্বক মনকে সুগঠিত করিয়াছে। তাহারা এই সত্য ও সার সংগ্রহ করিয়াছে যে, স্বভাবের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করিতে পারিলে এবং স্বভাবের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, ধর্ম্ম এবং সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়; আর তাহার বিপরীতাচারী হইলে পাপ ও কষ্ট অর্জ্জন করিতে হয়। এই সত্যজ্ঞানে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে,—গার্হস্থ্য-যজ্ঞে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে আচার্য্য ও হোতৃরূপে অবস্থিত, প্রেমের বহ্নি জ্বালিয়া তাহাতে কর্ম্মাহুতি দিতে পারিলে, তবেই তাহাদের জীবন সার্থক হইবে। এই যজ্ঞফলে তাহাদের যে সন্তান জন্মিবে,—সে সমাজের কল্যাণকর রত্ন হইবে। যে সন্তান জন্মিবে, সে যদি বংশের, সমাজের, দেশের ও দশের উপকার না করিল,—সে যদি জ্ঞানের উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়া দেশের মুখ আলোকিত না করিল, সে, যদি আপনার পবিত্র স্বভাব দ্বারা অপর দশজনকে সৎপথে না আনিল; তবে তেমন সন্তান লইয়া কি হইবে? অতএব সৎসন্ততি লাভই তাহাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

উদ্দেশ্য সেরূপ হইলে, নিকৃষ্ট রিপুর নিকট আত্মজয় করিতে হইবে,—উভয়ের রেতঃসংযম করিতে হইবে,—উপযুক্তভাবে বর্দ্ধিত সবল ও সুস্থকায় দম্পতীর পক্ষে উপযুক্ত সময়ে একবার প্রেমালিঙ্গন করিলে, জরায়ুতে গর্ভধারণ বিষয়ে যথেষ্ট হয়। অধিক বা অসাময়িক প্রশ্রয় দ্বারা কেবল উৎসাহ এবং বীর্য্য নষ্ট করা হয় মাত্র। আমাদের আদর্শ-দম্পতী সর্ব্বদা অধিকতর কার্য্যসকলে অভিনিবিষ্ট থাকায় এবং জ্ঞানরাশি হৃদয়ে পোষণ

করায় ও সুস্থদেহে অবস্থান করায়, তাহাদের কুপ্রবৃত্তি বা কামরিপুর উত্তেজনা আদৌ হইতে পারে না। তাহারা যে দৈহিক-সংযোগ সংসাধিত করে; তাহা কেবল সৎসন্তান লাভ করিবার জন্য।

সৎসন্ততি লাভ করিবার জন্য আমাদের আদর্শ-দম্পতী যে দৈহিক সংযোগে মিলিত হয়, তাহার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে দীর্ঘজীবী এবং সমাজের আদর্শ পুরুষ হইয়া থাকে। আর নিত্য—অনিয়মিত সহবাস-ক্ষুধার পরিতৃপ্তিজন্য যাহারা দৈহিক সংযোগে মহাপাতক সঞ্চয় করে, তাহাদের যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা অল্পায়ুঃ, অল্পবুদ্ধি এবং বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। বিবাহ করা নিকৃষ্ট রিপুর নিকৃষ্ট লালসা পূর্ণ করিবার জন্য নহে,—প্রেম আর সুসন্তান লাভের জন্য। কিন্তু রিপুর তাড়নায়—সে সম্বন্ধ ভুলিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, নিত্য দৈহিক সংযোগ করা পশুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমি আশা করি, এ সকল বিষয় তুমি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবে এবং যাহাতে এ বিষয় সকলকে ভালরূপে শিক্ষা দিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।

পাশ্চাত্য দেশে আপন আপন ছেলে মেয়েকে এ সকল কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ডাক্তার এম্, এল্, হলব্রুক সাহেব তাঁহার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পরিশিষ্টে, ফরাসীভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া, একটি সত্য ঘটনার সম্পূরণ করিয়া দিয়াছেন। উহার লেখিকা একটী রমণী,—তিনি তাঁহার কন্যাকে কেমন সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়াছেন, শুনিয়া রাখ।

মাতা বলিয়াছেন,—

"আমি একটি ফুল বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম। ফুলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে পার্থক্য, বর্ণ-সৌন্দর্য্য গঠনের মনোহারিতা এবং কোমল পরদা সকল

অবস্থিত,—তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিলাম। এই সকল অংশকে কি বলে; ক্রমে ক্রমে তাহাও তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। কুসুমের পরাগ গুলি তাহার ছোট ছোট সুন্দর অঙ্গুলিতে মাখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল, যেন তাহার সুন্দর অঙ্গুলিগুলিতে সুন্দর সুবর্ণের চূর্ণ লাগিয়া গিয়াছে,—সে গুলির কথাও তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে পরাগগুলি আরও ভাল করিয়া দেখাইয়াছিলাম—কেবল চক্ষুর দ্বারা নহে, সে গুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছিলাম। এই সকল গুঁড়া যে অসংখ্য-রেণুদ্বারা উৎপন্ন, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছিলাম।

বীজকোষগুলি অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াছিলাম এবং তাহাকে দেখাইয়াছিলাম যে, নলের শেষে ডিম্বকোষ রহিয়াছে,—যাহাকে আমি ছোট ছোট সন্তানে পরিপূর্ণ ছোট একটি বাটী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। পরাগগুলি গর্ভকোষের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, তাহাও দেখাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, যখন বাতাস কিংবা কীট দ্বারা এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভকোষে পতিত হয়, সেই সময়ে ঐ অণু সকল মরিয়া সামান্য জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং নলদ্বারা চালিত হইয়া যেখানে ছোট ছোট সন্তান বাস করে, সেই কুটীরে প্রবেশ করে। এই সকল ছোট ছোট সন্তানগুলি ছোট ছোট ছোট ডিম্বের মত। প্রত্যেক ছোট ডিম্বে একটি অদৃশ্য ছিদ্র আছে, যদ্দ্বারা ঐ জলবিন্দু ভিতরে প্রবেশ করে। যখন পরাগের এই জল, জরায়ুর ভিতরের অন্য একটি আশ্চর্য্য-জনক শক্তির সহিত মিশ্রিত হয়, তখন তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, জীবন প্রদান করে এবং ডিম্ব সকল বর্দ্ধিত হইয়া শস্য কিংবা ফলে পরিণত হয়। কতকগুলি গর্ভকোষযুক্ত এবং কতকগুলি পুংকেশরযুক্ত ফুল তাহাকে দেখাইয়াছিলাম। আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, গর্ভকোষগুলি ছোট ছোট মাতা এবং পুংকেশরগুলি ছোট

ছোট পিতা। এইরূপে এই কোমল বিজ্ঞানের বীজ এই নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে এবং অনুসন্ধিৎসু মনে বপন করিয়াছিলাম, যাহা মাতা বৃথা-লজ্জা বশতঃ যদি স্কুল-সঙ্গীদিগের শিক্ষার উপর রাখেন, তাহা হইলে তাহা অতিশয় অশ্লীলতাতে অধঃপতিত হয়। আমার ছোট বালিকা যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা করুক; আমি তাহা হইলে তাহাকে সমস্ত উদ্ভিদের ক্রিয়ার উপদেশ দিব এবং এই প্রভেদ বলিয়া দিব যে উদ্ভিদের ন্যায় মনুষ্যেরও সমস্ত বিষয় ঠিক ঘটিয়া থাকে; প্রভেদ এই যে, উদ্ভিদে যাহা অজ্ঞাতসারে ঘটে, আমরা তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক করিয়া থাকি এবং উপযুক্ত পরিচালিত সমাজে একজন—যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে সে তাহারই সহিত সংযুক্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাম ও প্রেম।

শিষ্য। প্রেমলাভ মানুষের উদ্দেশ্য, কাম একান্ত পরিত্যাজ্য ; অতএব কাম ও প্রেমের অর্থটা একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। ধর্ম্ম' অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—চারিটি অপবর্গ বা পুরুষার্থ। অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, পুরুষকার দ্বারা জীব ইহাদিগের অর্জ্জন করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ইহকালের সুখ-সৌভাগ্যাদি-প্রয়োজক ধনরত্ন এবং মোক্ষ বা মুক্তি, এই তিনের ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহাই কাম। তাহা হইলে ধর্ম্মও কাম নহে, অর্থ-চিন্তন ও উপার্জ্জনও কাম নহে এবং মুক্তির চেষ্টা বা তদ্বিষয়ক কার্য্যও কাম নহে। এই তিন কার্য্য ভিন্ন কাম। তবে কাম কি? কামনাই ত কাম। ধর্ম্মাচরণ—যাগ যজ্ঞাদি সমস্তই কাম্য কর্ম্ম, অর্থ চিন্তা, অর্থ-উপার্জ্জন, অর্থ-সংগ্রহ ঐ সকলও কামসম্ভূত বা সকাম কর্ম্ম,—অতএব উহাও সকাম। মোক্ষ চাই,—আমি এই দুঃখজাল-জড়িত সংসার হইতে মুক্তি চাই' এবং তজ্জন্য আমার যে চেষ্টা বা তৎসম্বন্ধে আমার যে কার্য্য, তাহাও সকাম'—কেন না, তাহাতেও আমার ইচ্ছা বা কামনা আছে। পণ্ডিতগণ এ সকলকেই কাম বলিয়াছেন—কিন্তু এ সমুদয়ই যদি কাম হইল,—তবে আবার কাম একটী পৃথক বিষয় বলিয়া অভিহিত হইল কেন? অতএব বুঝিতে হইবে,—কাম স্বতন্ত্র পদার্থ বা বিষয়।

যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মই বল, আর অর্থসংগ্রহই বল এবং মোক্ষ-চেষ্টাই বল, এ সকল যদি আত্মসুখবর্জ্জিত হইয়া হয়, তবে তাহা কাম নহে। আত্ম-সুখ জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কাম,—এবং ভগবানের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাই প্রেম। যাহা সকাম, তাহাই বন্ধনের কারণ; যাহা নিষ্কাম, তাহাই মুক্তির হেতু। শাস্ত্র বলেন,—

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয়—আপন আপন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

ইহাতে কামের কথা অতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই কাম কি প্রকারে মানুষকে বন্ধনের পথে লইয়া যায়, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অ, ৩৭ শ্লোঃ।

"এই কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়; ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র, ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে।"

এখন কথা হইতেছে, কাম ও ক্রোধ কি পৃথক্? তাহা নহে, কাম ও ক্রোধ দুইটির নামোল্লেখ হইলেও একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে,—অতএব কাম ও ক্রোধ পৃথক্ বিষয় নহে। কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। তবেই দেখ, কামই ক্রোধ হয়, কামই দুষ্পূরণীয় এই মহাশন। কাম দুষ্পূরণীয় এই জন্য যে, আমি যখন দারিদ্র্যের কঠোর

জ্বালা মস্তকে লইয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার একটি চাকুরী জুটাইতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তাহা হইলেই আমার কামনার সাফল্য হয়। মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার কামনা বুকে করিয়া, কত লোকের দ্বারস্থ হইয়াছি। তারপর মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রার সংস্থান হইল; যেমন হইল, অমনি বাসনার আগুন আরও বর্দ্ধিততেজে লক্ লক্ করিয়া উঠিল,—বিংশতি মুদ্রার আশা হইল। তারপরে বিংশতিও হইল,—তবু কামনার নিবৃত্তি নাই। বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি, পঞ্চবিংশতি হইতে পঞ্চাশৎ, পঞ্চাশৎ হইতে শত, শত হইতে পাঁচশত,—তথাপি কামনার কি নিবৃত্তি আছে? ক্রমেই অভাব—ক্রমেই কামনার যাতনা; এইরূপ সর্ব্বত্র। দরিদ্র ভিখারী ভিক্ষাদাতা গৃহস্থ হইতে চায়, গৃহস্থ ধনী হইতে চায়, ধনী রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইতে কামনা করে। এইরূপ কামনার অনল সর্ব্বত্র। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কামকে মহাশন বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মহাশন অর্থে যাহার আহারে তৃপ্তি নাই। তাই শ্রীভগবান্ সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৩ অ, ৩৮-৪১ শ্লোঃ।

"যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরবৈরী, দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহারা (কামের) আবির্ভাব স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছান্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।"

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে জানা গেল যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করা হউক, অর্থোপার্জ্জন বা অর্থ সংগ্রহই করা হউক, আর মোক্ষজনক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান কৃত হউক—সে সকল নিজের সুখের জন্য, আত্ম প্রীতিলাবের জন্য হইলেই তাহা কাম; আর অনাসক্ত হইয়া বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থ কৃত হইলে, তাহা কাম না হইয়া প্রেম।

প্রেম আত্ম বলিদান। আপনাকে না বুঝিতে পারিলে প্রেম হয় না। কিন্তু সেই আপনার সুখ, আপনার প্রীতি ভগবানে অর্পিত হইবে। তিনি আছেন, আর আমি আছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্বরূপ ভগবান, আমার কি আছে তাঁহার শত শত আছে। প্রভো! তোমাকে কত লোকে কত দিতেছে, আর আমি ক্ষুদ্র আমার ত কিছুই নাই, আমি তোমাকে কি দিব? তুমি কি আমার পানে চাহিবে না? এ হৃদয় যে তোমারই—যাহা তোমার, তাহা তুমি নিবে না কেন?

স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে যাহাকে কাম বলিয়াছি—তাহাও এই অর্থে বলিয়াছি। সেখানে কেবল আত্ম সুখের জন্য, জঘন্য রিপুবিশেষের চরিতার্থতা জন্য, সংমিলন—কাজেই সেখানে কাম। আর যেখানে ভগবানের শুভ ইচ্ছা সম্পূরণ জন্য—স্বদেশ, স্বজাতি, ও স্বধর্ম্মের হিতকামী সন্তান উৎপাদন জন্য—দৈহিক সংমিলন—সেখানে প্রেম।

মানুষ জানে, এই দু'দণ্ডের সংমিলনের পর এক অবসাদকষ্ট সমুপস্থিত হইবে,—মানুষ জানে যে দৃপ্ত উত্তেজনা, অপূর্ব্ব আনন্দ, বিপুল বীর্য্য অসীম কবিত্ব লইয়া সে দৈহিক সংযোগের জন্য ছুটিতেছে, দু'দণ্ডের ক্রিয়ান্তে তাহা সমস্তই হারাইয়া ফেলিবে, তথাপি সে ধাবিত হয়,—কেন হয়, জান কি? ঐ কামের তাড়নায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে জানে; কিন্তু বিধিপূর্ব্বক জানে না,—কাম তাহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে বলিয়া সে জানে না, বা জানিতে পারে না। কাম-নাশ পূর্ব্বক প্রেম সঞ্চয় করিতে পারিলে জানিতে পারিত,—বুঝিতে সমর্থ হইত, তাহার কর্ত্তব্য কি, সুখ কি, আনন্দ কি এবং এই মিলনের উদ্দেশ্যই বা কি।

এই জগতে এমন এক শক্তি আছে,—এমন এক আকর্ষণ আছে—যদ্দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত হইয়া থাকে। এ আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং মানবের উন্নতি-বিধায়ক। এ উন্নতি দেহে ও আত্মায়। নিকৃষ্ট রিপুর উত্তেজনায়—বীর্য্যক্ষয়ে ইহার অন্তরায়। অতএব যাহা সুখ—যাহা আনন্দ, যাহা অপূর্ব্ব ও অপার্থিব,—যাহা পাইলে আমরা নিত্যানন্দ লাভ করিতাম, তাহা ঐ নিকৃষ্ট রিপুর বশে হারাইয়া ফেলি; আর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে তাহারই সাধনা করা হয়, তাহারই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্মিলনী-শক্তি।

শিষ্য। স্ত্রী-পুরুষের এই যে আকর্ষণ, ইহা প্রেম না কাম?

গুরু। যাহা আত্ম-সুখেচ্ছায় সম্পাদিত হয়, তাহা কাম; যাহা নিষ্কাম ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাই প্রেম।

শিষ্য। মানুষের মধ্যে আত্মসুখের জন্যই বোধ হয় এই প্রেম বর্ত্তমান আছে।

গুরু। সর্ব্বত্র নহে। সতী স্ত্রীর প্রেম, আত্মসুখার্থে নহে। স্বামীর সুখের জন্য—সন্তানের সুখের জন্য—আত্মার উন্নতির জন্য, সতীর পতি প্রেম। নতুবা স্বামীর মরণে জ্বলন্ত চিতায় সতী পুড়িয়া মরিতে পারিত না,—ব্রহ্মচর্য্যের সংযম-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত না।

শিষ্য। কিন্তু সে সহস্রে একটি।

গুরু। তা হইতে পারে,—ফল আছে।

শিষ্য। কিন্তু মানব যে কামের অনল-উত্তেজনা বুকে করিয়া ছুটাছুটি করে—নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার শত বাহু লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়,—কামের এ কোন্ মূর্ত্তি? এত আকাঙ্ক্ষা, এত উচ্ছ্বাস বোধ হয় কিছুতেই নাই। ইহার কারণই বা কি এবং নিবৃত্তির উপায়ই বা কি,—তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন জন্য যে নির্ম্মল আনন্দ, প্রকৃতি অংশসম্ভূতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলনানন্দের অনুভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির যে রস উপভোগ করাইবার বাসনা,—সেই

বাসনাতে রমণী পুরুষে আসক্ত হয়। এই মিলনের দেবতার নাম মদন। এ মদন প্রাকৃত।

শিষ্য। রমণী কি প্রকৃতির অংশ?

গুরু। হাঁ!

সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমা মধ্যমাধমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২।১।১৪০।

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম সমুদয় স্ত্রীলোকই প্রকৃতির অংশসম্ভূতা। তন্মধ্যে যাহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সুখসম্ভোগবত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২।১।১৪১।

যাঁহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই মধ্যমা অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২।১।১৪৩।

"যাহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং অজ্ঞাত-কুলোৎপন্না, তাঁহারা তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

কালাংশাংশ-সমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২।১।১৩৭।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, তৎসমস্তই হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহাদিগের অবমাননা করিলে, প্রকৃতির অবমাননা করা হয়।

শিষ্য। প্রকৃতির অংশ বলিয়াই ত পুরুষের তাহাতে ভোগবাসনার আকুল উন্মাদনা হইয়া থাকে।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। বিবেকিগণ রমণীকে নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গুরু। কাজেই তাহা। কারণ, রমণীর উপরে আসক্তি থাকায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া তাহাতে মজিয়া পড়ে এবং তখন পুত্রকন্যাদি উৎপন্ন হওয়ায় মোহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে।

স্ত্রী-সঙ্গাজ্জায়তে পুংসঃ সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥

"বীজের অঙ্কুর হইতে ফলপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যোষিৎসঙ্গ হইতে পুত্র, গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মে।"

এই মহাবাক্যের দ্বারা অবগত হইতে পারা যাইতেছে যে, পুরুষগণকে সংসার-অনলে বাঁধিবার জন্যই বিধাতা প্রকৃতির অংশ দিয়া রমণীরূপা মোহময়ী প্রতিমার সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য। সকলে বলিয়া থাকে, বিধাতার সৃষ্টি-কার্য্যের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। তবে কেন, যাহাতে পুরুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে, মুক্তি হইতে দূরে রহে; —মোহে মজিয়া অধোনতির অর্গলহীন পথে প্রধাবিত হয়, এমন মোহরূপ রমণীর সৃষ্টি করিলেন?

গুরু। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—ব্রহ্মা সনক-সনাতনাদি মানস-পুত্রগণকে সৃষ্টি করিয়া, মানুষ প্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু

তাঁহারা কেহই সংসারে আসক্ত হয়েন না। সকলেই ভগবানে চিত্ত সংন্যাস করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন। তখন ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলে, তিনি উপদেশ দেন,—আনন্দের আকর্ষণ না থাকিলে, বৃথা কেন জীব মত্ত হইতে যাইবে? আকর্ষণ চাই। অতএব প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা রমণীর সৃষ্টি কর—পুরুষ আসক্ত হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হউক—আবদ্ধ হইয়া পড়ুক। তাই—

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং স্রষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ সৃষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৪।৬১।৩৪।

"বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তদন্যথায় সৃষ্টি সম্ভব না হওয়ায়, ঈশ্বর-আজ্ঞায় হইয়াছে।"

সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাম্।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ঃ পরঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৪।৬১।৩৫।

"নারীরূপ সর্ব্বমায়ার করণ্ড (চুপ্‌ড়ী) মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল, তপস্যার বিঘ্নকর এবং অশেষ দোষের আকর-স্বরূপ।"

কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুত।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা॥
বিষকুম্ভো দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমম্।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৪।৬১।৬৬।৩৭।

"রমণী কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড়-স্বরূপ এবং উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে

বিষম দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখভ্রমে প্রজ্বলিত প্রদীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানাবদ্ধ জনগণ আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে।"

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

"অজিতেন্দ্রিয়ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন পূর্ব্বক তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গবৎ অন্ধ হইয়া নরকে পতিত হয়।"

নানারসবতী চিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মুনে।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহ হি সংস্থিতিঃ।

যোগবাশিষ্ঠ্য রামায়ণ, ১।২১।২২।

"হে মুনে, নানাবিধ রসবিশিষ্টা ও বহুরূপে চিত্রিতা এই ভোগভূমি কেবল স্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে।"

মন্দুরাঞ্চ তুরঙ্গাণামালানমিব দন্তিনাম্।
পুংসাং মন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনাঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ্য, ২১।৩১।৬১।

"বামলোচনাগণ তুরঙ্গগণের মন্দুরার ন্যায়, মাতঙ্গগণের আলানের ন্যায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষদিগের সংসার-বন্ধনের কারণ হয়।"

মায়ারূপং মায়িনশ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যা অপ্যবাঞ্ছিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২।১৬।৬১।

"পূর্ব্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াজীবনের মায়াস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা বিষরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছে,—অতএব ইহারা মুমুক্ষু-

দিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে,—(এই সংসারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে।) প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্র-ভূত স্ত্রীজাতিও জীবসমূহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোররূপা স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উঁহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে, উঁহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব, সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।"

শিষ্য। কামিনীগণকে যেরূপ বীভৎস চিত্রে শাস্ত্রকারগণ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ! কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, রমণীই এই সংসার-মরুক্ষেত্রে জল-পাদপ। রমণী না থাকিলে, জীব-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইত না এবং মানুষ দু'দণ্ডের জন্যও সংসারে তিষ্ঠিতে পারিত না।

গুরু। হাঁ, তাহা নিশ্চয়। জীব-প্রবাহ পরিবর্দ্ধন ও সংসারের শান্তি-বাঁধন বলিয়াই মুক্তিপ্রার্থী পুরুষগণ স্ত্রীজাতিকে অত ভয় করিয়াছেন।

শিষ্য। সে দোষ স্ত্রীলোকের, না পুরুষের?

গুরু। পুরুষের দোষ নাই,—লৌহ যে চুম্বকের দিকে প্রধাবিত হয়, ইহা চুম্বকের আকর্ষণ; লৌহের দোষ নহে।

শিষ্য। তবে আপনি বলিতে চাহেন, স্ত্রীলোকে এমন কোন আকর্ষণ আছে, যাহাতে পুরুষ তাহার দিকে না গিয়া থাকিতে পারে না?

গুরু। তা ত নিশ্চয়ই।

শিষ্য। কিন্তু অনেক লোক রমণীর সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ পদদলিত করিয়া, রমণীকে অতি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

গুরু। সাধনবলে তাহা হইতে পারে; কিন্তু রমণীকে ঘৃণা করিলে, রমণীকে উপেক্ষা করিলে রমণীকে জয় করা যায় না। বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যোগবলশালী মুনি-ঋষিগণের কথা বোধ হয় জান,—তাঁহারা রমণীকে ঘৃণা করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এক এক দিন সেই বহুদিনের সংযম বাঁধ ধসিয়া তপোভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। আমি ভর্ত্তৃহরি, বিল্বমঙ্গল, শিহ্লনাচার্য্য প্রভৃতির কথা বলিতেছি।

গুরু। কি বলিতেছ?

শিষ্য। তাঁহারা রমণীর আকর্ষণ হইতে দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়োদ্ভূত বিবেকবাণী আজিও জ্বলন্ত অক্ষরে মানবগণকে আলোকদানে কৃতার্থ করিতেছে। শিহ্লনাচার্য্যের একটি কবিতা আমি জানি। কবিতাটি এই,—

ক তদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধর-মধু ক্কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ,
ক্কালাপাঃ কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ।
ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতবদনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং,
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্॥

একদা শ্মশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের একটি মাংস চর্ম্ম-বিহীন মস্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিহ্লনের মনে হইল,—মস্তক-কঙ্কালের মধ্যে এই দন্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গলরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ্র হইতে নিঃসরণকালে বায়ুর যে শব্দ শোনা যাইতেছে,—এতদুভয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘোর কামান্ধ মানবগণকে বলিয়া দিতেছে,—মূঢ় মানব! এই শ্মশানের নিকট দাঁড়াইয়া এই মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখ। আর যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতই না পশ্বাচার করিয়াছ, সেই স্ত্রীয় মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ,

তাহার পরিণাম,—সেই মুখারবিন্দই বা কোথায়, আর কোথায় বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার ন্যায় সমাদরে পান করিতে, সেই অধর মধু কোথায়? সেই মধুমাখা সুমধুর আলাপই বা কোথায় এবং সেই মদন-ধনুর বিলাসের ন্যায় জ্রভঙ্গীর বিলাসই বা কোথায়? এখন তাহারই এইরূপ পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া চর্ম্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া, কত আদর-গৌরব করিয়া,——কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ! অন্ধ! সেই সময়ে যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্রীসুখে অত সম্মান দান করিতে না।"

গুরু। শিহ্লনাচার্য্যের এই কবিতা অতি মধুর,——অতিশয় ভাব-ব্যঞ্জক এবং তত্ত্বোপদেশে পূর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া যে শিহ্লনাচার্য্য প্রভৃতি রমণীর আকর্ষণ জাল হইতে অব্যাহত ছিলেন, তাহা মনে করা যায় না, তবে যখন সত্তা হারাইয়া মানুষ বিফল-মনোরথ হয়, কাজেই বিবেক জন্মিয়া থাকে। আর যদি ঐকান্তিক প্রেমের বলে রমণীর আনন্দানুভবানু-ভূতিতে পরমানন্দের পানে চিত্ত ধাবিত হয়, তবে তখন নারী-পরিত্যাগ ঘটিতে পারে।

শিষ্য। এ কথার ভাবার্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি।

গুরু। রমণীতে প্রকৃতির এক শক্তি আছে; তাই রমণী প্রকৃতির অংশ। সেই শক্তিতেই রমণী পুরুষকে আকর্ষণ করে। তাহাকে মাতৃশক্তিও বলা যাইতে পারে। কেবল রমণী নহে,—জগতের যাবতীয় জীব, যাবতীয় কীট পতঙ্গ, যাবতীয় উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সমুদয় স্ত্রীজাতিতেই ঐ মাতৃশক্তি বিদ্যমান আছে। মাতৃশক্তির যখন বিকাশ হয় তখন ঐ শক্তি পুরুষের শক্তি বা পিতৃশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

প্রকৃতি জগৎ-প্রসবকারিণী; সুতরাং তিনি জগন্মাতা। প্রকৃতির অংশরূপিণী স্ত্রী জাতি,—স্ত্রী-জাতিরও জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ বর্দ্ধিত ও মাতৃশক্তিকে আকর্ষণ করিতেছেন। পুরুষগণ রমণীতে আসক্ত হইয়া রমণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে,—তাই পত্নীর এক নাম জায়া। রমণীর মাতৃশক্তি জানিতে হইলে প্রকৃতির মাতৃশক্তি বুঝিতে হয়। আগে সেই কথাটারই আলোচনা করা যাউক।

জগন্মাতা প্রকৃতির শক্তি দুই প্রকার। একপ্রকার ব্যাপক, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্য। প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিকা, তিনি যখন অনন্ত বিরাট্ বিশ্বের বহিরস্তরে বিরাজিতা, তখন সম্বিৎ ও সন্ধিনী—আবার যখন নিত্যে অবস্থিতা, তখন হ্লাদিনী। অগ্নি থাকিলে দাহিকা শক্তি থাকে,—তিনি যেখানে-যেখানে যে যে শক্তিতে বিরাজিত, সেই সেই স্থলে সেই সেই শক্তির পূর্ণ বিরাজ হইলেও সমস্ত শক্তির অনুভূতি থাকে। ইহাই প্রকৃতির ব্যাপিকা শক্তি। প্রকৃতির ঐ শক্তি যেমন পরিব্যাপক পদার্থ, ইহার ক্রিয়াও তেমনি সর্ব্ব-পরিব্যাপক। সমুদয় জড়বস্তুর মধ্যেই সমভাবে ইহার

ক্রিয়া হইতেছে। ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া সমুদয় জড় বস্তুর সৃষ্টি, পালন ও বিলয় সাধন করিতেছে; কিন্তু তাহা প্রত্যেক প্রমাণের গোচরীভূত হয় না। যাহা ব্যাপকভাবে থাকে, ব্যাপকভাবে সমান ক্রিয়া করে, তাহা বুদ্ধিরও বিষয়গোচর হয় না। আছে কি নাই, বলিয়া নানাবিধ সন্দেহ ও বিচারবিতর্ক উপস্থিত হয়। অনেকেপ্রকৃতির এই ব্যাপিকা শক্তিকে স্বভাবের ক্রিয়া বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকেন। মতবিশেষে, অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও অনুত্তোলনীয় ভাবে তাড়িত-পদার্থের ব্যাপক-সত্তা স্বীকৃত হয়' কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া দেখাইবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে জড়পদার্থের ক্রিয়াতে তাহার সহায়তা থাকিলেও প্রত্যেকের গোচরে আনিবার উপায় নাই। কেন না, তাহার ক্রিয়াদিও তাঁহার মত ব্যাপক,—তাহার খণ্ড বিভাগ নাই। তাহা সর্ব্বত্র সমান, সর্ব্বত্র অবিশেষ, মনুষ্যদেহ এবং মেঘ প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে সময়ে তাড়িতের ক্রিয়া দেখান যায়, সেই তাড়িত ব্যাপক-তাড়িত নহে,—তাহা ব্যাপ্য তাড়িত, সমুদ্র-গর্ভের তরঙ্গাবলীর মত উহা সেই তড়িৎ-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গবিশেষ। তরঙ্গ সমুদ্রেরই রচিত পদার্থ হইলেও ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে উহা ভিন্ন, গুণক্রিয়া প্রভেদেও ভিন্ন। সমুদ্র ব্যাপক, তরঙ্গগুলি ব্যাপ্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ক্রিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না,—তরঙ্গের ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়, তাহাও ঐ বৃহত্তাড়িত হইতেই আত্মলাভ করিয়াছে; অথচ ব্যাপ্য-ব্যাপকতা ও ক্রিয়াগুণাদি দ্বারা তাহা হইতে বিভিন্ন। ব্যাপক-তাড়িত সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উহারা কেবল এক একটি স্থান-বিশেষে বিকাশ পাইতেছে,—এজন্য উহারা ব্যাপ্য,—সর্ব্ববৃহৎটি ব্যাপক। বৃহৎটির ক্রিয়াগুণাদি ধরিতে পারা যায় না; কিন্তু ব্যাপ্যটির ক্রিয়া-গুণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অথচ বৃহৎটি না থাকিলে ব্যাপ্যটি জন্মিতেই পারে না। সমভাবে যাবৎজগতের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্রিয়াও তাহার

আছে, কিন্তু তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রকৃতির ব্যাপক মাতৃশক্তিও তদ্রূপ সবিশেষ ভাবে জগতের অস্তিত্বরক্ষা বিকাশ ও সংহার করিতেছে— সেইজন্য তাহা ধরিয়া পাওয়া যায় না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আধারে যে মাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা সেই ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়ার ন্যায় ব্যাপক নহে – অবিশেষও নহে। সেই মাতৃশক্তির ব্যাপ্য মাতৃ-শক্তি। ইহা সেই সর্ব্বব্যাপক মাতৃশক্তি-সমুদ্রেরই তরঙ্গাবস্থা বিশেষ। তরঙ্গের উপাদানে যেমন সমুদ্র, সেইরূপ ঐ ব্যাপক মাতৃশক্তি ব্যাপ্য মাতৃশক্তির উপাদান। আর ব্যাপ্যটি তাহার উপাদেয়।

ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় প্রকার মাতৃশক্তি ফলতঃ এক পদার্থ হইলেও ঐ ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে এবং ক্রিয়া-গুণের প্রভেদে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়া-গুণাদি সমস্তই সার্ব্বভৌম ও অবিশেষ; এই নিমিত্ত তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপ্য মাতৃ-শক্তির বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুণ প্রকাশিত হয়; এ নিমিত্ত উহা লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছে এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া অন্যরূপ ক্রিয়া করিতেছে; আবার মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে থাকিয়া এক এক প্রকার ক্রিয়া করিতেছে,—প্রত্যেক আধারের প্রভেদে ইহার অনুগামী গুণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আর এতৎ-সমস্তই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপক মাতৃশক্তির সমস্তই অবিশেষ; সুতরাং তাহা বুঝাইবার কোন উপায় নাই; কাজেই তাহার গুণ ও মহিমা-প্রকাশক কোন নামও নাই। অতএব তাহা অন্যকে কি প্রকারে বুঝান যাইতে পারিবে? তবে একমাত্র উপায় আছে, ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সহায়তা; ব্যাপ্য মাতৃশক্তি আগে বুঝিয়া লইলে, তাহার সাদৃশ্য ধরিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝা যাইতে পারে। প্রথমে ব্যাপ্য

মাতৃশক্তিগুলি চিনিয়া লইতে হইবে; তৎপরে তাহার প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বাদ দিতে হইবে। পরে তাহাদের সর্ব্বসাধারণের সমান যে গুণগুলি আছে, তাহা ধরিতে হইবে। তৎপরে তাহার দ্বারা সেই ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব ও ধর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে হইবে। তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্র চিনিতে হইলে, যেমন অগ্রে সেই তরঙ্গগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে হয়, তৎপরে তরঙ্গাবলীর মধ্যে যে পরস্পরের প্রভেদকারী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া গুণ আছে, যেমন কোন তরঙ্গ নিফেন, কোন তরঙ্গ সফেন, কোন তরঙ্গ অধিকফেন এবং কোনটি অল্পফেন, কোনটি অত্যুত্তুঙ্গ, কোনটি অল্পোত্তুঙ্গ এবং কোনটি দ্রুতগামী কোনটির গতি ধীর ও মন্দ ইত্যাদি,—এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। পরে তাহার শৈত্য এবং দ্রবত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে হইবে; তৎপরে তাহার সাদৃশ্যে সমুদ্রের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। ঠিক এইরূপ নিয়মেই ব্যাপ্য মাতৃত্বে দ্বারা ও ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথম ব্যাপ্য মাতৃশক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপরে তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ কারক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে; তৎপরে সেইগুলি বাদ দিয়া, সমস্ত ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সমান ক্রিয়া, সমান ধর্ম্মগুলি ধরিতে হইবে। পরে তাহার সাদৃশ্যে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হইতেছে। কোন্ কোন্ আধারে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়া—গুণের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শিষ্য। সে পর্য্যালোচনা করা আমার কর্ম্ম নহে। আপনি না বুঝাইয়া দিলে, আমার কি সাধ্য, আমি তাহাতে প্রবেশ লাভ করি।

গুরু। কেন? তোমাকে ত এই সমস্ত বিষয়ের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম।

শিষ্য। আপনি যতদূর বুঝাইলেন, তাহাতে মনে হয়, জড়ের রাজ্যে মাতৃশক্তির মহা বিকাশ হইতেছে।

গুরু। হাঁ, তাহাই। কিন্তু কেবল জড়ে নহে; চেতন পদার্থেও মহাশক্তির মহাবিকাশ বিদ্যমান, তাহা পরে বলিতেছি। কথাটার আরও একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। জড়রাজ্যে পঞ্চমহাভূত বা পদার্থ আছে, যাহা আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি——যাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামে অভিহিত। তাহা এই জড়রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব পদার্থে পরিদৃশ্যমান। তুমি আমি তাহার সমস্তগুলা না বুঝিতে পারিলেও সকলই বিদ্যমান আছে। একটা বস্তু ধরিয়া লও,—ঐ যে আমাদের সম্মুখে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়াছে, উহারই বিষয় চিন্তা কর। রূপ উহার সর্ব্বত্র,—যাহা দেখা যায়; যাহা বর্ণ-বিশিষ্ট, তাহাই রূপ— ফুলেরও রূপ আছে, রং আছে, সৌরভ আছে। উহার স্পর্শে কোমলতায় মৃদুতায় সর্ব্বশরীর পুলকিত হয়, ত্বকপ্রান্ত উজ্জীবিত হয়, পঞ্চপ্রাণ সমাশ্বস্ত হয়। সৌরভ গোলাপে আছে— গন্ধ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

এখন রসের কথা। রস উহার বাহিরে নাই;—উহার অন্তর্গতই রস-পীযুষের খনি। অভ্যন্তরে রসের কূপ খাত রহিয়াছে। সর্ব্বোত্তম রস বুঝাইতে হইলে লোকে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে উপনীত করে,—প্রাণপ্রিয়তা প্রতিপালন করিতে লোকে যাহার সঙ্গে রূপক করিয়া থাকে——সেই মধুর রসের আকর-মধু ঐ স্থানে সঞ্চিত আছে।

এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সকলই কুসুমে বিদ্যমান বুঝা গেল। বাকী এক শব্দ। তুমি বিজ্ঞান বোঝ; সুতরাং তোমাকে বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, যে স্থানে আণবিক গঠন, সেই স্থলেই শব্দ আছে,—ফাঁক থাকিলেই শব্দ থাকে। তবে চেতন

পদার্থের ন্যায় ইচ্ছাধীন শব্দ নির্গত করিতে পারে না,—এই যা প্রভেদ।

প্রত্যেক বস্তুতেই এইরূপ মহাভূতপ্রপঞ্চ বিরাজিত। তবে যাহাতে যত চৈতন্য, তাহাতে ততই ইহার অধিকতর বিকাশ; সমস্ত পদার্থেরই ক্রমবিকাশ আছে,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একবিন্দু বালুকাকণায় যাহা আছে, একটি পাদপে তাহা হইতে অনেক অধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পাদপ হইতে পশুরাজ্যে আরও অধিক,—পশু হইতে মনুষ্যে সমধিক প্রস্ফুটিত। এইরূপ মহাশক্তির মাতৃশক্তি ক্রমবিকশিত হইয়া জগতের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, মাতৃশক্তি পঞ্চমহাভূতে বিদ্যমান থাকিলেও রসে তাহার পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি। রস অন্তরের পদার্থ। রূপ বল, স্পর্শ বল, শব্দ বল, গন্ধ বল,—সকলই বাহিরের পদার্থ। ঐ সকল পদার্থের সহানুভূতিতে রসের সৃষ্টি। কেন না, রস আন্তরপদার্থ। রসই মাতৃশক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যেমন রসের কথা প্রাণে জাগাইয়া দেয়'—রসও আবার অন্তর হইতে তাহাদের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি করিয়া দেয়। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম অধ্যায়! রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা।

রসের আরও অনুসন্ধান আছে। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম অধ্যায় বা মাতৃশক্তির পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রস যখন পূর্ণভাবে বিরাজিত হয়—মাতৃশক্তির যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন রূপাদিরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল তরুলতায় এখনও ফুল ফুটে নাই, কিন্তু গর্ভমধ্যে বিকাশ হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখ, মাতৃশক্তির পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে। ঐ দেখ, গর্ভধারণোন্মুখ বৃক্ষলতাগণ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। গর্ভস্থ শশধর উদয়োন্মুখ হইলে জলধির ন্যায়

অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত হইয়া থাকে! কি যেন, একরূপ গৌরবের ছটা ফুটিয়াছে। অন্তর্গত হর্ষোৎফুল্লভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। ঐ দেখ, কি মধুর রূপের প্রকাশ। যাহা অন্য সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আসন্ন গর্ভধারণকালে তরুগণ আজ সেই বেশে সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশচিহ্ন। শরৎকালের শ্যামল ধান্যক্ষেত্র দর্শন করিয়াছ? তখন দেখিয়াছ, গর্ভধারণোন্মুখ ধান্যবৃক্ষের কি মধুর শোভা! গর্ভধারণোন্মুখ যে কোন বস্তুর নিকটে গমন করিবে, যে কোন পদার্থ দর্শন করিবে, সেই স্থলেই মাতৃশক্তির পূর্ণ প্রতিমা দেখিতে পাইবে।

উদ্ভিদ্‌রাজ্যের যে ব্যবস্থা, প্রাণি-রাজ্যেও তাহাই। তবে ক্রমবিকাশে প্রাণি-জগৎ ক্রমোন্নত, যেখানে উন্নতি, সেখানে শক্তির বিকাশ তত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাইবে। গর্ভধারণোন্মুখী স্ত্রী-কীটপতঙ্গেরও রূপ যেন উছলিয়া উঠে। শূকরী কুকুরীও ফলোন্মুখী হইলে মাতৃশক্তির প্রকাশ-চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে।

জাগতিক জীবের শ্রেষ্ঠ জীব মানবে সর্ব্বলক্ষণ অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। রমণীও গর্ভধারণোন্মুখী হইলে, তাহার শোভার বিকাশ হইয়া থাকে। যে সময় হইতে ঋতু আরম্ভ হয় এবং যতদিন তাহা বন্ধ হইয়া না যায়, তাবৎকালই গর্ভধারণের কাল। তখন রমণীজাতির শরীর হইতে আকর্ষণের ভাব সর্ব্বদাই নির্গত হইতে থাকে—উহা মাতৃ-শক্তি বা রসেরই আকর্ষণ। অধিকন্তু ঋতুকালে উহা অতি পরিস্ফুট, অধিকতর বিকশিত,—আর অন্য সময়ে আপেক্ষিক অল্প। ঋতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ কাল! উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ব্ববিধ পশুতে কেবল ঋতুকালে মাতৃশক্তির বিকাশ, কিন্তু মানবীতে সর্ব্বদাই রসের বিকাশ,—কেবল ঋতুকালে অধিক। সুতরাং এখানে মায়ের সর্ব্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই দেবগণ বলিয়াছেন,—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

আবার মহাশক্তি মহামায়াও বলিয়াছেন,—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ?

—মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

শিষ্য। কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি—ঐ সকল স্থানে মাতৃশক্তির কি ক্রিয়া হইতেছে ?

গুরু। ফুলের কথা প্রথমে বলিয়াছিলাম; সেই ফুলের উদাহরণই প্রথমে ধরিয়া লও। পুষ্পের মাতৃশক্তির ক্রিয়া কিরূপ এবং কি ক্রিয়ায় হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করা যাউক। কিন্তু সে কথা বুঝিবার আগে আর একটা কথা শুনিয়া রাখ। এই কুসুমাদির মধ্যে যেমন মাতৃশক্তি-বিকাশের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি উহাতে পিতৃশক্তিরও বিকাশ আছে। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি একসঙ্গে বিকশিত ভাবে বিরাজ করে,—হয় সেই কুসুমের মধ্যেই, না হয় তাহার সন্নিহিত সজাতীয় আর একটি বৃক্ষের কুসুমের। আবার চেতন প্রাণীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই পুত্রদেহে পিতৃদেহের বিকাশ; স্ত্রীদেহে মাতৃশক্তির বিকাশ। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে প্রতি দেহে পিতামাতা উভয়েরই সন্দর্শন হইবে। জীবমাত্রেরই দক্ষিণার্দ্ধে পিতৃশক্তি বিরাজ করিতেছেন এবং বামার্দ্ধে মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। আবার আরও কিছু দৃষ্টি-প্রসার হইলে দেখিবে, পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইবে, পিতামাতার উভয়ের পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তখন এক বস্তুকেই একবার পিতা, একবার মাতা বলিবে।

এখন যাহা বলা হইতেছিল,—তাহা শোন।—ঐ যে কুসুমটি

দেখিতেছ, উহা দেখিতে একটি কুসুম হইলেও, পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি এবং উহার গঠন-পারিপাট্যে অনেক খুঁটিনাটি আছে। উহার গঠনের মোটামুটি অবস্থা এইরূপ,—উহার মধ্যে এক গোল গোটা গর্ভকেশর আছে। কুসুমমাত্রেরই মধ্যে মধুস্থান আছে এবং কুসুমের মধুস্থানের ও নিম্নে একপ্রকার মূলপ্রদেশে অতি সূক্ষ্ম আর এক প্রকার রেণু সঞ্চিত থাকে; আর পুষ্পের বাহির হইতে শ্বেতবর্ণ ধ্বজ প্রবিষ্ট থাকে। ঐ ধ্বজাভ্যন্তরবর্ত্তী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমুদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রে আসিতেছে এবং রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। তৎপরে কুসুমাভ্যন্তরস্থ গোলাকার গোটাটি দেখিতেছে, উহা আবার একটা জিনিষ নহে। উহা গর্ভস্থ ধান্যকোষের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। ঐ কোষগুলির মধ্যে এক একটু ফাঁক আছে, তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্যদ্বারী ডিম্বাকার মন্দির আছে; উক্ত কোষসমূহের মুখদেশ হইতে পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বজ-সঙ্গত কেশরসমূহ বাহির হইয়াছে।

এখন বুঝিতে হইবে, উহার কোন্ স্থানে মাতৃশক্তি এবং কোন্ স্থানে পিতৃশক্তি বিদ্যমান আছে।

কুসুমকোষ বা বীজ-কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাসমান যে মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাই মাতৃশক্তি এবং পিতৃশক্তির লীলানিকেতন। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি উভয়েই ঐ স্থানে বিকশিত।

উক্ত উভয় শক্তির, পরস্পরের সমাগমৌৎসুক্য হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি বা বিক্ষোভ হইলেই তদ্দ্বারা ঐ অপত্যাশয়রূপ ডিম্বাকার মন্দির নির্ম্মিত হয়। বীজকোষও তদ্দ্বারাই বিনির্ম্মিত। মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এইরূপ ক্রিয়াপর হয়, তখনই উহাকে সৃষ্টিশক্তি বলে। কারণ, ঐ ক্রিয়াই ভবিষ্যৎ পুষ্পবৃক্ষের সৃষ্টিক্রিয়া। পরে এই দ্বিবিধ শক্তিদ্বারাই দ্বিবিধ রেণু বা

বীর্য্যবিশেষ নির্ম্মিত হয়। উহা পুষ্পবৃক্ষের ছায় সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা গঠিত। উহার মধ্যে পুষ্পবৃক্ষের মূল প্রকৃতি আর উহার শরীর গঠনের সূক্ষ্মতম মূল উপাদান সন্নিবেশিত আছে,—এই রেণু-নির্ম্মাণও সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া। তৎপরে যে রেণু বা বীর্য্য পিতৃশক্তির দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা ঐ ধ্বজের অন্তর্ব্বর্ত্তী,—পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পথে উদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হয়। আবার মাতৃশক্তির দ্বারা যাহা নির্ম্মিত, তাহা উদ্গীর্ণ হইয়া পুষ্পটির মূলদেশে আগমন করে,—ইহাও পিতৃ-মাতৃ শক্তির সেই সৃষ্টিক্রিয়ার অন্তর্গত ক্রিয়া—সুতরাং ইহাকে সৃষ্টি-ক্রিয়াই বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, উক্ত উভয়বিধ বীজের মধ্যেও যথাযথভাবে পিতৃ-মাতৃ-শক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের সমাগমের চেষ্টায় পিতৃশক্তি ঐ ধ্বজাগ্রবর্ত্তী পৈতৃক বীজ লইয়া মাতৃ-বীজের নিকট অধঃপতিত হয়, আবার মাতৃশক্তিও ঐ বীজ শরীরের দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখে। তৎপরে পরস্পরালিঙ্গিত বীর্য্যদ্বয় সেই মূল বীজকোষে প্রত্যাহৃত করিয়া লয়। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়ার নাম ব্যজনা ক্রিয়া,—এই নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে ব্যজনা শক্তি বলা যায় আর মাতৃ-শক্তি যে ঐ সম্মিলীত বীজকোষে আনিয়া আত্মসাৎ করে, তাহার নাম ধারণাক্রিয়া। ঐ অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণাশক্তি বলা যায়। তৎপরে পিতৃ-শক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়াই মাতৃশক্তি ঐ বীজদ্বয়কে একত্র করিয়া পুষ্পবৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় দেহের সার রস সমাকর্ষণ করিয়া, তদ্দ্বারা উহার পুষ্টি ও নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ-ক্রিয়ার নাম ভাবনা। এই নিমিত্ত এ অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ভাবনা-শক্তি বলা যাইতে পারে।

তোমাকে যে ধ্বজ আর কুসুমের কথা বলিয়াছি, তাহার অপর দুইটি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধ্বজের নাম পুংলিঙ্গ, আর কুসুমের নাম

স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজের মধ্যে পিতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে,—পিতৃশক্তির অন্য নাম পুংশক্তি; অতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন; এইজন্য উহার নাম পুংলিঙ্গ। আর কুসুমের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ওখানে মাতৃশক্তির বিকাশ হইতেছে,—মাতৃশক্তিরই নামান্তর স্ত্রীত্বশক্তি।

এখন মাতৃশক্তির পরবর্ত্তী ক্রিয়া শ্রবণ কর। উক্ত বীজকোষে রাখিয়া পোষণ করিতে করিতে, যখন উহা বৃক্ষত্ব লাভের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় পুষ্পবৃক্ষের মাতৃ-পিতৃ-শক্তি দ্বিধাভূত হইবে। একাংশে যে জাতীয় পুষ্প, সেই জাতীয় বৃক্ষেই থাকিবে; অপরাংশে ঐ বীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্টা হইবে। পরে উহাকে মৃত্তিকারূপে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবে। ভাবনা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এই ক্রিয়া পর্য্যন্ত পালন-ক্রিয়া। অতএব এই অবস্থায় মাতৃ-পিতৃ-শক্তিকে পালন-শক্তি বলা যায়। পরে যখন মাতৃ-পিতৃ-শক্তির সমাগম শেষ হইবে, তখন তাহারা অন্তর্হিত হইবে। তখন ঐ বৃক্ষের দেহাবয়ব-সমূহ বিশ্লিষ্ট হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি অদৃশ্য হইবে। অতএব এ অবস্থায় মাতৃ-পিতৃ-শক্তির নাম লয় বা সংহৃতি শক্তি। মাতৃ-শক্তি আর পিতৃ-শক্তি যখন সংহারশক্তির ক্রিয়ারত, তখন মাতৃ-শক্তি সংহর্ত্রী, আর পিতৃ-শক্তি সংহর্ত্তা। পালন-শক্তির ক্রিয়াকরণকালে পালয়িত্রী আর পালয়িতা। আর সৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়াকালে স্রষ্ট্রী আর স্রষ্টা বলা যায়।

ঐ যে কুসুমগুলি গর্ভধারণ, রক্ষণ ও পোষণের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখা ব্যতিক্রম হইলেও উহার কিছুই হইতে পারে না, ইহা ঐ ভাবনা নামক মাতৃ-শক্তির কার্য্য। ফুলের মধ্যে মধু গন্ধাদি সমাবেশও ঐ শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ঐ বিচিত্র আকার-গঠনও তাহারই ক্রিয়া। এই প্রকার আরও নানাবিধ ক্রিয়া আছে।

পুষ্প সমস্ত পদার্থেই আছে, ধ্বজও সমস্ত পদার্থে আছে। পুষ্পের উদাহরণে যে কথা বলা হইল, সেই নিয়ম সর্ব্বত্র জানিবে। এখন এই উদাহরণ দ্বারা সমস্ত জগতে—মানব-মানবীতে সর্ব্বত্রই এই শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া লও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। আপনি পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা অতি গুহ্যতম কথা। এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে আমার অনেক গুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। যাহা যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, একে একে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে থাক।

শিষ্য। স্ত্রী ও পুরুষ-সম্মিলন স্বাভাবিক; ইহা আপনার পূর্ব্বোক্ত কথাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই; আমাকে তাহা বলিয়া চরিতার্থ করুন।

গুরু। তোমার এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে। কেবল জানিবার বাসনা, যে নারী বন্ধনের কারণ, তাহার সহিত নর সম্মিলিত হয় কেন? শাস্ত্রাদি বলিয়াছেন, নারীই নরকের কারণ।

গুরু। সে কথার আলোচনা অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ত হইয়া গিয়াছে!

শিষ্য। গিয়াছে বটে, কিন্তু আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। কি বুঝতে পার নাই ?

শিষ্য। স্ত্রী-পুরুষ-সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

গুরু। উদ্দেশ্য—রসতত্ত্বের পূর্ণ সাধনা।

শিষ্য। ঘৃণ্য কথা !

গুরু। কেন ?

শিষ্য। সেই বাউলের কথা—সেই তন্ত্রের অপকৃষ্ট সাধনার কথা।

গুরু। মূর্খ! তুমি আমি জগতের কি বুঝি বল ? নারী যেমন নরকের দ্বার, তেমনই মুক্তির হেতুভূতা। এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বেও অনেক কথা বলিয়াছি, বর্ত্তমানে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমি এই মাত্র যে মাতৃ-শক্তির কথা তোমাকে বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিবে—এই সম্মিলন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য। যাহা হউক পুনরায় এ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর।

স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন কেবলমাত্র মানুষের বা পশু ও কীট-পতঙ্গাদিতেই আবদ্ধ নহে,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড় রাজ্যেও উহা বিস্তৃত। কুসুমে ইহার ক্রিয়া। এখন দেখিতে হইবে, এই স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন-ক্রিয়া কি কেবল ইন্দ্রিয়-বিশেষের সুখ বা আনন্দ, না আর অন্যবিধ কিছু আছে ? মানুষই না হয়, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে, আহার নিদ্রা আদি যেরূপ সম্পাদিত করিয়া পশু পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি সুখী হয়, ইহাতেও না হয়, সেইরূপই সুখী হইয়া থাকে,—কিন্তু কুসুমে কেশরে যে সম্মিলন, তাহা কোন্ উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইয়া থাকে ? তাহারা জড়,—জড়ের আবার সুখ দুঃখ কি ? আসঙ্গ-লিপ্সা জড়ের নাই,—তবে তাহারা এ কার্য্য কেন করে বলিতে পারে ?

শিষ্য। আমার বোধ হয়, উহা ঈশ্বরাভিপ্রেত,—সৃষ্টি-কার্য্য রক্ষার জন্য ঐ কার্য্য জগতের সর্ব্বত্র সংস্থাপিত।

গুরু। কেবল সৃষ্টি নহে, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য ঐ ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত। যাহা হউক, সে কথা তোমাকে অগ্রেই বলিয়াছি। বর্ত্তমানে তুমি যে কথা বলিলে, তাহাই ধরিয়া লওয়া যাউক। সৃষ্টি-স্রোত প্রবাহিত রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুং সম্মিলন হয়; কিন্তু তাহা হইলে, জড় হইতে প্রাণি-রাজ্য পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে এত আকর্ষণ, এত আকুলতা, এত মোহ থাকিত না।

শিষ্য। তবে কি সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্ত্রী পুং সম্মিলন নহে?

গুরু। হাঁ, সেও একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আর এক উদ্দেশ্য আছে।

শিষ্য। সে উদ্দেশ্য কি?

গুরু। আত্ম সম্পূর্ত্তি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি লাভ।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ইহা বোঝা নিতান্ত সহজও নহে। এ রসে রসিক না হইলে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে এ তত্ত্ব অনুভূত হইবার নহে। যাঁহারা যোগবলে—সাধন-প্রভায় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন!

শিষ্য। তবে কি আমি ঐ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিব না?

গুরু। আমি সাধ্যমতে বলিতেছি, যদি সক্ষম হও—বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। দয়া করিয়া বলুন।

গুরু। আমি তোমাকে বলিয়াছি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম—ইহারই—সূক্ষ্মাংশ। রূপ দেখিয়া রসের কথা মনে হয়। রসের জন্যই উন্মত্ত এবং বর্দ্ধিত, পালিত এবং মৃত।

কিন্তু রসের এক অনুভূতি আছে—সে রস এ প্রপঞ্চের নহে, তাহা মূল রস) মূল রস কোথায় জান?

শিষ্য। আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা;—আপনার উপদেশ না পাইলে আমি কি বুঝিব?

গুরু। বলি শোন। যদি রসের আকর্ষণ ও লালসা বিদ্যমান না থাকিত, তবে কেবল সৃষ্টিকার্য্যের স্রোত অব্যাহত রাখিবার জন্য কেহই ঐ ক্রিয়ায় পরিলিপ্ত হইত না। দরিদ্র সন্তানভারে নিপীড়িত,—যাহা জন্মিয়াছে, তাহারই ভরণ-পোষণে অক্ষম;—তথাপি সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়ায় পরিলিপ্ত। নিঃসম্পর্কীয় যুবক যুবতী, সন্তান-অকামী নর-নারী কেন সংমিলিত হয়, ঐ লালসার আগুনে দগ্ধ হইয়া থাকে? সে লালসা কি জান? সুখের অনুভূতি। যেমন সুখের অনুভূতির আকুল আকর্ষণে আত্মহারা হইয়া পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়, নর-নারী তদ্রূপ সুখের আকর্ষণ-লালসায় আবদ্ধ হইয়া সংমিলিত হয়। হিতাহিত-জ্ঞান-পরিশূন্য হয়,—আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মুহূর্ত্তের সংমিলনান্তেই ক্লান্ত ও কমিত্বহীন হয়—আবার পরক্ষণেই সেই আকুল আকর্ষণ,—সেই মরণ তাণ্ডব। কেন এমন হয়, জান? সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা পিতৃ-শক্তি ও মাতৃশক্তির সংমিলনেচ্ছা। ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতৃ-শক্তি যাহা, তাহা ঈশ্বর; আর মাতৃশক্তি যাহা, তাহা প্রকৃতি;—এই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি, পালন ও লয় হইতেছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনাশাতেই জীবের সুখানুভূতি। আত্মবান্ পুরুষগণ নিজদেহে উহার উপলব্ধি করিতে পারেন,—অন্যে তাহা পারে না। অন্যে কেবল একমাত্র আকর্ষণেই আকৃষ্ট। স্ত্রী ও পুংজাতি এবং তড়িৎশক্তি ও চুম্বক শক্ত্যাদির সম্মিলন ফল দেখিয়াও, এই অনুমানের প্রতিপোষণ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার ব্যতিক্রম

দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য হইতে তির্য্যক্ এবং উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রেই স্ত্রীপুংসম্মিলনে দুইটি ফল দেখা যায়,—এক সৃষ্টি বা সন্তানোৎপত্তি, দ্বিতীয় আত্ম-সম্পূর্ত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। তাই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মিলন,—তাই শ্রীকৃষ্ণাবতারে এই মধুর ধর্ম্মের প্রচার ও সংস্থাপন। কি করিয়া এই আত্ম সম্পূর্ত্তি লাভ করিতে হয়, তাহাই মধুররসের সাধনায় উক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। লজ্জায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না।

গুরু। ইহা সাধনাঙ্গ,—সুতরাং জিজ্ঞাসায় কোন দোষ নাই। কি জিজ্ঞাসা করিবে বল ?

শিষ্য। স্ত্রী-পুরুষ বা মানব-মানবীর দৈহিক সম্মিলনে সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংমিলন বা আত্ম-সম্পূর্ত্তি কি প্রকারে ঘটিয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রায় সব কথাই বলিয়াছি। যদি না বুঝিয়া থাক,—আরও একটু স্থূল করিয়া কথাটা বলিতেছি, শোন—

মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গ আদি জীবন্ত প্রাণিগণ না হয়, ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হয় বলিয়া, স্ত্রী পুরুষ সম্মিলন করিয়া থাকে ; কিন্তু উদ্ভিজ্জগতে সে কথা হইতে পারে না ; কারণ, তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই, উহার স্পৃহাও নাই। অতএব উহার মূল কারণ এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা কোনরূপ জীবরাজ্যেই অব্যাহত হইবে না এবং তাহা বোধ হয়, পুংস্বশক্তি আর স্ত্রীত্বশক্তির আত্মলাভের স্পৃহা। জড়পদার্থের শক্তি রাজ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিকে অপর শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করে। অপর একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া,—তাহাকে আশ্রয় না করিয়া, কোন শক্তিই আত্মলাভ কিংবা কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই শক্তিরাজ্যে

পরস্পরের উপমাই চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন, এক শক্তিকে পরাভব করিবার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবর্ত্তী থাকা, চুম্বকশক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বকশক্তি না থাকিত, তবে বিপ্রকর্ষক চুম্বকশক্তিও এ পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হইত না; আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও বোধ হয়, সমাকর্ষক চুম্বকশক্তির চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এইরূপ, সংযোজক তড়িৎশক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধ হয়, জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। দেহের দক্ষিণাঙ্গের শক্তি নষ্ট হইলে, বামাঙ্গের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে না। শক্তির ক্রিয়া এইরূপ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব এক একটি শক্তি, যাহা দ্বারা স্ত্রীদেহ স্ত্রী-আকারে এবং পুরুষদেহ-পুরুষ-আকারে গঠিত হইতেছে, তাহাই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব,—তাহাই এক একটি শক্তি-বিশেষ। তবে অবশ্যই উহা তড়িৎ-চুম্বকাদি শক্তির স্থূল শক্তি নহে, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম পদার্থ এবং নিতান্ত অবিপশ্চিতের এককালেই অপরিজ্ঞাত বিষয়। বাস্তবিক ঐ তাড়িতাদি শক্তিও স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব শক্তির স্থূলতম রূপান্তর মাত্র। সংসারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। ঐ দুইটি শক্তিই পরস্পরের ভাববিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানাস্থানে নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে আমাদের এস্থলে প্রাণিজগতের স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব লইয়াই কথা,—অতএব জড়জগৎ পরিত্যাগে, তদালোচনাই করা যাইতেছে।

যে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্বের কথা বলা হইল, ঐ স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি

আপনার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরস্পরের আলম্বনে চেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই মানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখণ্ডদ্বয়ের পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বক-শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সংমিলনের ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সংমিলিত হয়; অথবা পরমাণু-দ্বয়ে উত্তেজিত শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের একতার ইচ্ছায় আশ্রিত পরমাণু দুইটিকে সঙ্গে করিয়া একত্র হয়, স্ত্রীপুরুষের উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব শক্তিও সেইরূপ নিজ নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া সমবেত হয়; তদ্দ্বারা আনুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনোদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়।

এই একতাবন্ধনের আশ্রয়ী বা কারণস্বরূপ মনসিজ বা কাম। কাম শ্রীকৃষ্ণের পুত্র;—কেন না, প্রথমে কাম বা কামনা শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রহ্মের মানস হইতে উদ্ভুত হইয়া ছিল। এখনও জীবের মন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল,—স্ত্রী পুরুষের সংমিলনের দুইটি উদ্দেশ্য আছে, এক সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখা, —দ্বিতীয় আত্ম-সম্পূর্ত্তি। ভাল, তবে ঐ বিষয়কে সাধুগণ,—বিবেকিগণ, —নিন্দার্হ বলিয়া এবং সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া ঘোষণা করেন কেন?

গুরু। ঘৃতে বল, বর্ণ ও আয়ুঃ প্রদান করে; কিন্তু অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ঘৃত-ভোজনে যেমন বল, বর্ণ, আয়ুঃ বর্দ্ধন না করিয়া উদরের পীড়া জন্মে, তদ্রূপ এই ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলে আত্মপুষ্টি দূরের কথা,—আত্মহত্যাই হইয়া থাকে।

শিষ্য। আত্মপুষ্টি কি প্রকারে হয়?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারা।

শিষ্য। সে সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। সে বিষয় বলিবার আছে, আরও কিছু বলিতে চাহি। এখন যাহা বলিতে প্রস্তুত হইতেছি,—তাহা বলিবার কারণ ছিল না; কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হইতেছে যে, তুমি হয় ত ভাবিয়াছ যে, স্ত্রীপুরুষের ঐন্দ্রিয়িক সম্মিলনে আধ্যাত্মিক সম্পূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। হাঁ, আমি তাহাই বুঝিয়াছি।

গুরু। সেইরূপ বুঝিয়াছ বলিয়াই, আমার ধারণা হইয়াছিল। মানুষ সুখ চায়; কেবল মানুষ কেন, জগতে জীবমাত্রেই সুখ চায়। সুখ-প্রাপ্তির অন্যতম নামই, আত্মসম্পূর্ত্তি। আত্মসম্পূর্ত্তি হইলেই সুখলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ-সংমিলনজনিত ঐন্দ্রিয়িক সুখে কি পূর্ণ সুখ আছে? ঐ সুখ ত ক্ষণকালস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ অপহারক ও পরিণাম-দুঃখে সুপরিপূর্ণ। যাহারা এই সুখের জন্য লোলুপ, তাহারা যৌবনকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ঐ সুখের অভাব-জনিত যন্ত্রণানুভব করে এবং সুখভোগ সত্ত্বেও তাহারা ঐরূপ পরিণাম মনে করিয়া সর্ব্বদা প্রব্যথিত হয়। কেবল ইহাই নহে; যৌবনসত্ত্বেও অহোরাত্র সর্ব্বদাই কোন প্রাণী ঐ সুখের অনুভব করিতে পারে না; তাহা কোন মতে সম্ভবযোগ্যও নহে। উহা দিবারাত্রের মধ্যে অত্যল্পক্ষণ ব্যতিরেকে কাহারও লব্ধব্যও নহে। স্পৃহা কিন্তু সর্ব্বদাই থাকিবার কথা। অহোরাত্র মধ্যে যে যে ক্ষণে ঐ সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সময়টুকু ব্যতীত সর্ব্বদাই তাহার অভাবজনিত ক্লেশানুভব হয়। এতদ্ব্যতীত মনোরম সংঘটনের অভাব-জনিত ক্লেশানুভব হয়, বাঞ্ছিতের পীড়া বা মৃত্যুজনিত ক্লেশানুভব হয়, অনুরাগভঙ্গ জন্য ক্লেশানুভব হয়, নিজদেহে ব্যাধিজন্য ক্লেশানুভব

হয়, দু'দণ্ডের বিচ্ছেদজনিত ক্লেশানুভব হয়,—এই প্রকার কত সময় কত বিষয়ে ক্লেশানুভব হয়। অতএব ঐন্দ্রিয়িক মিলনে স্থায়ী সুখ কোথায়?

শিষ্য। তবে স্ত্রী-পুংসম্পর্কে সুখ কোথায়?

গুরু। স্ত্রী পুংশক্তি মিলনে যে আত্মসম্পূর্ত্তি হয়, তাহাতেই সুখ।

শিষ্য। তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে, জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে হয়?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে; ঐ দুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ ঘটিয়া থাকে,—তখন মানুষ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে জগতের যে প্রধান আসক্তি—নর নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। তখন ভগবানে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কার্য্য করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ না করিয়া, নারীসম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, তাহা পরিত্যাগ না করারই সমান হয়। দিনকতক পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও, আবার আসক্তি জন্মে,—আবার পতন হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহা করিতে হয়?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারা।

শিষ্য। সেই সাধনাই বোধ হয়, রসের সাধনা বা তান্ত্রিকের পঞ্চমকার সাধনা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। আমাকে সেইগুলিই বলুন।

গুরু। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ, পিতৃশক্তি মাতৃ-শক্তির পরস্পর একটা মিলনেচ্ছা প্রবলরূপে প্রবাহিত হয়। যে কোনরূপে

স্থায়িভাবে তাহাদের মিলন করিয়া লইতে পারিলে, অগ্নি ঐ মিলনেচ্ছা শক্তিতে পতিত হয় না।

শিষ্য। হাঁ এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। আরও মনে রাখিও যে, ঐরূপ সাধনায় অপূর্ণ মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় ; তখন সে সাধনার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক বললাভ করিতে পারে। সে সাধনার মূলগ্রন্থি প্রেম। সে আর আমি এক হইব,-- দৈহিক সংযোগ দ্বারা নহে,—শক্তি সংযোগ দ্বারা। দৈহিক সংযোগ কেবল সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য—কুপুত্র উৎপাদন জন্য। ইহার জন্য রেতঃসংযম চাই। রেতঃ-সংযম করিতে হইলে, চিত্তবৃত্তির সংযম শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে প্রাণের মিলন—প্রাণের মিলনে স্ত্রীপুরুষের উভয় শক্তি এক হইয়া অপূর্ব্ব রসানন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে রজোবিন্দুর মিলন হইয়া যায়—হরগৌরী এক হইয়া পড়ে।

শিষ্য। যেরূপে তাহা হয়, তাহাই আমাকে শিক্ষা দিন।

গুরু। প্রথমে দৈহিক সংযোগের সংযম শিক্ষা করিতে হয়,—তৎপরে শিব শক্তির মিলন শিক্ষা করিতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতামাতার অভিশাপ।

শিষ্য। প্রথম হইতে যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হয়, এইবারে তাহা বলুন।

গুরু। তোমার প্রশ্নটি আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

শিষ্য। আমি জানিতে চাহিতেছি যে, আপনি যে কাল্পনিক দম্পতীর কথা বলিয়াছেন, সেই প্রকার উন্নত জীবন লাভ করিতে হইলে, একেবারে প্রথম হইতে যেরূপ শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন,—তাহাই বলুন।

গুরু। আমি ঐ কাল্পনিক দম্পতী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অবস্থা নহে,—সামান্য মধ্যাবস্থা মাত্র। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা পর্য্যন্ত হওয়া যায়,—মরণ জয় করা যায় এবং আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ করিয়া রসানন্দ উপভোগ করা যায়। কিন্তু ততদূর সাধনা দ্বারা অগ্রসর হইতে না পারিলেও আমাদের কল্পিত দম্পতীর মত মধ্যাবস্থা লাভ করা সকলের পক্ষেই অতি সহজ কথা। ওরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলেও শিক্ষা সাধনা চাই এবং সে সাধনাতেও যে সুখ, যে আনন্দ—তাহা মর্ত্ত্যে স্বর্গীয় সুখ।

শিষ্য। এক্ষণে আমাকে প্রথম হইতে ঐ শিক্ষা প্রদান করুন।

গুরু। আমাদিগকে একটি ধারাবাহিক জীবন লইয়াই কথা

পাড়িতে হইবে। এস্থলে আমাদিগকে গর্ভাধান হইতে প্রথমে ধরিতে হইবে। কেন না, গর্ভাধানে সুসংস্কৃত সন্তান না জন্মিলে, সে সন্তান নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াশীল হয় না। ধরিয়া লও, আমরা যে আদর্শ দম্পতীর কথা বলিয়াছি, ঐরূপ দম্পতিগণের দৈহিক সংযোগে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছে। এখনও তাহারা অতি শিশু। তাহাদিগকে লইয়াই আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কথা আরম্ভ করিব।

শিষ্য। আপনার কল্পিত আদর্শ দম্পতী বর্ত্তমান যুগের এ অধঃপতিত ভারতবর্ষে— বিশেষতঃ বঙ্গভূমে কয়টি মিলিবে? হয় ত নাই বলিলেও দোষ হইবে না। আপনি বর্ত্তমানযুগের শিশু লইয়াই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা, তাহাই বলুন।

গুরু। উত্তম কথা বলিয়াছ,—কিন্তু প্রত্যেক পিতা-মাতাকে সাবধান হইতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ ও মেধাবী সন্তানের জন্ম দিতে পারিবেন। নতুবা ক্ষুদ্রায়ুঃ ও অল্পবুদ্ধি অথবা তমো-মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন বালক বালিকা কখনই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ পরোপকারী ও শাস্ত্রদর্শী সাধক হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে সমাজের দিকে একবার চাহিয়া দেখ,—যে সকল স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে সন্তানজননকার্য্যে নিযুক্তা আছেন,—তাঁহার মধ্যে কতগুলি স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুস্থ? বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর জাতিতে তাহাদের সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনা করা যাইতে পারে।

যখন আমাদের অধিকাংশ সন্তানগণকে রোগগ্রস্ত দেখি, তখন কি মনে হয় না, অগ্রে এমন ছিল না—এখন এমন হইতেছে কেন? এবং তাহা ভাবিয়া কি আশ্চর্য্য হইতে পারি না?

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের মেয়েরা—তাহাদের অস্থিমজ্জা প্রভৃতি সংগঠিত না হইতেই,—সুদৃঢ় না হইতেই, স্বামি-সহবাসে

সংলিপ্ত হয়। পাশবিক সংমিলন অপেক্ষাও যে, এই মিলন অতিশয় ঘৃণ্য,—তাহা কেহ ভাবে না এবং সেই পাতকের ফলেই আমাদের দেশের মেয়েরা এমন স্বাস্থ্যহারা।, মাতা হইবার পক্ষে এই কার্য্যে অসাময়িক এবং অস্থি-মজ্জা বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে ঘোর প্রতিবন্ধক—এবং এই জন্যই উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা এত অধিক স্বাস্থ্যহারা। ঐ অসাময়িক ক্রিয়ার এবং আলস্যে ও অবদ্ধ বায়ুতে মাংসপেশী অত্যন্ত বিরল হয়; আর সেই জন্যই তাহাদের অস্থায়ী এবং অব্যস্থিত স্নায়ুতন্ত্র দৈহিক এবং মানসিক সামান্য কারণে উল্টাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে,—এবং ইহা হইতে মূর্চ্ছা, মানসিক আক্ষেপ, ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই অসাময়িক আয়াসে উৎপাদক যন্ত্র ধ্বংস ও বিনষ্টাবস্থার দৃশ্যে পরিণত হয়; অধিকাংশ স্থলে স্তন ক্ষয়রোগগ্রস্ত যন্ত্রস্বরূপ হয়। এই স্তন হইতে সন্তানগণ স্বাস্থ্য-জনক এবং যথেষ্ট পুষ্টিকারক পরিমাণে খাদ্য খাইতে পারেনা। স্পষ্টতঃ উৎপাদন যন্ত্রের পক্ষে সাধারণতঃ দেখিতে পাইবে যে, তাহাতে হয় সর্ব্বদা শ্লেষ্মা (রস) অথবা পূঁজ ইত্যাদি নিঃসৃত হইতেছে। তাহারা হয় উত্তেজিত, না হয় শিথিলতা প্রাপ্ত কিংবা স্থানান্তরিত হইয়াছে ঋতু প্রায়ই অনিয়মিত হয়,—কখন কখন অতিশয় কষ্টদায়ক এবং অল্প, অথবা কখন পরিমাণে অধিক এবং বহুকালস্থায়ী। ডিম্বকোষ ও জরায়ু প্রদেশ চাপ সহ্য পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত অস্থির যন্ত্রণা এবং পক্ষাঘাতিক কষ্ট প্রায় সমস্তগুলিই উপনীত হয় এবং অনেক সময়ে স্বামি-সংসর্গ কষ্টজনক হয়। এই সকল সত্ত্বেও অথবা ইহাদের কতগুকলি থাকা সত্ত্বেও তাহারা অবিবেচনা পূর্ব্বক মাতা হইবার কার্য্য করিয়া থাকে,—কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে;—তথাপি, ইহার ফলভোগ তাহাদিগকেই করিতে হয়। সে ফলে ত্রিশ

বৎসর বয়সের মধ্যেই তাহারা বিবর্ণা ও কৃশা হইয়া যায়—এবং বৃদ্ধার ন্যায় অবস্থায় পতিত হয়। তাহাদের দেহ নত হইয়া আসিলে সর্ব্বসময়ে কাঁপিতে থাকে,—কোন প্রকার দৈহিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারে না। বাস্তবিক আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, অনেক কোমলাঙ্গী সুন্দরী নারী ঐরূপ কুৎসিতা হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা যদি সম্ভবমত সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা স্বাস্থ্য, কি সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলিতেন?—কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যুবকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাইবে। সেখানেও এই সর্ব্বনাশের কলঙ্ক-কালিমা। ক্ষণিক আনন্দ-লাভের আশায় ঐ অত্যাচারের অনুসরণ করা ব্যতীত তাহারা যে কি করিতে বসিয়াছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। মিষ্টান্নপূর্ণ থালার সম্মুখে রক্ষিত একটি অবোধ বালকের ন্যায় তাহারা যথাসাধ্য ঐ অহিতকর আমোদজনক কার্য্য করিতে থাকে। সতর্কতাজনক সদুপদেশ সকল তাচ্ছিল্য করিয়া—এমন কি উত্তেজক খাদ্য এবং কামোদ্দীপক ঔষধ ব্যবহার করিয়া, স্বাভাবিক কামরিপুকে অধিকতর উত্তেজিতা করিয়া—কয়েক বৎসর বা কিছুকাল অতিবাহিত করে। কিন্তু হায়! ইহার পরিণাম যে কি,—ইহাতে যে কত ক্ষতি, তাহা যখন জানিতে পারে,—তখন তাহাদের, দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। ক্রমে তাহাদের অসময় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সহবাস শক্তির অক্ষমতার স্পষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হয়। মানুষের এরূপ অবস্থা অতিশয় ভয়ঙ্কর। শারীরিক-যন্ত্রের এরূপ ধ্বংসাবস্থা অবশেষে মলিন-অক্ষরে তাহার মুখমণ্ডলে যেন লিখিত হইয়া যায়।

সে তাহার বীর্য্য নষ্ট করিয়াছে এবং আকৃতির কোমলতা ও স্থিতি-

স্থাপকতা হারাইয়াছে,—সে মানসিক ও শরীরিক পরিশ্রম করিতে চিরদিনের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মস্তক-বেদনা এবং বক্ষো-বেদনা তখন তাহার সর্ব্বসময়ের অতিথি হয়। সহজেই তখন সর্দ্দি লাগে এবং শ্বাস-কাস (ব্রঙ্কাইটিস্) সচরাচর হইয়া থাকে। সে তখন একে একে স্বভাবের অভ্যাস সকল হারাইয়া অলসতা, অবসন্নতা, অমনোযোগিতা এবং সর্ব্ববিষয়ে ঔদাস্যভাবগ্রস্ত হয়। সরলতা, উৎসুকতা উৎসাহজনক কার্য্যে ব্রতী হওয়া, সাহসের সহিত পার্থিব-জীবনের বিপদ সকলের সম্মুখীন হওয়া ও হিতাহিত জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ তাহাকে পরিত্যাগ করে। এক কথায় সে শীঘ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—এবং এই হেতু সে বৃদ্ধ হইয়াছে।

তাহার অশমিত অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় বা স্ত্রীসংসর্গে শীঘ্রই তাহার চতুর্দ্দিক দুর্ব্বল, পীড়িত জ্ঞানহীন কিংবা কদাকার সন্তানগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং একটি বৃহৎপরিবার সংগ্রহ হইয়াছে। তাহারা নানাবিধ আধি-ব্যাধিতে, নানাবিধি অভাব-অভিযোগে তাহাকে অশান্তির বিষম দাবদাহে ফেলিয়া দিয়া জ্বালাইয়া তোলে—এবং সে সকল অভাব অভিযোগ দূর করা, তখন তাহার ক্ষমতারও অতীত হইয়া পড়ে। এই-রূপে তাহার বর্দ্ধিত পরিবারের অভাব-অভিযোগে আধি-ব্যাধি, শোকতাপ তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়ে—এবং কি নিজের দৈহিক পীড়া দ্বারা, কি সহবাস-বলক্ষয় দ্বারা, কি ঐ সকল যন্ত্রণা দ্বারা, সে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণার নিম্ন হইতে নিম্ন স্তরে ডুবিতে থাকে। তারপরে এই সকলের মধ্যে একদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহার অস্তিত্বের পার্থিব দৃশ্যের উপর যবনিকা পড়িয়া যায়। হায়! এইরূপ করিয়াই কত যুবক ধ্বংস-পথের পথিক হইতেছে।

তাহার পরে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের কথা। সমাজের দিকে

চাহিয়া দেখ,—নর ও নারী ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত। ইহা কল্পনার কথা নহে,—মিথ্যা হুজুক্ নহে,—অতি সত্য ও সার কথা। যে দেশের নর-নারী প্রত্যেক কর্ম্মবিন্দুতে ধর্ম্মশাসনে পরিচালিত হইত, সে দেশের নর-নারী এখন সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত। সর্ব্বোচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে, নিম্নশ্রেণীর শূদ্র-পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর, দেখিবে সকলেই কোন প্রকার ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। খৃষ্টিয়ান্, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম নিয়মে পরিচালিত হইবে—আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু হিন্দুগণ কিছুই করিবে না—কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়াই তাহাদের ধারণা নাই। যাহা পশুতে করে,—আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধির ক্রিয়া ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠান কোথায়? কয়জন লোক দিনান্তে ভগবানের উপাসনা করে? কয়জন লোক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? ইহার ফলে—এই সকল ধর্ম্মজ্ঞান বা অনুষ্ঠান-শূন্য দম্পতীর যে সকল সন্তান জন্মিতেছে, তাহারা ক্রমে পাপবিদ্ধ হৃদয় লইয়া—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক লইয়া সমাজে বিচরণ করিবে। সিজার বর্জ্জিয়া (Ceasar Borgia) এবং বর্জ্জিয়া বংশের অন্যান্য দোষী লোকদিগের চরিত্র কাহারও অবিদিত নাই। পিতামাতার গুণ সন্তানে ক্রমানুবর্ত্তী হয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী বিধান—নিম্ববৃক্ষে আম্রফলের আশা কোথায়? অতএব পিতামাতার চরিত্র, ধর্ম্ম-প্রভৃতি সদ্গুণরাজিতে ভূষিত না হইলে, সন্তানে ঐ সকল কোথা হইতে আসিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিশু-পালন।

শিষ্য। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যে সকল পিতামাতা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করে নাই,—যাহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করে নাই,—তাহাদের সন্তানেরা ব্রহ্মচারী হইতে পারে না?

গুরু। পারিবে না কেন,—তবে তাহাদিগকে এ পথে আনিতে হইলে সবিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন এবং সম্ভবতঃ তাহারা পূর্ণ-ফললাভে সমর্থ হয় না,—বা স্বভাবতঃ এ পথে আসে না। যে নিয়মগুলি অমিশ্র, আমরা সে গুলিত কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। দু'য়ে দু'য়ে যোগ করিলে চারি হয়, ইহা স্বাভাবিক অমিশ্র-নিয়ম। ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ, ইহাও স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম। মানুষ ইচ্ছা করিলে, এই সমস্ত অমিশ্র-নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; কিন্তু স্বভাবের যে নিয়মগুলি মিশ্র অর্থাৎ যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কার্য্য করে, মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। পিতামাতার যেরূপ স্বাস্থ্য ও স্বভাব, সন্তানের স্বাস্থ্য ও স্বভাব সেইরূপ হইবে, ইহা একটি স্বাভাবিক মিশ্র-নিয়ম। কারণ, এই স্বাভাবিক—নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম মুখ্য বা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। সন্তানের স্বভাব, স্বাস্থ্য পিতামাতার স্বভাবের অনুরূপ হইবে, দেশে জলবায়ু অনুসারে ঐ স্বভাবের ও স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন হইবে,—সুশিক্ষা কুশিক্ষার গুণে ঐ স্বভাবের ও স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন হইবে;—সময়ের গতি-অনুসারে ঐ স্বভাব

ও স্বাস্থ্যের ব্যত্যয় হইবে ;—এইরূপ নানাবিধ স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য-দ্বারা সন্তানের স্বভাব ও স্বাস্থ্য সংগঠিত হয়। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলি বলবান ও অন্য কতকগুলির বলহানি করিয়া মানুষ ইচ্ছাবলে ও চেষ্টাদ্বারা সন্তানের স্বাস্থ্য ও স্বভাবের নানাবিধ বৈচিত্র্যেও সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিও —এরূপ করিতে হইলে সবিশেষ চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং তখনও তাহার পিতামাতাকে আদর্শ হইতে হইবে। পিতামাতা পাশবিক আচারে লিপ্ত থাকিবে, আর সন্তানের চরিত্র উন্নত করিতে উপদেশ প্রদান করিবে, তাহাতে সন্তানগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইবে না। পিতামাতাকেও তখন উন্নত চরিত্রের আদর্শ হইতে হইবে।

শিষ্য। কি প্রকারে শিশু সন্তানদিগকে সৎ হইবার উপযুক্ত পথে লইয়া যাইতে হয়,—তাহা আপনি বলিয়া দিন।

গুরু। সুসংস্কৃত-গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া থাকে,—কিন্তু অসংস্কৃত-গর্ভে এবং কাম-ক্ষুধাসম্পন্ন জনক জননী হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা নিশ্চয়ই তমোমলিন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একথা স্মরণ রাখিতে কদাচ বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।—যাহা হউক,—জাত-সন্তানের যাহাতে কোন প্রকার ব্যাধি না জন্মে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সন্তানের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অত্যুগ্র এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবন করাইবে না, মুক্ত বাতাসে তাহাকে সামান্য-পরিমাণে ব্যায়াম করাইবে,—ভ্রমণ করানই এ ব্যায়ামের চরম উন্নত অবস্থা হইতে পারে। অসচ্চরিত্র বালক-বালিকাগণের সহিত মিশিতে দিবে না,—এবং অসৎপ্রকৃতি দাস-দাসীগণের উপরে তাহার ভার অর্পণ করিবে না। ভাবিতে পার, বালক এখনও অবোধ—কোন জ্ঞান তাহাতে পঁহুছে নাই,—তখন তাহাকে

লইয়া কোন বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে না। সঙ্গগুণ বালকে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হইয়া যাইবে। বালকগণের "রূপকথা" শুনিবার স্পৃহা জাগিয়া বসে,—এরূপ স্থলে আদর্শ-চরিত্র নরনারীর কথা—যতদূর সম্ভব সমাজ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর নর-নারীগণের কথা, তাহাকে শুনাইবে। আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবে। যাহা লঘু—বলকর, তাহাই আহার করিতে দিবে। কটু, কষায় ও মিষ্ট দ্রব্য পাঁচবৎসর বয়সের কমে বালকগণকে আহার করিতে দিতে নাই। "জুজু" প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া, তাহার উন্নত-উৎসাহকে জড়ীভূত করিয়া দিতে নাই। সর্ব্বদা তাড়না করিয়া তাহাকে 'থেঁতলা করিয়া দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে বালকের পরিপাক-যন্ত্রে কৃমি কীট প্রভৃতি সঞ্চিত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন প্রভৃতিকে ভক্তি করিতে,—প্রণাম করিতে শিক্ষা দিবে। বালক বলিয়া উপেক্ষা করিবে না—বয়সের শিক্ষা অতি সন্তর্পণে সম্পাদন করিতে হয়। তাহার সম্মুখে স্ত্রীপুরুষের আমোদ-জনক কোন কার্য্য করিবে না। পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্নভাবে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। দেবমন্দির এবং পূজাস্থানে লইয়া যাইবে। যে গৃহে বালক শয়ন করে, সে গৃহে নিত্য ধূপ-ধূনা পোড়াইবে,—বালকের জন্য নিত্য একবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। পিতামাতার শুভাশীর্ব্বাদ বালকের পক্ষে অমৃততুল্য,—সেই আশীর্ব্বাদ কেবল তাহার টাকার জন্য নহে,—ছেলে হাকিম হইবার জন্য নহে,—তাহার দৈহিক বলপুষ্টি ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য,—জ্ঞান, বুদ্ধি ও দেশহিতকর প্রবৃত্তির জন্য।

বালকের অসুখ বিসুখ করিলে, চিকিৎসাকার্য্যে অনভিজ্ঞ 'হাতুড়ের' দ্বারা কখনও চিকিৎসা করাইবে না; বরং প্রকৃতির ক্রোড়ে রাখিয়া ভগবানের উপরে নির্ভর করিবে, তথাপি কুচিকিৎসা করাইবে না। শিশু-দিগকে অহিফেন, সেঁকো, কাটবিষ প্রভৃতি সেবন করাইয়া কুচিকিৎসকেরা

তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দেয়,—ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সুচিকিৎসকের অধীন করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেও শিশুর আরোগ্য কামনায় পিতামাতা ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদের প্রার্থনা করিবেন এবং নারায়ণের তুলসী দেওয়া প্রভৃতি দৈবকার্য্য করাইতে বিস্মৃত হইবেন না। ইহাতে যে কেবল শিশুর রোগ আরোগ্য এবং দৈহিক উন্নতি হয়, তাহা নহে;—আধ্যাত্মিক বলও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বিদেশীয় পরিচ্ছদে কখনও শিশুদিগকে ভূষিত করিবে না। বিদেশীয় আহারে কখনও শিশুর উদর পূর্ণ করিবে না। যে দেশের জলবায়ুতে তাহার জন্ম, সেই দেশের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আহারাদি যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করাইবে। বিভিন্ন দেশবাসীর জলবায়ু অনুসারে যাহা ভাল,—অন্যদেশের জলবায়ুতে তাহা হয় ত বিষবৎ পরিত্যজ; একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালকের সৎশিক্ষা।

শিষ্য। শাস্ত্রে আছে, পঞ্চম বৎসর হইতে পুত্রকে শিক্ষা দিবে। সে শিক্ষা কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা বলুন।

গুরু। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় শিক্ষার তারতম্য হয়। আমাদের শাস্ত্র বলেন—

চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতাল্লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন-পালন করিলে, তাহার পর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। পালন ও শিক্ষায় বিংশতি বৎসরাধিক-বয়স্ক পুত্রদিগকে (কিছুদিন) গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। তৎপরে অর্থাৎ গৃহকর্ম্মে উপযুক্ত হইলে, আত্মতুল্য বোধ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে। কন্যাকেও এইরূপে পালন করিবে এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিবে ;—তারপরে কন্যাকে ধনরত্নে সমন্বিতা করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে প্রদান করিবে, অর্থাৎ বিবাহ দিবে।"

শিষ্য। শাস্ত্রবাক্যে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিতা করিয়া তবে বিবাহ দিবে। কিন্তু এ শিক্ষা কি প্রকার ? এ শিক্ষাও কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ?

গুরু। পুত্র কন্যা উভয়ের পক্ষেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ বা চরম-শিক্ষা নহে। বর্ত্তমানকালে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা যাইতেছে, সে শিক্ষা বাস্তবিক জ্ঞানানুশীলন বা মনুষ্যত্ব শিক্ষা নহে। তাহা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য কতকগুলি 'বুলি' মুখস্থ করা হইতেছে মাত্র। তবে আমি বলিতে চাহি না যে, সন্তানগণকে সে শিক্ষা দিবে না। যখন সমাজে যাহার প্রয়োজন হয়, তখন তাহা সন্তানগণকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষার সঙ্গে সন্তানগণ যাহাতে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, বংশধর যাহাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, এরূপ শিক্ষা যাহাতে সে প্রাপ্ত হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। পাখীর কৃষ্ণনাম শিক্ষার ন্যায়

কতকগুলি বাজে বকুনি মুখস্থ করিলেই যে, তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল, এমন মনে করা অন্যায়। কন্যার শিক্ষার কথা বলিতেছি। কন্যাকে কিছু জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিবে। তৎপরে গৃহকর্ম্ম, শ্রমসহিষ্ণুতা, পতিসেবা, পতির সহিত সম্বন্ধ, পতির প্রতি কর্ত্তব্য, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। শাস্ত্র অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—

অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত-পতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"পিতা, পতিমর্য্যাদানভিজ্ঞা, পতিসেবানভিজ্ঞা, ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যার বিবাহ দিবে না।"

অতএব পতি কি,—পতির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়,—ধর্ম্ম কি,—ধর্ম্মানুশাসনে কি প্রকারে চালিত হইতে হয়, এ সকল সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়া তৎপরে কন্যার বিবাহ দিতে হয়। কেবল অপক্ব বয়সে স্বামীর কাম-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আর সেই বালিকার স্বাস্থ্য, স্বভাব, ধর্ম্ম ও জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর সন্তান প্রসব জন্য কন্যাকে একটি পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য নহে।

শিষ্য। দেখিতেছি সমাজের অনিষ্টকর অনেকগুলি প্রথা আমাদের সমাজের মধ্যে লোকাচাররূপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন। যাহা হউক পঞ্চম বৎসর হইতে বালককে কি প্রকারে শিক্ষা দিতে হইবে?

গুরু পুনরপি সেই একই প্রশ্ন করিতেছ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন যেরূপভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতেছে,—বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই প্রকারেই হইবে। কিন্তু তদ্ভিন্ন পিতামাতাকে সন্তানের শিক্ষাভার নিজহস্তে

লইতে হইবে। সর্ব্বদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার শিক্ষা দিতে হইবে।

যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ও স্বভাব বিকৃত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালক যাহাতে শৌচাচারী ও অল্পভাষী হয়, তাহা করিবে। আহারে বিহারে ও ভ্রমণে যাহাতে সে পবিত্রভাবে থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যাহাতে তাহার কোমল-মানসে ভক্তি-বীজ উপ্ত হইতে পারে, কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করিবে। লাঠিখেলা, কুস্তি করা, নির্ম্মল বায়ুতে ছুটাছুটি করা প্রভৃতি কিছুক্ষণের জন্য শিক্ষা দিবে। যাহাতে সে নিজধর্ম্মে বিশ্বাসী ও আস্থাবান হয়, যাহাতে সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ও সত্যভাষণে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়,—যাহাতে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্রতা সহকারে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহার উপদেশ দিবে ও তাহাকে লইয়া পিতা-মাতা সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সে যেন পিতামাতার কার্য্যে দেখিতে পায়, ধর্ম্মকার্য্য করা মনুষ্যের প্রধান লক্ষ্য। ফলকথা, এই পিতামাতা আপন আপন চরিত্র দ্বারা সন্তানকে উন্নত করিবেন,—আর ভগবানের নিকট বালকের উন্নত-জীবনের জন্য প্রার্থনা করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

শিষ্য। এখন বালকের কোন্ বয়সের কথা বলিবেন?

গুরু। এইবার ব্রহ্মচর্য্য জীবনের কথা বলিব। যে বয়সে মানুষ সমস্ত জীবনব্যাপী স্বাস্থ্য, স্বভাব ধর্ম্ম ও নীতিসঞ্চয় করিবে,—এইবার

সেই বয়সের কথা বলিব। এস্থলে আমাকে কয়েকটি অবান্তরীয় কথার উল্লেখ করিতে হইবে ; কিন্তু কথাগুলি তুমি একটু মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করিও ;

সে কথাগুলি এই যে, দেশ কাল ও পাত্রভেদে সমাজের লোকের শিক্ষা দীক্ষা হইয়া থাকে। পুরাকালে সন্তানগণ যে প্রকারে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হইত, এখন আর তাহা হইবার উপায় নাই। দেশকাল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাই মহানির্ব্বাণতন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥

"কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। গার্হস্থ্য ও ভিক্ষু এই দুইটি আশ্রম আছে।"

কিন্তু ইহাতে তুমি মনে করিও না যে, কলিতে মানবের ব্রহ্মচর্য্য নাই। তাহা আছে,—কেবল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নাই। তাহা কি, সে কথা বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে দ্বিজাতিগণ নবমবর্ষ বয়সে উপনীত হইতেন। উপনয়ন ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ। উপনয়ন হইলেই তাঁহারা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তারপরে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া, সমাবর্ত্তন পুরঃসর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। মন্বাদি শাস্ত্রে উহার এইরূপ ব্যবস্থা আছে,—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥

মনুসংহিতা॥

"উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বেদত্রয়ের

অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবে। অথবা উক্ত কালের অর্দ্ধেক কাল বা চতুর্থাংশকাল, কিবা যতদিন বেদপাঠ সাঙ্গ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বসতি করিবে।"

উপনীতং গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥

মনুসংহিতা ॥

"উপনয়নান্তে গুরু, শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে অন্তর ও বহিঃশৌচ, আচার অগ্নিকার্য্য এবং সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন।"

শিষ্য এই সমস্ত গুরুগৃহে থাকিয়া ভিক্ষা করিবে এবং ভিক্ষায় নিত্য যাহা সংগ্রহ হইবে, তাহা গুরুকেই প্রদান করিবে।

"বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসানকালে ব্রহ্মচারী গুরুপাদ বন্দনা করিবে এবং অধ্যয়ন সময়ে গুরুসম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে।

গুরু আদেশ করুন বা না করুন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। ব্রহ্মচারী সদাচারসম্পন্ন এবং বস্ত্রাবৃতদেহ হইবে। গুরু বসিতে আদেশ করিলে, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিবে।

গুরুর আবশ্যক মত জল, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ ও ভিক্ষা আহরণ করিবে।

সর্ব্বদা গুরুর নিকটে উপস্থিত থাকিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

গুরু উঠিবার অগ্রে উঠিবে এবং শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে।

ব্রহ্মচারী যতদিন গৃহে ফিরিয়া না আসিবে, ততদিন গুরুকুলে থাকিয়া,

ত্রিসন্ধ্যায় হোমকাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন, ভিক্ষাচরণ, খট্টাদিতে শয়ন না করিয়া অধঃশয্যায় শয়ন এবং গুরুর হিতকর কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিবে।

এখন তুমি বোধ হয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছ। শাস্ত্র, কলিতে এইরূপ আশ্রম নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এখনকার কেহ ঐরূপ আশ্রমে গমনও করে না। এখন গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হয়। তাহার কারণ এই যে, এখনকার মানব অল্পায়ু এবং হীনস্বাস্থ্য; অতএব গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে প্রকারে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহাই সকলের জ্ঞাতব্য।

আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রথম কাল এবং প্রথম স্তর হইতে বলিব,—তোমার যেস্থান হইতে উহা করণীয় এবং গ্রহণীয়, সেই স্থান হইতেই গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিত্তবৃত্তি।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আমিও সেইরূপ বলিতে অনুরোধ করিতেছিলাম। বালক যখন কিশোর—যৌবন উষার বাতাস লইয়া তাহার দ্বারে দণ্ডায়মান, সেই সময় হইতেই তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। তখন আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলুন?

গুরু। মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য তাহাকে যে নিয়ম সকল গ্রহণ ও প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিতে হইবে,—পার্থিবজীবনের অবসান কাল পর্য্যন্ত সেই একই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। এখন যাহা শিক্ষা—আজীবন তাহারই প্রতিপালন।

শিষ্য। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন।

গুরু। হাঁ, আরও কয়েকটি কথা তৎপূর্ব্বে বলিতে চাহি এবং সে কথাগুলি তুমি অতি সাবধানতার সহিত শ্রবণ করিবে। আমি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অতঃপর যাহা যাহা বলিব, এই কথাগুলির সহিত তাহাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, আমি যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা শুনি, সে সমস্তই চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া। অতএব চিত্তবৃত্তি কি, তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত।

বিষয়সম্বন্ধাচ্চিত্তস্য যা পরিণতি সা বৃত্তিঃ।

বিষয়-সম্বন্ধ-হেতু বা বিষয় ভোগ হেতু চিত্তের যে পরিণতি (অবস্থান্তর প্রাপ্তি), তাহাকেই বৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি বলে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নাম বিষয়। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত করে, চিত্ত সেই সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া তদ্ভাবাক্রান্ত হয় বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। ইহাকে যোগবিৎ পণ্ডিতেরা বিষয়ের চিদাকার প্রাপ্তি বলেন। অর্থাৎ চিত্ত যে বিষয় গ্রহণ করে, ঠিক তৎস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণই চিত্তবৃত্তির কারণ। চিত্তবৃত্তির বোধশক্তি বা বুদ্ধিতত্ত্বের কারণ। চক্ষু যে দেখে না, কর্ণও যে শুনে না, এ কথা বোধ হয় তুমি জান। মনই দেখে, মনই শুনে। মন আবার চিত্তদ্বার। চক্ষু দেখিলেও মন যদি না দেখে, তবে সে দেখা দেখাই নহে। ফলতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদি জ্ঞানের সাধন বা দ্বার স্বরূপ মাত্র। আবার মন দর্শনাদির বিষয় গ্রহণকালে যদি ভালরূপে গ্রহণ না করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়াদি চিত্তক্ষেত্রে ভালরূপে অঙ্কিত না হয় বা চিদাকারে পরিণত না হয়, তাহা হইলে সেই বিষয় স্মরণশক্তির আয়ত্ত হয় না। স্মরণশক্তির আয়ত্ত না হইলে, তাহার কোন কার্য্যই হয় না।

চিত্তে সকল বিষয় ধারণা না হইবার কারণ, চিত্তাবস্থার বিভিন্নতা। চিত্তভূমি বা চিত্তাবস্থা পাঁচ প্রকার।

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি
চিত্তস্য ভূময়োঽবস্থা-বিশেষঃ।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ,—চিত্তভূমি বা চিত্তাবস্থা এই পাঁচ প্রকার।

রজোগুণের উদ্রেক হেতু যে নিতান্ত অস্থির হইয়া সুখদুঃখাদি নানা-বিষয়ে ধাবিত হয়, চিত্তের সেই অস্থির অবস্থাকেই ক্ষিপ্ত অবস্থা বলে।

তমোগুণের উদ্রেক হেতু যখন ক্রোধমোহাদিদ্বারা নিতান্ত অভিভূত হইয়া হিতাহিত বা কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান হারাইয়া থাকে, তখন চিত্তের সেই অবস্থাকে মূঢ়াবস্থা বলে।

সত্ত্বগুণের ক্ষণিক উদ্রেকহেতু দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া যখন সুখ প্রাপ্তির চেষ্টায় সুখসাধন বিষয়ে চিত্ত প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত বলা যায়। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার প্রভেদ করা দুষ্কর। ফলতঃ সেই জন্যই চিত্তক্ষেপ বা চিত্তবিক্ষেপ বলিলে একার্থই বুঝায়।

সত্ত্বগুণের উৎকর্ষহেতু যখন চিত্ত সুখময় এবং প্রকাশময় (উজ্জ্বল) হইয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে কোন বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা আভ্যন্তরীণ ভাব্য বিষয়) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া তৎস্বরূপ বা তদাকারে পরিণত হয়, চিত্তের সেই অবস্থাকে একাগ্র বলে। এই একাগ্র অবস্থাকেই মনের একতান অবস্থা বলে। ইহাই যোগশাস্ত্রের সমাধি।

চিত্তের ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং মূঢ় অবস্থা তিরোহিত করিতে পারিলেই চিত্তকে একাগ্র অবস্থায় আনা যায়। অথবা চিত্তের ক্ষিপ্ততা ও মূঢ়তা অপসারিত হইলে চিত্ত স্বতঃই একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রজোগুণ ও রজোগুণের আধিক্যই চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থার কারণ এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যই একাগ্র অবস্থার কারণ।

আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিষয়, বলিব, তাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন আবশ্যক। মানুষ হইতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন আবশ্যক। অতএব চিত্ত যাহাতে একাগ্র হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্থূল কথায়, চিত্ত যাহার অস্থির,—কোন বিষয়ে যে চিত্তস্থির করিতে সমর্থ নহে, সে উচ্চবিষয় সকলে শিক্ষা-লাভ করিবে কি প্রকারে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুণত্রয়।

শিষ্য। যে গুণত্রয়ের দ্বারা চিত্তের অবস্থান্তর হয়, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলুন।

গুরু। প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণবিশিষ্টা। এই ত্রিগুণের বিষয় না জানিলে, প্রকৃত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। এই গুণত্রয়বিষয়ক জ্ঞানের উপরেই যাবতীয় জ্ঞান নির্ভর করে। যাবতীয় আর্য্য-শাস্ত্রেই এই ত্রিগুণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিন ধাতু অবলম্বন করিয়াই যেমন আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদ লিখিত হইয়াছে, তেমনি এই ত্রিগুণ অবলম্বন করিয়াই যোগাদি সমস্ত তন্ত্রের সূত্রসমন্বয়-সাধনাদি বিবৃত করা হইয়াছে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥

হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, নির্ব্বিকার আত্মাকে সুখ-দুঃখমোহাদি দ্বারা দেহে আবদ্ধ করে। মানুষের চিত্ত, সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্ট। সেই চিত্ত, চৈতন্য কর্ত্তৃক অনুভব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উক্ত তিন গুণ অনুসারেই সুখ দুঃখ অথবা মোহ ভোগ করে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হেতু সুখ, রজোগুণ হেতু দুঃখ এবং তমোগুণ হেতু মোহ বা অজ্ঞানতা ভোগ করে। অতএব চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত চিত্তই সুখদুঃখাদির ভোক্তা। চৈতন্য নির্ব্বিকার, তাঁহার সুখ-দুঃখাদিতে বিকৃতির সম্ভাবনা নাই। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহ গোলক যেমন অগ্নি-সংজ্ঞা লাভ করে, তেমনই চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত চিত্তও 'জীবাত্মা' বা 'দেহী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই বদ্ধ জীবাত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগী। এই জন্যই মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে,—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্‌ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্‌ ॥

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি আত্মার (জীবাত্মার) গুণ জানিবে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

হে নিষ্পাপ! সেই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অতি নির্ম্মল বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশক এবং দুঃখবর্জ্জিত বা প্রশান্ত। সেই সত্ত্বগুণই জীবকে সুখাসক্ত ও জ্ঞানাসক্ত করে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্‌।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগাত্মক ও আকাঙ্ক্ষাজনক। এই রজোগুণ আত্মাকে কর্ম্মে আসক্ত করে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানজনক এবং সকল দেহীর মোহজনক; ইহা জীবাত্মাকে প্রমাদ * (অনবধানতা বা অমনোযোগ) আলস্য (কর্ম্মে অনুৎসাহ) এবং নিদ্রাতে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে, আর তমোগুণ প্রমাদে (অনবধানতায় বা অমনোযোগে) আসক্ত করে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

হে ভারত! কোথাও সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত (পরাস্ত) করিয়া প্রবল হয়, কোথাও রজোগুণ, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়।

প্রত্যেক দেহেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলহেতু বা অদৃষ্টহেতু) সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে এবং রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে। যেমন শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রকৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান, তদ্রূপ কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই রজোগুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই তমোগুণের আধিক্য দেখা যায়! কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই ইহজন্মের

---

* 'প্রমাদোঽনবধানতা'। অনবধানতা বা অমনোযোগের নামই প্রমাদ। সুতরাং প্রমাদই অজ্ঞানতা প্রমাদই ঘোর বিপদ।

সাধনা বা অভ্যাস দ্বারা সত্ত্বগুণের আধিক্য লাভ করিতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভাব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আরও কিছু বলিতেছি।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

হে অর্জ্জুন! যখন চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল পরিস্ফুটরূপে জ্ঞানের প্রকাশক হয়, অর্থাৎ যখন দর্শনশ্রবণাদি-জনিত জ্ঞান অতি বিশদ হয়,—তখনই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বা আধিক্য জানিবে। অতএব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে, লোভ (দুরাকাঙ্ক্ষা), প্রবৃত্তি (কর্ম্মের ইচ্ছা), আরম্ভ (নূতন কর্ম্মের সূত্রপাত), অশম (কর্ম্মে অশান্তি অর্থাৎ ক্রমাগত কর্ম্মপ্রবৃত্তি) এবং স্পৃহা (সর্ব্বগ্রাহিতা) জন্মে। রজোগুণেই মনুষ্যকে দুরাকাঙ্ক্ষ করিয়া বিবিধ কষ্টকর কার্য্যে নিয়োজিত করে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোক বিবেকবিহীন, নিরুদ্যম, অমনোযোগী এবং বিমূঢ় বা মোহান্ধ হইয়া থাকে।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞানতা জন্মে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধগতি (স্বর্গ বা দেবত্ব, উন্নতি বা উৎকর্ষ) লাভ করেন, রজোগুণাবলম্বীরা মধ্যস্থ থাকে (মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়) এবং জঘন্য তমোগুণাবলম্বীরা অধোগামী হয় (নরকে গমন করে, তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়)।

সত্ত্বগুণপ্রভাবেই মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, রজোগুণপ্রভাবে মনুষ্য মনুষ্যই থাকে ; বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না। আর তমোগুণ প্রভাবে ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যাহা আয়ুঃ, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্দ্ধন করে, এরূপ রসাল, স্নিগ্ধ, সারবান্‌ ও উপাদেয় আহারই সত্ত্বগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

কট্‌ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

অতিকটু, অত্যম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ এবং অতিবিদাহী,—এই সকল দুঃখশোক-রোগপ্রদ খাদ্যই রজোগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌॥

শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত (বাসী); রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ব (পচা, পান্তা) উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট), অপবিত্র খাদ্যই তমোগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, যে দ্রব্য যে গুণের প্রিয়, সেই সেই দ্রব্যই সেই গুণের বর্দ্ধক। উদাহরণ যথা ;—

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দুগ্ধ ভালবাসেন; আবার এই দুগ্ধই সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক।

রাজসিক ব্যক্তি লঙ্কামরিচের ঝাল ভালবাসেন; আবার এই লঙ্কামরিচের ঝাল রজোগুণের বর্দ্ধক।

তামসিক ব্যক্তি পচামাছ পেঁয়াজ দিয়া রসুই করা হইলে বড়ই প্রিয় বোধ করে; আবার এই পচামাছ ও পেঁয়াজ তমোগুণের বর্দ্ধক।

অথবা অধিক উদাহরণের প্রয়োজন কি? এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তদ্দ্বারা সহায়তা বা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত লিখিত হইল, তাহাতেও চিত্তগুণ সম্যক বর্ণিত হইল কিনা সন্দেহ করিয়া ভগবান্ মনুর কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈ-র্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ মহৎস্বরূপ আত্মার গুণ, এই তিন গুণ দ্বারা ব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছেন।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ঃ তং করোতি শরীরিণম্॥

এই তিন গুণ সকল দেহেই অল্পাধিক বিদ্যমান আছে। কিন্তু তন্মধ্যে যে গুণ যখন যে দেহে প্রবল হয়, তখন চিত্ত (আত্মা) তদ্‌গুণময় হইয়া থাকে। তজ্জন্য সাত্ত্বিক বলিলে সত্ত্বগুণ-প্রধান, রাজসিক বলিলে রজোগুণ-প্রধান এবং তামসিক বলিলে তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, একই গুণ চিরকালই যে একদেহে প্রধানরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে; থাকিতেও পারে, না থাকিতেও

পারে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিও সেজন্য কখনও রাজসিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কখনও বা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হন। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিও কখন কখন সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই সকল গুণ যে চিরস্থিত, তাহা মনে করিও না। ইহারা পরিবর্ত্তনীয়। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি যে, এই সকল গুণ পরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই সাধনের অভ্যাসের প্রয়োজন।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ, তমঃ অজ্ঞানস্বরূপ, রজঃ অনুরাগ ও দ্বেষস্বরূপ। সুতরাং এই জ্ঞান, অজ্ঞান, অনুরাগ ও দ্বেষ সকল দেহেই বিদ্যমান আছে।

যথার্থ যে জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান), তাহাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ; তদ্বিপরীত যে জ্ঞান (অবিদ্যাজনিত বিপর্য্যয় জ্ঞান), তাহাই তমোগুণের লক্ষণ এবং বিষয়াভিলাষ রজোগুণের লক্ষণ।

প্রীতি বা আনন্দই সত্ত্বগুণের স্বরূপ। অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখ বা ক্লেশই রজোগুণের স্বরূপ এবং মোহ, অজ্ঞানতা ও বিষাদই তমোগুণের স্বরূপ।

সত্ত্বগুণের বৃত্তিকে শান্তা রজোগুণের বৃত্তিকে ঘোরা এবং তমোগুণের বৃত্তিকে মূঢ়া বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন।

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥

আত্মাতে (চিত্তে বা মনে) প্রীতিযুক্ত, প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ যে ভাব অনুভব করা যায় তাহাই সত্ত্বগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্।

যাহা আত্মার দুঃখপ্রদ ও অপ্রীতিকর এবং অনিবার্য্য বিষয়স্পৃহাজনক, তাহাই রজোগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥

আর যাহা আত্মাকে হিতাহিতজ্ঞানবিহীন ও সন্দেহযুক্ত করে, সেই দুর্জ্ঞেয় বিষয়াত্মক চিত্তগুণকেই তমোগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

গুণত্রয়ের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের কার্য্যাদি নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা;—

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মিকা চিন্তা সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥

বেদাভ্যাস (অনন্তজ্ঞানোদ্ভূত শব্দ-ব্রহ্মের বা শাস্ত্রাদির অভ্যাস), তপঃ (মনোবাক্যের সংযম, তপস্যা) জ্ঞান শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধর্ম্মক্রিয়া আত্মচিন্তা (ঈশ্বর প্রণিধান), এইগুলি সাত্ত্বিক কার্য্য।

আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥

ফলের আকাঙ্ক্ষায় কার্য্যপ্রবৃত্তি, ফলপ্রাপ্তির ব্যাঘাতে অধীরতা; লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, অজস্র বিষয়াসক্তি, এইগুলি রজোগুণের কার্য্য।

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিকং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥

লোভ, নিদ্রালুতা, কাতরতা, ক্রূরতা, ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাস, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য, যাচ্ঞা এবং অমনোযোগ, এইগুলি তমোগুণের কার্য্য।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥

তমোগুণের প্রিয় কাম, রজোগুণের প্রিয় অর্থ, সত্ত্বগুণের প্রিয় ধর্ম্ম। অতএব তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ প্রধান এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ প্রধান।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবত্ব, রাজসিক ব্যক্তিরা মনুষ্যত্ব এবং তামসিক ব্যক্তিরা পশুত্বাদি অধম জীবত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর প্রস্তাব-বাহুল্যাশঙ্কায়, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক সমস্ত উদ্ধৃত না করিয়া কেবল অনুবাদমাত্র উদ্ধৃত হইল। এতদ্দ্বারাও ত্রিগুণের লক্ষণাদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুণত্রয়ের বৃত্তি।

শিষ্য। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি কি, তাহা বলুন।

গুরু। শম; দম, তিতিক্ষা, বিবেক, ধর্ম্মানুরাগ, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, সরলতা, বিনয়, ঈশ্বরপ্রেম ইত্যাদি সত্ত্বগুণের বৃত্তি।

আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, দর্প, অতৃপ্তি বা অসন্তোষ, গর্ব্ব (আত্মপ্রাধান্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের মনে ক্লেশ দেওয়া—ইহাও এক প্রকার হিংসা প্রবৃত্তি), কামনা, ভেদবুদ্ধি (শত্রুও মিত্রজ্ঞানে কাহারও অপকার ও কাহারও উপকার

করিবার প্রবৃত্তি), বিষয়ভোগ, যুদ্ধপ্রবৃত্তি, স্তুতি-প্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব প্রদর্শন, বলের উদ্যম, ইত্যাদি রজোগুণের বৃত্তি।

অসহিষ্ণুতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, অশাস্ত্রীয় কথা, হিংসা, যাচ্ঞা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা শ্রান্তি, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রান্তি, দুঃখ-দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয়, আলস্য বা নিরুৎসাহ ইত্যাদি তমোগুণের বৃত্তি।

শম অর্থাৎ যম-নিয়মাদি দ্বারা পুরুষ সত্ত্বযুক্ত, কামাদি দ্বারা রজোযুক্ত এবং ক্রোধাদি দ্বারা তমোযুক্ত হন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই গুণ, পুরুষের নহে; যেহেতু এই সকল গুণ চিত্তেই সম্ভূত হয় এবং সেই চিত্তের সংসর্গেই জীব যেন উক্ত গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন।

প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ, যখন রজঃ ও তমোগুণকে জয় করে, পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভাবে জীব সুখী, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী হইয়া থাকেন।

সত্ত্বগুণই পুরুষের উপলব্ধিস্থান। যখন মন প্রশান্ত হইবে, ইন্দ্রিয়-সকলের নির্ব্বৃতি হইবে, দেহের ভয়শূন্যতা হইবে এবং হৃদয়ের সঙ্গহীনতা জন্মিবে, তখনই চিত্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব বুঝিবে।

যখন ক্রিয়াবশে বিকৃত হইয়া পুরুষের চিত্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের অনির্ব্বৃতি জন্মিবে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের সমধিক বিকার উপস্থিত হইবে, মন ভ্রান্ত হইবে, তখনই চিত্তে উৎকট রজোগুণের আবির্ভাব বুঝিবে।

অত্যন্ত মলিন হইয়া চিত্ত যখন স্বীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়া চিদাকাররূপ পরিণাম গ্রহণে অসমর্থ হইবে, অর্থাৎ যখন চিত্তের ধারণাশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইবে, সঙ্কল্পাত্মক মন ও বিলীন হইবে, অজ্ঞান এবং বিষাদ জন্মিবে, তখনই চিত্তে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বুঝিবে।

সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতাদের, রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে অসুর বা দৈত্যদানবগণের এবং তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে রাক্ষসপিশাচ-গণের বল বৃদ্ধি পায়।

সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজঃ হইতে স্বপ্ন এবং তমঃ হইতে সুষুপ্তি বুঝিবে।

লোক সকল সত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, রজঃ দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন এবং তমঃ দ্বারা ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত অবতরণ করেন।

যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন, তাঁহারা স্বর্গে, যাঁহারা রজোগুণে লীন হন, তাঁহারা নরলোকে এবং যাঁহারা তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহারা নরকে গমন করেন।

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কৃত বা দাসভাবে কৃত যে নিজ কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক।

ফলকামনায় কৃত যে কার্য্য, তাহা রাজসিক।

হিংসাদির উদ্দেশে কৃত যে কার্য্য, তাহা তামসিক॥

দেহাদির অতিরিক্ত যে আত্মজ্ঞান, তাহাই সাত্ত্বিক।

দেহাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা রাজস।

প্রাকৃত অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানই তামস।

অরণ্যবাস সাত্ত্বিক, জনপদ-বাস রাজস এবং দ্যূতাদি স্থলে বাস তামস।

সঙ্গহীনকর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনুরাগ-বিমূঢ় কর্ত্তা রাজস এবং অনুসন্ধান-শূন্য কর্ত্তা তামস।

আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক। কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজস এবং অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামস।

অনায়াসলব্ধ ভক্ষ্য ভোজ্য সাত্ত্বিক। ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম ভক্ষ্য রাজস এবং দুঃখদায়ক অশুচি ভক্ষ্য তামস।

আত্মা হইতে উদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক। বিষয় হইতে উত্থিত সুখ রাজস এবং আলস্য, মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত সুখাভাস * তামস।

এইরূপ দ্রব্য দেশ, কাল, জ্ঞান, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, আকৃতি ও নিষ্ঠা সকলই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত—দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষের এই সকল গুণ কর্ম্মজন্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিত্তবৃত্তির-সংখ্যা।

গুরু। চিত্তবৃত্তি কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি কত প্রকার এক্ষণে তাহাই বলিব।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ।

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আর দুইপ্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক-প্রকার মনের ক্লেশদায়ক, আর একপ্রকার ক্লেশদায়ক নহে, বরং সাংসারিক উদ্বেগজনক ক্লেশের নিবারক। তজ্জন্য এক প্রকারের নাম ক্লিষ্টা আর অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্টা। পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি যথা,—

---

* প্রকৃত সুখ নহে, কিন্তু আপাততঃ সুখবৎ প্রতীয়মান যে সুখ।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা- স্মৃতয়ঃ।

প্রমাণবৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি এবং স্মৃতিবৃত্তি।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিনপ্রকার প্রমাণবৃত্তি আছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ। কার্য্য-কারণসম্বন্ধ বিচার করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে অনুমান, আর বেদ-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে বিশ্বাসবশতঃ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আগম বলে। যেমন আকাশে মেঘ দেখিয়া মেঘের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। মেঘ হইতে জল হইবে, ইহা অনুমানজ জ্ঞান। জল সূর্য্যকিরণে বাষ্পাকার ধারণ করিয়াই মেঘাকারে পরিণত হয়, এই জ্ঞান আগম।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।

যে জ্ঞান মিথ্যা, যাহা স্থিরতাপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ যাহা বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলেই তিরোহিত হয়, সে জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে। যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পবোধ করিলে বিপর্য্যয় জ্ঞান বলা যায়। [সংসারে প্রায় যাবতীয় মনুষ্যই এই বিপর্য্যয় জ্ঞান দ্বারা নিতান্ত অভিভূত]।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।

বস্তু নাই, কিন্তু শব্দ আছে বলিয়া যে একপ্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই বিকল্প বলে। যেমন খ-পুষ্প শশ-বিষাণ ইত্যাদি। আবার প্রকৃতবস্তু দুইটি, কিন্তু শব্দ দ্বারা একটি বস্তু বুঝাইলে, তাহাকেও বিকল্প বলা যায়। যেমন অঙ্গার ও অগ্নি দুইটি পদার্থ, কিন্তু অগ্নিযুক্ত অঙ্গার অগ্নি-নামে একই পদার্থের প্রতীতি জন্মায়। অতএব স্বরূপ স্থলেও বিকল্প জ্ঞান। এইরূপে বিকল্প দ্বারা জীবাত্মা দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থের সংযোগেও একটিমাত্র পদার্থের জ্ঞাপক হয়। ইত্যাদি। আবার কখন শব্দ-শক্তির প্রভাবে একই বস্তু দুইটি বলিয়া জ্ঞান হয়; যেমন আত্মা ও চৈতন্য একই

বস্তু হইলেও "আত্মার চৈতন্য" এরূপ উক্ত হইয়া কখন কখন দুইটি পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। এই জ্ঞানকেও বিকল্প বলা যায়।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা।

যখন সমুদয় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তাহাকেই নিদ্রা সুষুপ্তি বলে। যখন তমোগুণে চিত্তের সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকে, তখনই সুষুপ্তি বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা জন্মে এবং তখনই চিত্তবৃত্তির যেন অভাব হয়। এই অবস্থাই নিদ্রাবস্থা। গভীর নিদ্রার পরে আমরা জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারি যে, নিদ্রাবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এই জন্যই লোকে বলে, "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার কোন জ্ঞান ছিল না।" অতএব নিদ্রাবস্থাতেও আমাদের অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকে, এবং সেই অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানই নিদ্রাবৃত্তি। স্মৃতি দ্বারাই এই বৃত্তি অনুভূত হয়।

অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।

কোন বিষয় একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া চিদাকারে পরিণত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়টি কখনও পরিত্যাগ করে না। অতএব অনুভূত বিষয়ের পরিত্যাগের নামই স্মৃতি। অনুভূত বিষয় সংস্কার রূপে চিরকালই চিত্তে অবস্থিতি করে। তাহার উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার যেন জাগিয়া উঠে এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয় চিত্তে পুনরুদিত হয়। এই জাগিয়া উঠা বা পুনরুদয়ের নামই স্মৃতি বা স্মরণ।

কোন ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় যদি কোন ছাঁচে ঢালা যায়, তবে ঢালিবামাত্র সেইধাতু যেমন ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কোন বিষয় চিত্ত সংলগ্ন হইলেই চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে;—ইহাকেই বিষয়ের চিদাকার প্রাপ্তি বলে, অথবা বিষয়ের জ্ঞান বলে। কিন্তু ঢালিবার দোষে বা অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হেতু যেমন অনেক সময় ছাঁচের

অনুরূপ গঠনের ব্যতিক্রম হয়, তদ্রূপ চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু বা মালিন্য হেতু অনেক সময় সেই চিত্ত সম্যক্ বিষয়াকার ধারণ করিতে পারে না। যখন সম্যক্ ধারণ করিতে পারে না, তখন তদ্বিষয়ক স্মৃতিও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না। চঞ্চল বা কলুষিতচিত্ত কোন বিষয় যেরূপভাবে গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ক স্মৃতিও তদ্রূপ হইবে।

এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি রোধ করাই যোগসাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এস্থলে এত কথার আলোচনা কেন করিলাম, তুমি তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।

নবম পরিচ্ছেদ।

চিত্তের উৎকর্ষ-সাধন।

শিষ্য। আপনি যে জন্য প্রাগুক্ত গুরুতর কথাগুলির আলোচনা করিলেন, আমি তাহা সম্যক্প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; অতএব আমাকে তাহা বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। আমি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান, তাহা চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া,—চিত্তবৃত্তি আবার গুণ সম্ভূত। অতএব তাহা বুঝিয়া যাহাতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন হয়, তাহাই করা উচিত।

শিষ্য। চিত্তবৃত্তির আবার উৎকর্ষসাধন কি প্রকার? আমি এ কথাটির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গুরু। উৎকর্ষ শব্দটি কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কৃষ ধাতুর অর্থ চাষ করা। অতএব উৎকর্ষ শব্দে উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ অর্থাৎ ভালরূপে চাষ করা বুঝায়। এখন সাধন,—সাধন শব্দটি সাধ ধাতু হইতে বা ণ্যন্ত সিধ ধাতু অর্থাৎ সাধি ধাতু হইতে উৎপন্ন। পারলৌকিক বা অপারলৌকিক ভেদে এই দুই ধাতুর অর্থগত প্রভেদ আছে। সে সকল কথার এ স্থলে প্রয়োজন নাই। সাধক বলিলে কি বুঝায়, তাহাই জানা আবশ্যক। সাধন শব্দে সম্পাদন, কারণ বা অভ্যাস। চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন অর্থে—"চিত্তবৃত্তির চাষ করা।"

প্রাচীন হিন্দুগণ আপনাদিগকে "আর্য্য" বলিতেন। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋ ধাতুর অর্থও চাষ করা। অতএব আর্য্য শব্দের অর্থ চাষা। এই জন্যই এখনকার অনেক মহাত্মা আর্য্যগণকে চাষা এবং বেদগাথাকে "চাষার গান" বলিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্যেরা এ চাষ কোথায় করিতেন? সেদিনকার এক সাধক অতি গম্ভীরস্বরে গাহিয়াছিলেন,—

মন, তুমি কৃষিকাজ জান না;

এমন মানব-জমী রৈল পতিত, আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোণা"

মানব-জমীর কোথায় আবাদ করিতে হয়? চিত্ত-ভূমিতে। সেখানে আবাদ করিলে কি সোণা ফলিত? না ফলিত কি? চিত্ত-ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইলে সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারিত!

চিত্ত-ভূমির এই চাষ-আবাদ অবশ্যই রূপক। কিন্তু ইহা আবশ্যক এবং উচ্চশ্রেণীর রূপক। ইহার অভ্যন্তরে এক মহাভাব অতি সুন্দররূপে সজ্জিত আছে।

চিত্ত-ক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত বন্ধুর, অর্থাৎ উচ্চাবচ এবং তাহার গুণও বিভিন্ন;—তজ্জন্য তাহাকে সমতল করা আবশ্যক এবং তাহারও গুণেরও

সমতা বিধান বা উৎকর্ষ বিধান আবশ্যক। চিত্তের মূঢ় ও ক্ষিপ্ত অবস্থা চাষ করিয়া একাগ্র করা আবশ্যক, চিত্তের তমঃ ও রজঃ এই গুণদ্বয়ই উক্ত মূঢ় ও ক্ষিপ্ত অবস্থার হেতু বলিয়া এই দুই গুণের দমন আবশ্যক।

এখন কৃষিকার্য্যে জমী হইলেই সাফল্য হয় না। তাহার অনেক যন্ত্রাদি চাই,—তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল।

আমাদের পুরাতন মতে বলরাম হলধর। লাঙ্গল তাঁহারই হস্তে—তিনি সঙ্কর্ষণ। জগদাকর্ষণ তাঁহারই অধীন, তিনি প্রতিজ্ঞায় সুদৃঢ়। বলে অতুল্য—ভীমকর্ম্মা। অতএব অধ্যবসায়ই লাঙ্গল। জ্ঞানাদি অন্যান্য যন্ত্র। এখন আর একটি প্রধান অভাব।

সে অভাব ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? লাঙ্গল টানিবে কে? লাঙ্গল টানিবে বলদে। লাঙ্গল টানে বলদ।

বলদশব্দের অর্থ যাহা বল দান করে। ইহার অন্য নাম বীর্য্য বা ওজঃ। এই বীর্য্যই শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, বল ও উৎসাহ প্রভৃতির উৎপাদক।

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই বীর্য্য ধারণ করিলে, তবে তোমার কৃষিকার্য্যের আয়োজন হইবে। অতএব যাহারা প্রথম "যৌবনের দুয়ারে" উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বীর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়া অধ্যবসায় ও শৌচারের দ্বারা উন্নতজীবন লাভ করিতে বা চিত্তভূমি চাষ করিতে শিক্ষা দিবে।

শিষ্য। আমার একটি নিবেদন আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। এই বলদ যাহারা আপন দোষে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কি দিয়া এই আধ্যাত্মিক চাষ আরম্ভ করিবে? ফলকথা যাহারা অত্যাচারে অনাচারে বীর্য্য হারাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের হৃদয় বলশূন্য—কি প্রকারে এ সাধন-পথে অগ্রসর হইবে?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রয়োজনই সেই বল সঞ্চয়। যাহাদের নূতন বীর্য্য হইতেছে, তাহারা তাহা যেরূপে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহাও এই ব্রহ্মচর্য্যের অধীন,—আর যাহারা হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা যাহাতে পুনঃসঞ্চয় ও রক্ষা করিতে পারে, তাহাও ইহার উদ্দেশ্য। আর যাহারা দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায়,—তাহারা বিবাহিত-জীবনে—গার্হস্থ্যধর্ম্মে ইহার যথাবিধি ব্যবহার করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে তাহার বিধান করাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত।

এখনও চিত্ত-ভূমির উৎকর্ষ-সাধন জন্য শৌচাচারের প্রয়োজন। কেননা, সত্ত্বগুণ প্রধান না হইলে চিত্তক্ষেত্র পবিত্রভূমি হয় না। সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ করিতে হইলেই বাহ্যাভ্যন্তর শৌচাচারে পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

বালকগণকে, সন্তান-সন্ততি সকলকে শৌচাচারে অভ্যস্ত করিবে। নিজেরাও সেই পথে সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। আজ আমাদের চারিদিকে যে পাপের বিভীষিকা—কামের তাণ্ডব নৃত্য; তাহার কারণ আমাদের মধ্যে শৌচাচার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব। পশুগণের ন্যায় আহার নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত আমাদের সমাজের নরনারীর মধ্যে আর কিছুই নাই। তাই আমাদের সমাজের এই হীনতম দুর্দ্দশা।

তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, চিত্তের বা চিত্ত-ভূমির অবস্থা উন্নত করিতে পারিলেই আমরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি। এই যে কামাচারে—এই যে কদাচারে নরনারী-হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহারও কারণ চিত্তের মূঢ়তা। এখন যাহাতে সেই চিত্ত ভাল হয়, প্রসন্ন হয়, নিরুদ্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

শিষ্য। চেষ্টা করা আবশ্যক—কিন্তু কি করিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তাহার পথ বলিয়া দিন।

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—

অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

যোগিগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধের দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—এক অভ্যাসের দ্বারা, অপর বৈরাগ্যের দ্বারা। বৈরাগ্যের কথা স্বতন্ত্র,—অভ্যাসই আমাদের অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস কি ?

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক বৃত্তির উত্থান দমনের জন্য যে যত্ন, তাহারই নাম অভ্যাস।

এখন যত্ন বলিলেই যত্ন হইল না। তাহা দৃঢ় ও অবিচলিত হওয়া চাই। কি প্রকারে তাহা হয় ?

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য-সৎকার-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।

সেই অভ্যাস নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রদ্ধা সহকারে করিলে, উহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

একটা উদাহরণ লইয়া অভ্যাস জিনিষটার বিষয় আর একটু আলোচনা করা যাউক।

একটি বালক প্রত্যহ বেলা দশটার সময় আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। বিদ্যালয়ে গিয়া যথারীতি অধ্যয়নাদি করিয়া বেলা চারিটার সময় বাড়ী আসে। সে গ্রীষ্মের সময় দেড়মাস অবকাশ পাইল, এখন তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয় না,—নিশ্চিন্তমনে খেলা করে, পড়া-শুনাও করে, কিন্তু বেলা বারটার সময় আহার করে—তারপর নিদ্রা যায়, তিনটার সময় উঠিয়া আবার পড়া-শুনা করে। এইরূপে দেড়মাস কাটাইয়া ছুটির অবসানে আবার সে বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে গিয়া দেখ, বেলা বারটার সময় বালক নিদ্রায় ঢুলিতেছে। ইহার কারণ কি ? অভ্যাস। এ অভ্যাস দূর করিবার উপায় কি ? প্রতি-অভ্যাস।

চোখে মুখে জল দিয়া অন্য দিকে চাহিয়া নিদ্রাকে তাড়াইবার চেষ্টা করা,—নিদ্রাকে আনিতে ছুটির সময় চেষ্টা বা অভ্যাস করা হইয়াছিল, এখন তাড়াইবার জন্যও আবার প্রতি-অভ্যাস করিতে হইয়াছে। কিছুদিন এইরূপ প্রতি-অভ্যাসের পর দেখিবে, আর তাহার দিবানিদ্রা নাই,—সে আর বিদ্যালয়ে আসিয়া ঝিমায় না। যদি তখনও ঝিমাইতে দেখ, তবে বুঝিতে হইবে, সে স্থানে প্রতি-অভ্যাস সম্যক্ অভ্যস্ত হয় নাই।

যাহা হউক, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি বুঝিলে ?

কিছুদিন ধরিয়া নিয়ত কোন কাজ করিলে, শেষে সেই কার্য্য-প্রবৃত্তি যেন স্বাভাবিক চিত্ত-বৃত্তিরূপে পরিণত হয়। আবার কিছুদিন ধরিয়া যদি নিয়ত উক্ত কার্য্যের বিপরীত কাজ করা যায়, তবে সেই কার্য্য-প্রবৃত্তিকে চিত্র-ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করাও যায় ; অতএব সমস্ত চিত্তবৃত্তিই অভ্যাসের ফলমাত্র। এই অভ্যাস কর্ম্মেরই নামান্তর অথবা কর্ম্মেরই নামান্তর অভ্যাস। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের যে স্বতঃপ্রবণতা জন্মে, তাহাকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার অভ্যাসের ফল। একমাস যত্ন করিয়া দিবানিদ্রা অভ্যাস করিলে, তৎপরে যে নিদ্রা দিবাভাগে স্বতঃই আসিয়া তোমাকে শয্যায় লইয়া যায়,—তাহা অভ্যাসদ্বারা তোমার চিত্তে নিদ্রার সংস্কার জন্মাইয়া থাকে। সেই সংস্কারই তোমাকে নিদ্রার জন্য আকর্ষণ করে।

বলা হইল, অভ্যাসবশতঃ চিত্তের যে স্বতঃপ্রবণতা, তাহাই সংস্কার এখন চিত্তের স্বতঃপ্রবণতা কি ?

আপনা হইতে অর্থাৎ যত্ন না করিলেও কোন কর্ম্ম করিতে মনে যে ইচ্ছার উদয় হয়, সেই ইচ্ছাকেই চিত্তের স্বতঃপ্রবণতা বলে।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নদিকে গমন করে,—ইহাকে তরল পদার্থের স্বতঃপ্রবণতা বলে। অভ্যাস দ্বারা মনে একটি সংস্কার জন্মে, তাহা স্বতঃপ্রবণ। কিন্তু এই সংস্কাটি চিদাকার-প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহা মনেরই

আকার গ্রহণ করে। সেই জন্য ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, মন, চিত্ত, সংস্কার এগুলি যেন একার্থবাচক হইয়া বসিয়াছে।

"আমি একাজ করিব কি প্রকারে, ইহা করিতে আমার মন নাই;"—এস্থানে এই বাক্যে কি কি বুঝিলে?

এখানে মন শব্দে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি কিংবা সংস্কার বুঝিতে হইবে। অতএব বুঝিয়া রাখ যে, চিত্ত বা মনই সংস্কাররূপে যেন তরলাকারে পরিণত হয়।

সুতরাং যেমন খাল খনন করিয়া জলকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়, তেমনই অভ্যাস দ্বারা মনকে সংস্কারে পরিণত করিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়।

মনকে কোন স্থানে লইয়া যাওয়া, আর মনকে সেই স্থানে সংযুক্ত করা অথবা সেই স্থানে মনোযোগ দেওয়া, একই কথা। তবে এখন ভালরূপে বুঝিয়া দেখ যে, মনোযোগ অভ্যাসেরই ফল।

অতএব চিত্তভূমির উৎকর্ষ জন্য শৌচাচার নিয়ম-সংযম সমস্ত অভ্যাস করিতে হইবে। কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, আর বংশবৃদ্ধির চেষ্টা লইয়া বিচরণ করিলে জীবনে পবিত্রতা ও উচ্চভাব আগমন করিবে না—মানব-জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না।

শিষ্য। আর এক কথা। একটি মেয়েলী শ্লোক আছে,—"টাক প্রকৃতি গোদ, ম'লেও না হয় শোধ।"

এখানে প্রকৃতি অর্থে বোধ হয় স্বভাব। অতএব টাক, স্বভাব আর গোদ (শ্লীপদ) রোগ মৃত্যুর পরেও শোধ হয় না। কিন্তু যদি একজনের প্রকৃতি বা স্বভাব শৌচাচার ও নিয়ম-সংযমের দিকে না যায়, তবে সে কি করিবে?

গুরু। এই মাত্র যাহা বলিলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতেছ বলিয়া পুনরায়

এ প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছ। এক মাস ধরিয়া দিবানিদ্রা অভ্যাস করিলে চিত্তে যে দিবানিদ্রার সংস্কার জন্মে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সংস্কার কি, তাহাও বুঝিয়াছ। এক্ষণে জান যে এই সংস্কার আর প্রকৃতি অভিন্ন। সংস্কারের হেতু অভ্যাস; প্রকৃতিরও হেতু অভ্যাস এবং অভ্যাসই প্রকৃতি বা স্বভাবরূপে পরিণত হয়,—এ কথারও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; তবে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারকেই লোকে সাধারণতঃ প্রকৃতি বা সংস্কার বলে। তুই একমাসের অভ্যাসবশে যে সংস্কার জন্মে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি বা স্বভাব বলে না। কিন্তু মূলতঃ উভয়ই এক।

যখন সূক্ষ্মদেহান্তর্গত জীব, এই স্থূলশরীরকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি সহ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয় এবং পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করে, ইহারই নাম জন্মান্তর পরিগ্রহ।

তুমি যদি ইহজন্মে ক্রমাগত হিংসা অভ্যাস কর, তবে হিংসাই তোমার প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া পড়িবে। তুমি ইহ জন্মের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া জন্মান্তর পরিগ্রহ করিলেও তোমার প্রকৃতি বা স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেন না, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতত্ত্ব তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। সুতরাং তোমার চিত্তজ সংস্কার বা প্রকৃতি জন্মান্তরেও তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। *

তুমি পরজন্মে সেই সহজাত সংস্কার বা প্রকৃতির বশেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং একজন্মে হিংসা পাপাদি অভ্যাস করিলে, পরজন্মেও সেই পাপ হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আবার কার্য্যের যে

* এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো মরণেঽপ্যনুযাতি যঃ—এ স্থলে ধর্ম্মশব্দে সুকৃতি বা পুণ্য। অতএব সুকৃতি বা পুণ্য যেমন মরণেও অনুগামী হয় দুষ্কৃতি বা পাপও তদ্রূপ অনুগামী হইয়া থাকে।

ফল, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব হিংসারূপ পাপের ফল স্বরূপ ক্লেশ অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং যে কাজ করা হয়, তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু যেমন একমাসের অভ্যাসের সংস্কারকে তদ্বিপরীত অভ্যাসদ্বারা এক মাসের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত করা যায়, তেমনই এক জন্মের অভ্যস্ত প্রকৃতিকে পরজন্মের অভ্যস্ত প্রকৃতি দ্বারা নিবারণ করা যায়।

সংস্কারের স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইলে, পুরুষকারের প্রয়োজন, সুতরাং পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায়। উৎকট যত্ন বা অভ্যাসের নাম পুরুষকার।

অতএব ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইলে, এই উৎকট যত্ন বা অভ্যাসের প্রয়োজন।

যে প্রকারে তাহা সম্পন্ন হইবে,—মানুষ শৌচাচার সম্পন্ন হইয়া কামরিপুকে বশীভূত করিতে পারিবে,—তাহা কর্ম্মযোগ বা নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা সম্পন্ন হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিত্যকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি

গুরু। ব্রহ্মচারীর চিত্তশুদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন। বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কাম-ক্ষুধার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। মানুষ যদি পশুবৃত্তি লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তবে পশুর ন্যায়ই ক্রিয়া সকল তাহার জীবনে জড়াইয়া থাকে।

শিষ্য। কি প্রকারে চিত্তশুদ্ধি হয়?

গুরু। যথাবিধানে হিন্দুর অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইলেই মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে অনেক পিতা-মাতা আচার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা মনেও করেন না যে, বাঁধাবাঁধি আচারহীন মানুষ পশুরও অধম,—তাঁহারা যে উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ লইয়া তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার মোহ-সাগরে ফেলিয়া যাইতেছেন, তাহারা তাহা হইতে আর কখনও উঠিতে পারিবে না। তাহারা সদাচারী না হওয়ায়, হৃদয়হীন ও কুপ্রবৃত্তি সকলের দাস হইয়া পড়িবে এবং অল্পবয়সে নানাবিধ রোগের অধীন হইবে। ধর্ম্মজীবন —কর্ম্মজীবন ও সংযমের সংসার যে কত সুখের, কত আনন্দের ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা; তাহা অসদাচারী বুঝিতে পারে না।

শিষ্য। কিরূপ প্রকার বিধানে নিত্যকর্ম্ম করিলে, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া উঠে, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। হিন্দু এই বিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন,—চিত্তশুদ্ধির জন্য যেরূপভাবে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হিন্দু সাধারণেই অবগত আছেন এবং ইহার জন্য অনেক পুস্তকাদিও প্রচারিত হইয়াছে। এস্থলে কেবল কর্ম্মের ক্রম-বিধানটি বলিব। কেননা, নিত্য-কর্ম্মের বিধান, পদ্ধতি, মন্ত্র, উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান তৎসমস্ত বলিতে হইলে, অনেক সময় ও পরিশ্রমসাধ্য—বিশেষতঃ বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় বলিতে এখনও অনেক বাকী আছে। সংক্ষেপভাবে যাহা বলা যায়, তাহাই এস্থলে বলিতেছি। প্রয়োজন হেতু এসকল কথা আর একবারও বলা হইয়াছে,—এখানে দ্বিরুক্তি হইল মাত্র।*

শাস্ত্রে নিত্যকর্ম্মকে সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) প্রাতঃকৃত্য, (২) পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, (৪) অপরাহ্নকৃত্য, (৫) সায়াহ্নকৃত্য, (৬) ও রাত্রিকৃত্য।

সাড়ে চারিটা হইতে প্রাতঃকাল; ছয়টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যের সময়। এই সময় প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় চিন্তা, দৈনিক ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থাদি আয়ের উপায়—কর্ম্ম-স্থিরীকরণচিন্তা, পৃথিবীকে নমস্কার, মলমূত্র-ত্যাগ, শৌচক্রিয়া, আচমন, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান, তিলকধারণ, তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়।

ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত দেবগৃহ-মার্জ্জনাদি, গুরুদর্শন বা চিন্তন, মাঙ্গল্যদ্রব্য দর্শন, কেশপ্রসাধন, মুখদর্শন, পুষ্পচয়ন, প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত বেদাভ্যাস ও শাস্ত্রালোচনা করিবার বিধান আছে।

---

* এই সম্বন্ধে "নিত্যকর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি, সত্বরেই তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নস্নান এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা-পূজাদি করিবে।

বারটা হইতে দেড়টা পর্য্যন্ত হোম, বৈশ্বদেববলি, বলি, অতিথিসৎকার-নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস-দান ও নিজে ভোজন করিবে।

তৎপরে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক, চিত্তরঞ্জক বিষয়ের আলোচনা, সাধুসঙ্গ ও সদালাপে অতিবাহিত করিবে এবং ভ্রমণাদিও করিবার বিধি আছে।

সূর্য্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনার সময়।

রাত্রির প্রথম নয়টার মধ্যে দিবসের কার্য্য সমুদয়ের আলোচনা ও যে সকল অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে বাকী আছে, তাহা সম্পাদন করিবে।

তদনন্তর রাত্রি নয়টার পরে বৈশ্বদেববলি, অতিথিসৎকার পূর্ব্বক নিজে আহার করিবে এবং যথাবিধি দারোপগমন ও সুনিদ্রায় রাত্রিকাল অতিবাহিত করিবে।

কিন্তু যখন শাস্ত্রের এই সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তখন ভারত-বাসীর এমন দুর্দ্দিন ছিল না। তখন প্রতিমানবের উদরান্নের জন্য এমন করিয়া খাটিতে হইত না,—এমন করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুষ্টি-অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত না। তখন ধান্য, চাউল, তৈল, ঘৃত, আটা, ময়দা, দুগ্ধ, চিনি এদেশে অনায়াসলভ্য ছিল,—তৎকালে সমাজ বিলাস-যন্ত্রে এরূপে নিষ্পেষিত হইত না। লোকে মোটা ভাতে, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট ছিল। এখন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গৃহীকে যে কোন প্রকারেই হউক, অতিথি সৎকার, আত্মীয়-স্বজনের সেবা ও প্রতিপালন করিতেই হইবে। না করিলে ধর্ম্মতঃ প্রত্যবায় আছে; আর তাহা করিতে হইলেই গাধার খাটনি খাটিতেই হইবে। কাজেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার-নিত্যকর্ম্ম করা, আর এখনকার

লোকের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কেননা, তাহাদের অর্থ চিন্তায় সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও কুল নাই—তাহারা কি প্রকারে সারাদিন ঐ সকল কাজ লইয়া থাকিবে? ঐরূপ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও পাপভাগী হইতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥
মাতৃপিতৄন শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥
মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র,—অষ্টমোল্লাস।

"বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং শিশুসন্তান পরিত্যাগ করিয়া অবধূত আশ্রমে যাইতে নাই। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, স্ত্রী, শিশুসন্তান, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হয়, সে মহাপাতকী মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।" অতএব যাহাতে ধর্ম্মের অবিরোধিভাবে সংসার পরিচালনোপযোগী অর্থাদি উপার্জ্জন হইতে পারে, এমন সময় রাখিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে; বোধ হয়, নিম্নলিখিত ভাবে ও সময়ে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কাহারও অসুবিধা না হইতে পারে।

প্রত্যূষে সাড়ে চারিটার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় পাঠ করিবে; যথা—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাহুকেতু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

ইহা পাঠ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব দেবতাত্রয়ের সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের বিষয় অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কথা স্মরণ করা হইল,—আর সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহের শক্তি এবং গ্রহলোকের মাহাত্ম্য স্মরণ করা হইল। ইহাতে অলঙ্কারের সঙ্কোচ হয়। জগৎই যে নিত্য নহে, পরিদৃশ্যমান পদার্থের অতীত যে কিছু আছে, এমনও স্মরণ হয়। যেমন চন্দ্র মনে করিলেই, আকাশ, নক্ষত্র ও দিক্ মনে আইসে, সেইরূপ ঐগুলি স্মরণ করিয়া জগৎ হইতে নিজের বিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ সন্নিকট আসক্তি অত্যন্ত ঋজু হয়।

তারপরে, গুরুদেবকে স্মরণ ও নমস্কার করিবে;—যথা—

স্মরণ,—প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥

প্রণাম,—নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞকম্ ॥

মানুষই মানুষের আদর্শ। শান্ত মানুষের আদর্শ অনন্ত ঈশ্বর হইতে পারে না। মানুষের নিকট মানুষে শিক্ষা পায়,—মানুষের আদর্শে মানুষের চরিত্র, হৃদয় প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে। দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ প্রভৃতি বলায়, গুরুদেবকে মানব বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাঁহার রূপ চিন্তা করিলে, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার উপদেশ সমস্তই চিত্তে উদিত হয়,—তৎপরে তাঁহার উদ্দেশে প্রণামবাক্যে বলা হইল, গুরুদেব ইষ্টদেবতার স্বরূপ—যাঁহার বাক্য সংসার-বিষ বিনষ্ট করে, তাঁহাকে প্রণাম।

ইহাতে সংসার যে বিম্ববৎ ও অনিত্য, গুরুদেবের বাক্য বা উপদেশ যে সেই সংসার-বিনাশের উপায়, এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করিয়া দিনের প্রথম উদয়ে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে শান্তি বিনোদন পুনর্জ্জাতবৎ ধর্ম্মতত্ত্বের আদি সোপানে প্রথম পদবিক্ষেপ হইল; তৎপরে পাঠ করিতে হয়,—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥
লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি,-র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

পূর্ব্বে চরিত্র গঠনার্থ আদর্শ মনুষ্য গুরুদেবের চিন্তা করিয়া, তৎপরে আপনি যে সচ্চিদানন্দরূপ শোক-দুঃখাদির অতীত ও অবিনাশী ইত্যাকার আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া, পরতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা ও তদাজ্ঞা চিন্তনরূপ আকিঞ্চন ভাব করিবে, ইহাই কর্ম্মতত্ত্বের আদি সোপান। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি,—ভগবানের সকল, আমি তাঁহার দাসানুদাস,—তাঁহারই প্রীত্যর্থে, তাঁহারই সংসারে কাজ করিতেছি,— ইত্যাকার জ্ঞানই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম সোপান। উক্ত শ্লোকে তাহারই বিকাশ হয়। নিত্য প্রভাতে ঐ সকল বিষয় চিন্তা দ্বারা চিত্ত একমুখ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেই সত্ত্বগুণের উদয় হইয়া থাকে।

শিষ্য। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ"—এই শ্লোকের অর্থদ্বারা ইহাই বুঝা যায় এবং সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে,—"আমি ধর্ম্মজানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না এবং অধর্ম্ম জানিয়াও তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ! তুমি এই হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাকে যাহাতে নিযুক্ত করিতেছ, আমি

তাহাই করিতেছি।" ইহাদ্বারা বুঝা যায়, ভগবানই আমাদিগকে ধর্ম্মে এবং অধর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।

গুরু। না, ঐ শ্লোকের অর্থ ঐরূপ নহে। "লোকেশ চৈতন্য" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য করিলে, স্পষ্টতঃ তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহার অর্থ এরূপ,—"হে লোকেশ! হে চৈতন্যময় অধিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! তোমার আদেশ পালনার্থ ও তোমার প্রীতিবিধানার্থ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সংসার-যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি। (জানামি ধর্ম্মং ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোক)—"হে হৃষীকেশ! তোমার আদেশ প্রতিপালন ও প্রীতিবিধান কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা হৃৎপ্রদেশস্থ যে তুমি, সেই তোমার আজ্ঞা হইতেই তোমা অবগত হই এবং ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মের নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে, তাহাতেও মদীয় কর্ত্তৃত্ব নাই।" চিত্তে এই ভাব দৃঢ় হইলেই কর্ম্মযোগ আরম্ভ হয়। তৎপরে পাঠ করিবে ;—

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভুৎ।
যোহস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশিনীঃ।

"কর্কোটস্য নাগস্য"—হইতে "মন্দোদরী তথা" পর্য্যন্ত—প্রাগুক্ত শ্লোকগুলিতে কতকগুলি দেবতা, রাজা ও স্ত্রীলোকের নাম এবং ঘটনার

আভাস দেওয়া হইয়াছে; উহা প্রত্যহ প্রভাতে স্মরণ করিলে, তাঁহাদের চরিত্র, কর্ম্ম এবং অতীত ঘটনা স্মরণ-পথে উদিত হয়। উদ্গীর্ণ দর্ভ-কবলের মত সেই অতীত ঘটনার স্মৃতি আমাদের সম্মুখে যেন পতিত হয় এবং তৎপথে আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে। তাহাদের ভাল মন্দ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়।

প্রাগুক্ত দেবতা, রাজা ও মহিলাদিগের জীবন-চরিত আমাদিগের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন; উঁহাদিগের নাম করিলেই তাঁহাদিগের চরিত্র স্বতঃই মনে উদয় হইয়া পড়ে। যে কোন একটি শব্দ আমাদের মনে হইলে বা উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থ ও ভাব মনে হয়। মনে কর, "বেদব্যাস" এই কথা বলিলেই, অনন্ত জ্ঞান-বিবেকের আধার, অনন্ত চিন্তাশক্তির কেন্দ্ররূপী সৌম্যশান্ত একটি ঋষিমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্তসারও মনে আইসে। তখনই কেমন তাঁহার সেই পবিত্র ভাব আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিয়া দেয়। আবার "দুঃশাসন" এই শব্দ উচ্চারণ বা মনে করিলে, ধূর্ত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, শঠ বিবেকহীন এক রাজপুত্রের মূর্ত্তি মনে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত-সারের ভাব আমাদের চিত্তে উদিত হইয়া দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। এখন মনে করিতে হইবে, বেদব্যাস (বে দ ব্যা স) অথবা দুঃশাসন (দুঃ শা স ন) এই বর্ণগুলির কিছু কোন অর্থ নাই; যখন ঐগুলি একত্র হইয়া শক্তি উৎপন্ন করিয়া কোন ভাব আনয়ন করে, তখনই আমরা সদ্ভাবে সুখী ও অসদ্ভাবে দুঃখী হইয়া থাকি। "সন্দেশ" দিব এই কথা বলিলে, বালক শব্দশক্তির ভাবে বুঝিতে পারে, মিষ্ট দ্রব্য পাইবে—এবং মিষ্টদ্রব্যের রূপও তাহার হৃদয়ে সমুদিত হইলে, আস্বাদাদি ভাব মনে জাগরূক হয়। আবার "ঐ জুজু" বলিলে ভয় পায়,—ইহাও শব্দশক্তির ভাব।

সন্দেশ বা জুজু কিছুই তাহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই, কেবল প্রতিপাদ্য বস্তুর ভাবপ্রবাহ তাহাকে আনন্দিত বা ভীত করিয়াছে।—প্রাগুক্ত নামগুলি করিলে প্রভাতে নূতন জীবনে কর্ম্মকাণ্ডের ভাবরাশি অধ্যাসিত হয়। কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়।

তৎপরে সেই শয্যায় বসিয়াই অর্থোপার্জ্জনাদি কার্য্য অসৎপথে না গিয়া কি উপায়ে সম্পাদন করিবে, তাহার চিন্তা করিবে। কারণ প্রভাতেই চিন্তাশক্তি স্থির থাকে। কার্য্যের সঙ্কল্প এই সময় করিলে,তাহা উত্তমই হয়।

প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্।
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥

"সমস্ত দিবসে কি কি কার্য্য করা হইবে, ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট না হইয়া, কি কি অর্থসাধন করিতে হইবে এবং ধর্ম্মার্থের অবিরোধী কি কি কামসাধন করিবে, সেই সমুদয়ের চিন্তা করিয়া শয্যাত্যাগ করিবে। এরূপ করিলে, ক্রমে ক্রমে দিন দিন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

শিষ্য। আপনি ধর্ম্মের অবিরোধী কর্ম্ম এই কথা বলিলেন, এই ধর্ম্ম বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে?

গুরু। আমি সমস্ত ধর্ম্মেরই অবিরোধী—এইরূপ ভাবেই বলিয়াছি। ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ।

শিষ্য। আপনি না হয় আর একবার বলুন।

গুরু। শাস্ত্রে উহার যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই :—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

মনুসংহিতা।

ধৃতি,—সন্তোষ; ক্ষমা,—অপকারীর প্রত্যপকার না করা; দম,—

বিষয় সংসর্গে মনের অবিকার ; অস্তেয়,—পরধন হরণ না করা ; শৌচ,—মৃত্তিকা-জলাদিদ্বারা দেহশোধন এবং চিত্তবিশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শুদ্ধি,ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করা ; ধী, শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুশীলন ও বিচারদ্বারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা, বিদ্যা,—আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি,কোথায় যাইব, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ও ঐ স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত আমার সম্বন্ধ কি—ভগবান্ কে—তাঁহাতে আমাতে প্রভেদ কি ইত্যাদি বিষয় জ্ঞান ; সত্য —যথার্থ জ্ঞাপন ; অক্রোধ,—ক্রোধের কারণ উপস্থিত সত্ত্বেও ক্রোধ না করা ; এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ। ইহাতেও যাহারা অনধিকারী অর্থাৎ এগুলি প্রতিপালনেও যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা প্রথমে ষড় লক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্মাচরণ করিলে, ক্রমে দশলক্ষণান্বিত ধর্ম্মাচরণে উন্নীত হইবে যথা,—

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

পদ্মপুরাণ।

সৎপাত্রে দান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি, মাতা পিতার সেবা-শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), বলি, (দেবোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান), ভূতযজ্ঞ (প্রাণীদিগকে খাদ্যাদিদান) এবং গোসেবা, ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ। এই ছয়টি লক্ষণ প্রতিপালন করা, বোধ হয় মানবমাত্রেরই অসাধ্য নহে।

এ সকল হইতেও এক উচ্চতর ধর্ম্ম আছে :—

ইজ্যাহারদমা হিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

যাগ-যজ্ঞ, সদাচার; ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান এবং বেদাভ্যাস ; এই সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম। কিন্তু এই সকল কার্য্য অপেক্ষা যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই পরম ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিত্যকর্ম্মের মধ্যাবস্থা।

গুরু। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ-রাজত্বে প্রায় সর্ব্বত্রই বেলা দশ ঘটিকার পর হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অর্থোপায় বা বৈষয়িক কার্য্য করিবার সময়। সুতরাং নয় ঘটিকার মধ্যেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।

শিষ্য। অনেকের তাহাতে সময় কুলায় না। সকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে নানাবিধ কার্য্যাদি দেখিয়া, তৎপর আবার আফিস বা কার্য্যালয়ে গিয়া খাটিতে হয়। তাহাদের উপায় কি ?

গুরু। তুমি বোধ হয়, উকিল, মোক্তার, বিচারক প্রভৃতির কথা বলিতেছ ? কিন্তু ধর্ম্মাচরণও আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম, ইহা জ্ঞানে থাকিলে, সংসারিক কাজ করিয়াও ধর্ম্মাচরণ করা যাইতে পারে। অনেক সাংসারিককে যেরূপ বিধান আমি বলিব, সেরূপভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়াছি। মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বোধ হয়, ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা জানেন্। তিনি কিরূপ অবস্থা হইতে বিষয় কর্ম্মের কিরূপ উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহাও সকলে জানেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে কখনও তাঁহার নিয়মিত সময়ে ধর্ম্মাচরণের বহির্ভূত

কার্য্য হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, মনে করিলে সকলেই এইরূপ করিতে পারেন।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিণ্মূত্র ত্যাগাদি করিবে। তাহার বিধান এইরূপ,—

ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈর্ঋতীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্॥
কর্ণোপবীত্যুদগ্‌বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ॥
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলম্।
ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি॥

মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা এই যে, গ্রামে বাস হইলে তথা হইতে নৈর্ঋত দিকে শতধনু দূরে, আর নগর হইলে চারিশতধনু দূরে গমন করিয়া (দ্বিজাতিগণ) কর্ণে উপবীত দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। (বর্ত্তমানে পায়খানা থাকায় এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না); দিবাভাগে ও সন্ধ্যাকালে (প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা) উত্তরাস্য হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মৌনভাবে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে। তৎকালে কোনদিকে আকাশে অথবা জ্যোতিশ্চক্রের দিকে দৃষ্টি করিবে না। গো-ব্রজে, বল্মীকে, ভস্মে, প্রাণিবিশিষ্ট গর্ত্তে এবং দাঁড়াইয়া বা চলিয়া যাইতে যাইতে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে নাই।

ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাবামপি কদাচন।
নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বাষ্বভিমুখোঽপি বা।

প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনিলং প্রতিসোমং তথৈব চ।
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ ॥

স্ত্রীজাতি, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবালয়, নৌকা, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ইহাদিগের অভিমুখে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। মল-মূত্র ত্যাগকালে নদী ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল দর্শন করিতে ও কথা কহিতে নাই। থুথু ফেলা উর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করা নিষেধ।

অনন্তর শৌচক্রিয়া করিবে। মানবদেহে দ্বাদশপ্রকার মল বিদ্যমান আছে; যথা—বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, পিচুটি ও ঘর্ম্ম। প্রথমোক্ত ছয়প্রকার মল বিশোধন জন্য মৃত্তিকা ও জলের প্রয়োজন এবং শেষোক্ত ছয়টির শুদ্ধ্যর্থ কেবলমাত্র জলের প্রয়োজন। উই-মাটি, ইঁদুর-মাটি, জলমধ্যস্থ মাটি, অপরের শৌচাবশিষ্ট মাটি, জীববিশিষ্ট মাটি, লাঙ্গলদ্বারা কর্ষিত মাটী, শৌচার্থ লইবে না। যাবৎ গন্ধাদি উত্তমরূপে দূরীভূত না হয়, তাবৎ শৌচক্রিয়া করিবে। অনন্তর আচমন করিবে।

দন্তধাবনার্থ খদির, কদম্ব, করঞ্জ, তিন্তিড়ী, বাখারি, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, আকন্দ, আইস-সেওড়া, ডুম্বুর, বাবলা প্রভৃতির কাষ্ঠিকাই প্রশস্ত।

দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া কুসুমোদ্যানে গমনপূর্ব্বক স্বহস্তে দেবপূজার্থ পুষ্পচয়ন করিবে। শক্তি থাকিলে সকলেরই এক একটি পুষ্পোদ্যান (ছোট বা বড) প্রস্তুত করা উচিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্পচয়ন ও পুষ্পগন্ধে হৃদয় আপ্লুত হওয়ায় এবং দেবোদ্দেশে পুষ্পচয়ন করিতেছি, এইরূপ ভাব হৃদয়ে থাকায়, হৃদয় দৈবভাবে ও সত্ত্বগুণে পূর্ণ হয়।

পুষ্পচয়নের পরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিয়া, দুই

তিন ঘণ্টাকাল বিষয়কার্য্য ও অর্থচিন্তাদি করিয়া স্নান করিবে। স্নান করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে।

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

তৈলাভ্যঙ্গ করিলে, শ্রম, বাতদোষ, জরা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। মস্তকে, কর্ণে ও পদদ্বয়ে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিতে হয়।

শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ॥

মস্তকে তৈল দিয়া তাহার অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অন্যান্য অঙ্গ লেপন করিবে না, অর্থাৎ আগে মস্তকে তৈল দিয়া তৎপরে অন্যান্য অঙ্গে তৈল লেপন করিবে না। নিম্নদিক হইতে তৈল ক্রমে উর্দ্ধদিকে দিবে।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাতঃস্নানে, ব্রতে, শ্রাদ্ধে, দ্বাদশীতে, গ্রহণে—ইহাতে স্নানকালে তৈল মাখিবে না। রবিবার, মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তিতে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে নাই। দেহে শ্লেষ্মাদি দোষ জন্মিলে, স্নানের পরে বা অজীর্ণ দোষ হইলে তৈল মাখিবে না।

অতঃপর স্নান করিবে। স্নান না করিয়া মানব কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয় না।

অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ॥

অস্নাত মানব জপহোমাদি কোন কার্য্য করিবে না; নবচ্ছিদ্র-সমাকীর্ণ মানবদেহ হইতে লালা স্বেদ বিগলিত হয় এবং সেইহেতু উহা অতীব

অপবিত্র ও মলিন থাকে; অতএব (প্রাতঃস্নান সম্ভব হইলে) স্নান করিয়া ঐ শরীরের বিশোধন করিবে। শাস্ত্রে সপ্তবিধ স্নানের উল্লেখ আছে। যথা—

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস; স্নান এই সপ্তবিধ। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানকে মান্ত্রস্নান বলে। মৃত্তিকা লেপন দ্বারা ভৌম. হোমের অগ্নি-ভস্ম দ্বারা গাত্রশুদ্ধির নাম আগ্নেয়, গোপদ-রজোবাহি বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতপ বৃষ্টিপাত দ্বারা দিব্য, জলে অবগাহন দ্বারা বারুণ এবং বিষ্ণুচিন্তন দ্বারা মানস-স্নান হয়।

স্নানান্তে ললাটাদিতে তিলক ধারণ করা উচিত। অনেকে ইহাতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু কি মূঢ়তা! তিলকাদিতে ধর্ম্মাচরণ রহিয়াছে, এইটুকুমাত্র লোকে জানে,—কিন্তু হায়! ধর্ম্মাচরণ করা কি এতই লজ্জার কথা? ইহাতে যে ইহ-পরকালের কত উপকার হয়, তাহা বলা যায় না। যে সকল স্থলে তিলক দেওয়া হয়, সেই স্থলসকল স্নায়ুকেন্দ্র,—স্নায়ুকেন্দ্রে নিত্য শীতল পদার্থ সংযোগ করাতে সমস্ত শরীর যেন শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। আরও সমস্ত অঙ্গে দেবতার আবির্ভাব স্মরণ করাতে "আমিত্বের" বড় সঙ্কোচ হইয়া থাকে। তিলকাদি করিলে যেন মনে হয়, পাপ করিতে নাই—আমি যে পবিত্র। কর্ম্মকাণ্ডে দ্বৈতভাব ত আছেই। বসন ভূষণ যতদূর সম্ভব স্বজাতীয় হয়, ততই ভাল। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকাদি না করিলে যে প্রত্যবায় আছে, তাহা শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥

যে মানবের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহাকে দেখিবে না। দৈবাৎ দর্শনে সূর্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিবে।

দশাঙ্গুল প্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অধম। নখদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে না। নিরন্তরাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শ্রীভ্রষ্টতার কারণ। পর্ব্বত, নদীতীর, বিল্ববৃক্ষের তলা, জলাশয়, অথবা যে স্থানে বিষ্ণুর স্নানজল, পদরজঃ বা ক্রীড়াস্থান হয়, তত্রত্য মৃত্তিকাদি দ্বারাই তিলক রচনা করা বিধেয়।

শাস্ত্র বলেন,—অনামা অঙ্গুলীদ্বারা তিলক রচনা করিলে বাসনা পূর্ণ হয়। মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা তিলক করিলে দীর্ঘায়ুঃ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্টি ও তর্জ্জনী দ্বারা তিলক করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। তিলক ধারণকালে ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে।

অনন্তর, ধূপদীপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত, পুষ্প-সৌরভে আমোদিত কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া উপাসনা করিবে।

উপাসনা নিত্যকর্ম্ম বিধানে হওয়াই উচিত। কেননা, অনেকে ভাবেন, নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মের চিন্তা করাই বিধেয়। তাহা ভুল,—মানুষের মনে গঠনানুযায়ী বিষয় চিন্তা করিলেই সহজে ধারণা হইয়া থাকে! যাঁহাদের কুলাচার যেরূপ,—যাঁহারা যে দেবতার উপাসনা ও আরাধনা বংশানুক্রমে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেইরূপ ভাবে উপাসনা করাই উচিত। সংস্কারের অতিরিক্ত কার্য্য করিতে গেলে, তাহা সহজে ধারণার মধ্যে আইসে না।

শিষ্য। কেন, কেহ যদি উচ্চভাবের ধারণায় সমর্থ হয়, তাহাকে ও কি এই নিম্নস্তরের কার্য্য করিতে হইবে? অথবা মোক্ষ প্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনাদি করিতে হইবে কেন?

গুরু। কাহারও যদি উচ্চভাবের ধারণা হয়, তবে তিনি কেন সে ভাবের ধ্যান না করিবেন? তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, তিনি জন্ম জন্মান্তর হইতে এ শক্তি সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। কাহারও পিতা এরূপ ছিলেন বলিয়া তাহার পুত্র ও যে তদনুরূপ হইবে, তাহার কোন বিশেষ কারণ নাই। তাহা হইলে, যোশেফের স্থায় সূত্রধর, জগন্নাথ মিশ্রের স্থায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বুদ্ধের পিতার স্থায় রাজা, কখনও বিশ্ববিজয়ী চিন্তাশক্তিশালী যীশু, চৈতন্ত ও বুদ্ধের জন্মদাতা হইতে পারিতেন না। তবে কথা এই যে, "আমি বুঝিয়াছি—আমার ধারণা হইয়াছে" এইভাব কেবল মনে করিলেই হইবে না। যথার্থ জ্ঞানে পঁহুছান বড় কঠিন কথা, কেবল কতকগুলি বচন মুখস্থ করিয়া অথবা গুরু কিংবা পুরোহিতের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত শুনিবামাত্র বাল্যকালের সংস্কার পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে। কারণ সংস্কারগুলি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত থাকে, সময়ে আবার তাহা প্রবল-তরঙ্গে প্রবাহিত হইতে পারে। এই জন্যই দেখা গিয়াছে—অনেকে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া, কালে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরাতন চিন্তা নূতন চিন্তাকে মস্তিষ্কের নিকটে আসিতে দিতে চাহে না—পুরাতন চিন্তা সূক্ষ্মাবস্থায় মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত থাকে—নূতন সেখানে উপস্থিত হইলেই একটি গোলযোগ বাধাইয়া তোলে,—নূতন ধারণা করিতে দেয় না। অতএব প্রথম কর্ম্মযোগীর সংস্কার পরিত্যাগ না করিয়া কর্ম্মারম্ভ করাই আবশ্যক।

উপাসনার সময় ভগবানের স্তব কবচ পাঠ করা এবং তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করাও বিধেয়।

সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন করিবে। ইহাতে প্রাণায়ামাদি অভ্যস্ত হয়। দেবদেবীর পূজায় সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ হয়। শ্রাদ্ধ তর্পণ

প্রভৃতিতে পিতৃঋণ পরিশোধ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকারে নিত্যকর্ম্ম বিধানোক্ত কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের উদয় হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহার।

গুরু। আহার সম্বন্ধীয় সংযমাদিরও প্রয়োজন। হোম, বৈশ্বদেববলি, অতিথিসেবা, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান; এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করা উচিত। গৃহী পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিবে না। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও নরযজ্ঞ—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ। অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সৎকারকেই নৃযজ্ঞ বলে। *

বৈশ্বদেবপূজা,—যাহা সমষ্টিভাবে বিষ্ণু, ব্যষ্টিভাবে তাহাই বিশ্বদেব। বিশ্বের দেবতা—সমস্ত বিশ্বের প্রাণ বিষ্ণুপূজাই বৈশ্বদেবের পূজা। তদনন্তর বলিকর্ম্ম করিবে।

বলিকর্ম্ম,—বলিকর্ম্ম আর কিছুই নহে, বিশ্বব্যাপী যাবতীয় প্রাণীদিগকে অন্ন প্রদানের ক্রিয়ানুষ্ঠান। এইরূপ করিয়া অন্নদান ও তাহার চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে সমস্ত বিশ্বের মহৎ হইতে অণু পর্য্যন্ত সকলেই

---

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

পূজনীয়, সকলের সেবা করাই মানবের ধর্ম্ম, পরার্থে স্বার্থ বলি দেওয়াই যে মানব জীবনের মহত্তর কর্ত্তব্য, এইরূপ ধারণা সংস্কার হইয়া থাকে। বলিপ্রদানের মন্ত্রটি পাঠ করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে; যথা—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি, সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা, যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকা-কীটপতঙ্গমাদ্যা, বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং, তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈ বান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি যথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্নযতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এব যত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥

বিশ্বদেব ও বলি অন্তে যাহাকে প্রাপ্ত হইবে, সেই অভ্যাগত ব্যক্তিকে ব্রহ্মার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, ভোজ্যাদি দ্বারা তাহার তৃপ্তি সাধন করাই আবশ্যক। * অতিথি প্রিয়, অপ্রিয়, দ্বেষ্য, মূর্খ, বিদ্বান প্রভৃতি যাহা হউক বৈশ্বদেবক্রিয়ান্তে যিনিই সমাগত হউন, তাঁহা হইতেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। † অতিথি সমাগত হইলে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ভোজনাদি সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নামধামাদি কিছুই জিজ্ঞাসা

---

* হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।

† প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥

করিবে না; ঐ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্নাদি দান করিতে নাই। * গৃহীই সকল জীবের আশ্রয়স্থান,—সকলকে দয়া ও আহারীয দান না করিয়া কদাচ ভোজন করিবে না। † এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই সকল কর্ম্ম পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতবাসী এখনও এত পরার্থজীবী, দয়ার্দ্র এবং হিংসা-বিবর্জ্জিত।

নিত্যশ্রাদ্ধ,—আমাদিগের হৃদয়ে আমাদিগের অতীত পুরুষদিগের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য,—তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রচলিত আছে। আমাদিগের নিত্য প্রদত্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মতন্মাত্র, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আরও তাঁহাদিগের কথা নিত্য স্মরণ করিলে আমাদিগের মনে হয়, তাঁহারা আসিয়াছিলেন,—এই ধনৈশ্বর্য্য, এই বাড়ী ঘর দুয়ার তাঁহারাও বলিয়াছিলেন,—এই গ্রাম, ঐ প্রকৃতির বৃক্ষাবলি সকলই তাঁহারা দেখিতেন,—স্নেহের শতবাহু সৃষ্টি করিয়া আসক্তির বাহুতে উহাদিগকে জড়াইয়া ধরিতেন। এই পথ—এখনও খুঁজিতে পারিলে, এই পথে হয় ত তাঁহাদের পদরেণু পড়িয়া আছে; কেন না—আমাদেরই মত এই পথে তাঁহারা নিত্য যাতায়াত করিতেন—কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়? যে অজানা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন—অথবা আবার আসিয়া আমাদিগেরই চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হয় ত তাঁহাদেরই সঞ্চিত অর্থরাশি হইতে কয়েকটি মুদ্রা ঋণ লইবার জন্য হারাধন মণ্ডলরূপে

---

* দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোঽন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি॥

† ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো মতঃ।
শ্ব-চণ্ডালবিহঙ্গানামন্নং দদ্যাত্ততো নরঃ॥

আমাদেরই উপাসনায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন। এই সকল মনে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় বলিয়াই তাঁহাদের স্মরণ ও পূজা।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থক, কর্ম্মাদি, দৈবিক, যাত্রার্থ এবং পুষ্ট্যর্থ—শ্রাদ্ধ এই দ্বাদশ প্রকার। নিত্য-শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান ভোজ্যোৎসর্গ, বিশ্বদেবাবাহন ও বলিক্রিয়া কিছুরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ষট্ পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ষট্‌পুরুষকে স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন অথবা জল দিলেও কার্য্য সমাহিত হয়। *

গোগ্রাসদান, গোগ্রাসদানে পশু পর্য্যন্ত যে আমাদের পূজনীয়, তাহাই অভ্যাস করা। বিশেষতঃ গরু সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সমাজের উপকারী। যাহা সমাজের উপকারী,—যাহা সাধারণের কল্যাণকর, তাহা আমাদের পূজনীয়—এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, ক্রমাভ্যাসে নিষ্কামতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করিবে। যদি প্রতিবন্ধক বশতঃ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে না পারা যায়, তবে মনে মনে সমস্ত কার্য্যগুলির বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। স্মরণ করিলেও কার্য্য করা হয়। চিন্তাদ্বারা চিত্তের ভাব পরিস্ফুট হয়।

প্রতিবাসিনী দরিদ্রা, গর্ভিণী—প্রতিবাসী বৃদ্ধ বা বালক অভুক্ত থাকিলে, আগে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।

ইন্দ্রিয়-প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জ্জয়েৎ।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক, এরূপ বৃথা পাক পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, এরূপ আহারাদি করিবে।

---

* অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেববিহীনং তদশক্তাবুদকেন তু॥

পঞ্চাদ্রে† ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষা পঞ্চাদ্র্র্তা মতা॥

শাস্ত্রবিধিমতে দেহের পাঁচ অংশকে জলদ্বারা আদ্র্র করিয়া পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। দুই হাত, দুই পা মুখ ও এই পাঁচ অংশকে আদ্র্র করিবে।

শিষ্য। পানি ও পদতল জলদ্বারা সিক্ত করিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় ঐ স্থলসমূহে জল দিলে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতে পারে কিন্তু মৌনী হইয়া ভোজন করিবার উদ্দেশ্য কি? পাশ্চাত্য আহার-বিজ্ঞানে বরং ইহার বিপরীত মতেরই ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহারা (ইংরেজেরা) আহার করিবার সময় প্রীতিজনক গল্প করিতে করিতে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—"আহার করিবার সময়, কথোপকথন করিতে করিতে আহার করিলে তাহা সুন্দররূপে পরিপাক করা যায়।"

গুরু। ইংরেজেরা যাহা করিবেন তাহাই ভাল বলিয়া মনে করা ভাল নহে। কথোপকথন করিলে মুখের লালা নিঃস্রাব কম হওয়ায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় তাহা বোধ হয় অবগত আছ। ইহাতে আহারের ও পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আর জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়, ইংরেজেরা আহারের সময় ঘন ঘন জল ও মদ্য পান করিয়া থাকেন। কিন্তু আহারের সময় ঘন ঘন জলপান করিলে পরিপাকেব ব্যাঘাত হয়, ইহা তোমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও বলিয়া থাকে। আরও এক বিশেষ কথা, আছে,—হিন্দুগণ নিরামিষভোজী-নিরামিষভোজীর প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহারা নিঃশব্দে আহার করে; নিরামিষভোজী পশুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহা জানিতে পারিবে। আর ইংরেজেরা মাংস প্রভৃতিই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন,—মাংসাশী জন্তুগণ আহারের সময় "গর গর গর গর" প্রভৃতি শব্দ করিতে

করিতে আহার করে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—আহার কালে মৌনী হওয়া হিন্দুদের স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী-অনুকরণে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

আহারের দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে, চিত্তকে সুসংযত করিয়া, আনন্দহৃদয়ে আহার করিবে। আহার করিতে বসিয়া চিত্তচাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

যাহা ভোজন করিবে, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া ভোজন করিবে। মনে করিবে, ভগবানের তৃপ্ত্যর্থ এই আহারীয় মুখে দিতেছি।

অনুষ্ণ কুপথ্য ক্লেশাদিযুক্ত ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু মধু, জল, দধি, ঘৃত, পায়স শাক ছাতু ইহাদিগকে অবশেষ রাখা ব্যবহার নাই। অবশিষ্ট কাহাকেও দেওয়া প্রথা নাই। অন্যের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না—ইহাতে অন্যের দোষাদির সংক্রমণ হইবার সম্ভব। পংক্তিতে ভোজন করিতে বাধ্য হইলে, জল, ভস্ম বা গুস্তাদিদ্বারা রেখা করিয়া ভোজন করিবে। দিবসে ও রাত্রিতে দুইবার আহার করিতে নাই। প্রয়োজন হইলে, ফল খাওয়া যাইতে পারে। লৌহ ও সীস-নির্ম্মিত পাত্রে ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে, তাম্রপাত্রে, মলিন পাত্রে, পদ্ম ও পলাশপত্রে এবং পাত্রের পৃষ্ঠদেশে আহার করিতে নাই। ব্রহ্মচারী ও যতির পক্ষে কাঁসার পাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। বালবৎসা ও মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ, ননীতোলা দুগ্ধ-এবং ঘৃতহীন অন্ন ভোজন করিবে না।

নিম্নপ্রকার অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। ইহাতে নিকৃষ্ট তমোগুণের আবির্ভাব হয়। যথা,—অনাবৃত অন্ন, আহারাবশিষ্ট অন্ন, নগরাধ্যক্ষের অন্ন; অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন, শ্রাদ্ধ ও পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন, প্রতারকের অন্ন, রজস্বলা স্পৃষ্টান্ন, ক্রয় করা অন্ন, সূতিকান্ন,

ঘুষ্টান্ন, অর্থাৎ" কে অভুক্ত আছ, আহার করিতে আইস—"ইত্যাকার ঘোষণা করিয়া যে অন্ন দেওয়া হয়, অশৌচান্ন, অবজ্ঞা বা কুবাক্য বলিয়া প্রদত্ত অন্ন এবং কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির অন্ন, কদাপি ভক্ষণ করিবে না।

ফল কথা, আহারীয়ের গুণানুসারে মানুষের গুণের তারতম্য হয়। অতএব আহার্য্য বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অধিকার-ভেদে খাদ্যভেদ।

শিষ্য। কোন্ অধিকারে কিরূপ খাদ্য উপযোগী এবং প্রশস্ত খাদ্যই বা কি, তাহা শুনিতে বাসনা হইতেছে।

গুরু। যাহা দেহ এবং মনের উন্নতিকর ও হিতজনক, তাহাই প্রশস্ত খাদ্য। যাহা ভক্ষণ করিলে দেহে কোন প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের প্রসন্নতা সংসাধিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় সেইরূপ খাদ্যই প্রশস্ত।

> ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদম্।
> ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
> শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগসন্ততিঃ।
> সন্মতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ
> ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্নন্ প্রযত্নতঃ।
> আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্গরলং যথা॥

যাহা দেহের শক্তিদায়ক চিত্তের প্রসন্নতা-প্রদায়ক ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্দীপক

তাহাকেই পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যাহাদ্বারা শরীর বলশালী হয়, রোগসমুদয় দূরীভূত হয়, সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌বুদ্ধি উপচিত হয়, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই সুপথ্য।

যাহাদ্বারা ইহজীবনে সুখ এবং পরজীবনে শান্তিলাভ হয়, তাহাই ভোজন করা উচিত। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি এতদতিরিক্ত যাবতীয় আহার্য্য বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন।

তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ,—আহারের উদ্দেশ্য কি? প্রাগুক্ত শাস্ত্রবাক্য কয়টিতে সে কথা সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে,—তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, যাহা সেবন করিলে দেহে শক্তি হয়—কিন্তু চিত্তে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া চিত্তের অপ্রসন্নতা বা ধর্ম্মবুদ্ধির হ্রাস না করে, এমন দ্রব্যই আহার্য্য। যাহা ভোজন করিলে শরীর বলশালী হয়, কিন্তু রোগ না হয়—অর্থাৎ বলকর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে; কিন্তু তাহা পাকাশয়ের শক্তি অনুসারে যাহাতে জীর্ণ হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌বুদ্ধির বিকাশ করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যাহা ভোজন করিলে, ইহ জীবন ও পরজীবনে সুখলাভ হয়, তাহাই ভোজন করিবে।

কেবলমাত্র ইহকালের সুখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রীতিকর খাদ্য সেবনই আহারের চরমোদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ইহ-পরকালের সুখ হয়—ইহকালে অরোগিতা এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাই ভোজন করিবে—তাহা হইলেই পরজীবনে সুখী হইতে পারা যাইবে।

শিষ্য। মৎস্য, মাংস ভোজনে দোষ আছে কি?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহ পরকালে যাহাতে সুখ হয়, তাহাই খাদ্য। মৎস্য মাংসে অত্যন্ত রজোগুণের বৃদ্ধি হয়—সত্ত্বগুণকে বিনষ্ট করে সুতরাং তাহা সাত্ত্বিকগণের ভোজন করা উচিত নহে।

শিষ্য। শাস্ত্রাদিতে মৎস্য মাংস ভোজনের বিধি আছে।

গুরু। কিসে দেখিয়াছ?

শিষ্য। মনু-সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান আছে।

গুরু। মাংসাদি আহার একান্ত দূষণীয় নহে। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশভেদে, বয়োভেদে, ব্যবসায় বা কার্য্যভেদে আহারের তারতম্য হইয়া থাকে।

দেশভেদে,—একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীরের, মনের ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, অপর দেশে তাহা হয় না। অন্য দেশে হয় ত তাহা ভোজন করিলে, তদ্বিপরীত ফল হইয়া থাকে,—সেখানে হয়ত ঐ সকল দ্রব্য ভোজনে বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ এবং মনের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে। অতএব স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, তৎপরে খাদ্যাদির বিষয় স্থির করা উচিত। মনে কর, শীতপ্রধান দেশে যে খাদ্য ভোজন করিলে, দেহের পুষ্টি, ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি ও মানসিক বলসঞ্চয় হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—তাহা ভোজন করিলে, শরীরের ক্ষয়, বুদ্ধির জড়তা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। জল বায়ু-ভেদে আহারেও পার্থক্য হইয়া থাকে। বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—সেই জন্যই শীতপ্রধান দেশের খাদ্য মাংস পলান্ন সুরা প্রভৃতি। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে উহা একান্ত অহিতকর,—আর অহিতকর বলিয়াই ঐ সকল আহার্য্য-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া সেই দেশের আচার্য্যগণ শারীর বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্ব্বথা আবশ্যক।

বয়োভেদে,—বালক, যুবক, বৃদ্ধ বা পুরুষ ও স্ত্রী ইহাদিগের একরূপ আহার্য্য নহে। যাহাতে বালকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে, যুবক তাহা খাইয়া কখনই জীবনধারণ করিতে পারে না। যুবকের খাদ্য খাইয়া বৃদ্ধ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। আবার একজন শারীরিক পরিশ্রমশালী

পুরুষ যাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে, যাহা খাইয়া সুন্দররূপে জীর্ণ করিবে, গৃহমধ্যস্থা রমণী তাহা খাইয়া কখনই নীরোগ থাকিতে পারিবে না। অতএব বয়স-ভেদেও খাদ্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

কার্য্যভেদে,—তুমি পূর্ব্বে যে মাংসাদি আহারের কথা বলিয়াছ, তাহাও এই কার্য্যভেদে ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্বাদিশাস্ত্রে যে মাংসাদি ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা রজোগুণ-প্রবর্দ্ধক বীরগণের জন্য। যাঁহাদিগকে যুদ্ধাদি করিয়া দেশ রক্ষা করিতে হইবে, সহস্র সহস্র নরমুণ্ড পদদলিত করিয়া শোণিতোৎসব করিতে হইবে, তাঁহাদিগের পক্ষে পশুহনন ও মাংস-ভক্ষণ দূষণীয় না হইতে পারে। বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিক গুণবর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদিগের আহার্য্য। মাংসাদি রজোগুণ-বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির বর্দ্ধন হয় না। অতএব ঐ সকল ব্যক্তির রজোগুণের সম্প্রসারণ জন্য রজোগুণবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজনই আবশ্যক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ গুণানুশীলন-নিরত ব্যক্তির কখনই মাংসাদি আহার হিতকর নহে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের বর্দ্ধনই প্রয়োজন; অতএব তাঁহাদিগের পক্ষে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তাহাই ভোজন করা আবশ্যক। এই জন্যই ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দ মৃগয়া করিতেন,—আর ব্রহ্মচর্য্য-নিরত জ্ঞানানুশীলনকারী ব্রাহ্মণগণ কদাপি মাংসাদি ভক্ষণ করিতেন না।

যে দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহার ধর্ম্ম ভোক্তায় সংক্রমিত হইয়া থাকে। নিরামিষভোজী পশুগণ শান্তপ্রকৃতি; আর আমিষভোজী পশুগণ (সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি) অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। ইহাতেই আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের বৈধ অবৈধ ভাব বুঝিতে পারা যায়।

আরও এক কথা এই যে, আমার শরীর-পোষণের জন্য আমার অনিত্য দেহধারণের জন্য, অপর একটি জীবের জীবন ধ্বংস করা কখনই

উচিত নহে। আমিষ আহার না করিয়াও যখন দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভ করা যাইতে পারে, তখন ঐরূপ হিংসাপ্রবৃত্তির দাস হইবার কোন প্রয়োজন নাই। অজীর্ণরোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে—উষ্ণ-প্রধানদেশবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে মাংসাদি আহার, স্বাস্থ্য-হানিকর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মাংসাদি আহার করিলে, কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; অতএব ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা একবারেই পরিত্যাজ্য।

আহারের গুণে বা দোষে মানুষ দেবতা বা পশু হইয়া থাকে। আহারগুণেই কসাই বংশ সম্ভূত অসুরের অন্তঃকরণও দেবভাবে এবং আহারের দোষেই ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত দেবতার অন্তঃকরণ কসাইভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, আহারের উপরে শরীর ও মনের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে প্রত্যক্ষ-ভাবে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত আছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"আহার শুদ্ধি হইলেই সত্ত্ব-শুদ্ধি জন্মে, সত্ত্ব-শুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্মৃতি-লাভ হয় এবং স্মৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে।" অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আহার শুদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অর্থোপার্জ্জন।

শিষ্য। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী, বৃদ্ধ পিতামাতা ও পোষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতেছি ; সুতরাং আমাদিগের অর্থোপার্জ্জন না করিয়া চলিতে পারে না। কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিলে, তাহা বন্ধের বা পাতকের কারণ হয় না, তাহা বলুন।

গুরু। বৈধভাবে বা অনাসক্তরূপে অর্থ উপার্জ্জন করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন নিজের জন্য নহে,—নিজের জন্য অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন কি? নদীর জল, বৃক্ষের ফল, ইহাই নিজের উদরের জন্য যথেষ্ট। বৃক্ষ-বল্কলেও শীতাতপ-নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য—ভগবানের সংসার-পালনের জন্য আমি তাঁহার দাসানুদাস, অতএব আমার কর্ম্ম করা আবশ্যক। পোষ্যবর্গের অপ্রতিপালনে মহাপাতক হয়।

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

মাতা, পিতা, গুরু (পুরোহিত, গুরু, আচার্য্য শিক্ষক প্রভৃতি), ভার্য্যা, প্রজা (পুত্রকন্যাদি), দরিদ্র, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি, অগ্নি (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ), ইহাদিগকে পোষ্যবর্গ বলে।

শিষ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তৃগণ-শ্রেষ্ঠ মনু বলিয়াছেন,—

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

"বৃদ্ধ মাতাপিতা,সাধ্বীভার্য্যা, শিশুসন্তান—শত অকার্য্য করিয়াও ইহা-দিগকে প্রতিপালন করিবে।" ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাগুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিপালন জন্য প্রতারণা প্রভৃতি নারকীয় কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলেও তাহাতে পাতক হয় না,—কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবে ?

গুরু। শাস্ত্রার্থ-উদ্দেশ্য বিচার সাপেক্ষ। "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" পরের দ্রব্য ঢিলের মত—এই বচন দ্বারা যদি এইরূপ জ্ঞান কর যে, পরের দ্রব্য ঢিলের মত মূল্যাদি-রহিত, অতএব তাহা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গৃহগত করাতে কোন দোষ নাই। তাহা হইলে কি বচনের মুখ্যার্থ বোধ হইল ? পরের দ্রব্য ঢিলের ন্যায় হেয়, তাহার উপর আসক্তি-পরিশূন্য হওয়াই শাস্ত্রবচনের উদ্দেশ্য,—ইহা বিচার করা আবশ্যক। মনু যে বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রভৃতির ভরণপোষণ জন্য অকার্য্য করিতেও বিধি দিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ অন্য প্রকার। এ অকার্য্য অর্থে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অকার্য্য নহে ; ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের যে যে বৃত্তির বিধান আছে, যদি তদবলম্বনে কেহ মাতাপিতা প্রভৃতির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয়েন, তবে অকার্য্য অর্থাৎ জঘন্য জাতির বৃত্তিও অবলম্বন করিয়া, উহাদিগের ভরণ-পোষণ করিবেন। যেমন,—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥
ষণ্ণাং তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥

মনুসংহিতা।

"অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ,—ব্রাহ্মণের এই ছয়টি বৃত্তি। তাহাদিগের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও সৎপরিগ্রহ—এই তিন ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।"

এখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানকালে সকল ব্রাহ্মণই যদি ঐ বৃত্তি অবলম্বন করেন,তবে কখনই তাঁহারা গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে পারেন না। এক্ষণে অকার্য্য অর্থাৎ কৃষি, বানিজ্য বা চাকুরী করিয়া সদ্‌ভাবে পোষ্যবর্গের প্রতি পালনও করিবেন।

ফল কথা, যাহা উপার্জ্জন করিবেন, কদাপি তাহাতে যেন আসক্তি না হয়। আমার বলিয়া যেন কখনও সঞ্চয় করা না হয়। যদি সঞ্চয় করিতে হয়, তাহার উপর যেন মমতা না জন্মে,—মনে থাকে যেন, সে লোষ্ট্র, সে গুলি আপৎকালে পোষ্যবর্গের ভরণপোষনের জন্য নিয়োজিত হইবে।

বাগান কর,—বৃক্ষরোপণ কর, ফলভোগের আশা করিও না; ভগবানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছ; তাঁহার পরিবারবর্গ ভোজন করিবে। করিতে হয়, তাই করিতেছ। যদি তাহাতে আসক্তি থাকে,—যদি সঞ্চিত ধনে আসক্তি থাকে—তবে এই পৃথিবীর রাজ্যে রাজ্যে প্রেতযোনি ধারণ করিয়া, কত দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

আরও এক কথা, পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে বলিয়া কর্ম্মী হও—যতদূর সম্ভব, যত্ন ও চেষ্টা কর; কিন্তু তাই বলিয়া কদাপি যেন পাপে মগ্ন হইও না। অসৎপথে অর্থোপার্জ্জন করিলে, তাহার ফল তুমিই ভোগ করিবে। আর কেহই তাহার ফলভোগী হইবে না। কতজন কত প্রকারে কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে,—কিন্তু তাহা লইয়া কি বসিয়া থাকিতে পারিয়াছে? ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইয়াছে—অসৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বাসনা বহ্নিতে দগ্ধ হইতেই হইয়াছে। ক'দিনের জন্য—কেন দানবী-নিশ্বাসে দগ্ধ হইতে বসিয়াছ? কদিনের জন্য,—কেন জন্মান্তরের কষ্টের আগুণ সৃষ্টি করিয়া লইবে? তোমার পাপের ফলভাগী আর কেহই নহে! বিশেষতঃ ইহা নিতান্তই চিন্তেস্য

অবিশুদ্ধিকর কার্য্য; অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া কেহ শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

শিষ্য। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা প্রভৃতি ইঁহারা সমাজের উপযোগী আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি না পাইয়া দরিদ্রের ন্যায় কষ্ট পাইবে, আর আমি বসিয়া দেখিব ইহাতে মানসিক কষ্ট হয়।

গুরু। কর্ম্মযোগী বলেন,—এই অহঙ্কার, এই "আমিত্ব" ভুলিতে হইবে। কে কাহার? আমিত্বের আবরণ দূরীভূত করিয়া না দিলে, নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধনা হইবেনা। অভ্যাসের দ্বারা মনে করিতে হইবে,—একজন অতি অন্ত্যজ, সহস্র সহস্র টাকার উপরে বসিয়া আছে,—সে টাকাও যাঁহার আর বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের অন্নকষ্টও তাঁহার—যেখানে যাহা, সকলই সেই ভগবানের; সমস্তই তাঁহার বিভূতি। আমরা কেবল অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দণ্ডের প্রহরী।

শিষ্য। না হউক,—পোষ্যবর্গের একমুষ্টি উদরান্নের কষ্ট—তাহাও ত চক্ষুর উপরে দেখা যায় না।

গুরু। উপার্জ্জন করিব না, বসিয়া থাকিব; কর্ম্ম করিব না কর্ম্মে সংসিদ্ধি লাভ করিব, ইহা ত জড়ের কথা। তবে অসৎপথে যাইও না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিবে, যেমন ভাবে চলে চলুক,—বৃক্ষের গলিতপত্র, আর নদীর জল কেহ লইবে না,—অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জন্মে জন্মে বাসনার বহ্নিতে দগ্ধ হইব না। আর বিশেষরূপে মনে করিয়া রাখিও, তোমার পোষ্যবর্গের মধ্যে যে যেরূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, সে সেইরূপই ফল পাইবে,—তুমি শত চেষ্টাতেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। কেবল অহঙ্কারের আগুণ বুকে লইয়া ছুটাছুটি করিয়া জন্মজন্মের পাপ সংগ্রহ করিবে কেন? তোমার পুত্র কন্যার মুখ যদি মলিন দেখিতে না পারিবে, তবে ত্যাগী হইবে কি প্রকারে? তাহাদের

ভাগ্যপ্রাপ্তি জন্যই বা তোমার আনন্দ হইবে কেন? অর্থ পাইয়া অলঙ্কার পাইয়া, যখন তোমার পোষ্যবর্গ আনন্দিত হইবে, তখন তুমি কি বুঝিবে? বুঝিবে না কি, যে মাখাল ফল দিয়া বালক তুষ্ট করা হইয়াছে। উহাতে কি আছে? কিছুই নাই। যাহা সঙ্গের সাথী হইবে, তাহা পাইয়া যদি কেহ আনন্দিত হয়, তবে সুখের কথা বটে।

ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিতে শিখিতে হইবে,—তিনি কাহাকেও অভুক্ত রাখেন না। কিন্তু অনাসক্তভাবে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হইবে। জগতে কাজ করিতে আসা হইয়াছে—কর্ম্মই আমাদিগকে আসক্তি ও ইন্দ্রিয়-বহ্নি হইতে দূরে রাখে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরাহ্ণ-কৃত্য।

গুরু। মধ্যাহ্নে আহারের পর হইতে রাত্রিতে শয়নকাল পর্য্যন্ত পরাহ্ণ-কৃত্যের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। মধ্যাহ্নে আহারের পরে নিদ্রা যাইতে নাই।

দিবা স্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়ঞ্চৈব পরিত্যজেৎ।
আয়ুঃক্ষয়ং দিবা-নিদ্রা দিবা-স্ত্রী পুন্যনাশিনী॥

দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে নাই, দিবানিদ্রায় আয়ুঃক্ষয় হয়। দিবাভাগে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই, তাহাতে পূর্ব্বকৃত সমস্ত পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে।

ইতিহাসপুরাণানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথা-বিবাদবাক্যানি পরিবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

আহারান্তে সময় পাইলে, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং সাহিত্যাদি পাঠ করিবে। বৃথা বিবাদ অথবা পরনিন্দা লইয়া কদাপি কালক্ষেপ করিবে না। এরূপ করিলে আত্মার অধোগতি হয়।

তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি বৃথা খেলায় কদাপি কালক্ষেপ করা উচিত নহে। সঙের আবার সঙ কি? একে ত মিছা ভবের খেলা লইয়া ভুলিয়া রহিয়াছি—আবার খেলা! যতক্ষণ এই করিবে, ততক্ষণ ভক্তিশ্রদ্ধাদির আলোচনায় আত্মোন্নতি লাভ হইতে পারে। খেলায় লোকের এমন আসক্তি দেখা গিয়াছে যে, পুত্র কলত্রাদিতেও তত আসক্তি নাই। এইরূপ বাজে ক্রীড়া সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। অনেকের মুখে শুনিতে পাই, কর্ম্মময় জীবনে ক্রীড়া একটু বিশ্রাম। বস্তুতঃ ইহা মনের ভুল! ভক্তিশাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রাণে যে শান্তি হয়, তাহার শতাংশের একাংশও ইহাতে হয় না। তবে অভ্যাস চাই,—মানবের মনের বৃত্তি সমুদয়ই অনুশীলন সাপেক্ষ। অভ্যাস কর; দেখিবে, যাহা নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে, অভ্যাসে তাহাই সরস হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতেও তাস-পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ার বহুতর দোষকীর্ত্তন ও তাহা হইতে মনুষ্যদিগকে বিরত হইতে বলা হইয়াছে।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

"পুরাকালে অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে যে, দ্যূত-ক্রীড়াদ্বারা (পাশাদি খেলার দ্বারা) বহুবিধ শত্রুতার উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব হাস্যার্থ অর্থাৎ আমোদ প্রমোদচ্ছলেও কদাপি ইহা করিবে না।"

খেলাদ্বারা কেবল তমোগুণের বর্দ্ধন হয়; অতএব যাহা সত্ত্বগুণের বিরোধী—এমন কার্য্য কখনও করা উচিত নহে। আরও দেখ, মানুষের যে বুদ্ধি, যে চিন্তা, যে অধ্যবসায়, যে সময় ঐ একান্ত অহিতকর মিথ্যা

কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা যদি কোনও ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায়, অথবা কোন দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে দেশের, সমাজের ও নিজের কত উন্নতি হইত। অতএব খেলা সর্ব্বপ্রকারেই দূষণীয়।

অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ।

বন্ধুগণের সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনার্থ কিঞ্চিৎ ভ্রমণ ও সদালাপে দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত করিবে।

তদনন্তর সূর্য্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। ইহাতে সত্ত্বগুণ ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, কৃত পাতকরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে।*

দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

ভ্রম-প্রমাদবশতঃ দিবাভাগে কর্ত্তব্যের মধ্যে যাহা করা হয় নাই, সেই সকল কার্য্য রাত্রির প্রথম যামে সম্পন্ন করিবে। তৎপরে রাত্রি নয়টার সময় অতিথি-সৎকারাদি মধ্যাহ্নভোজনের ন্যায় সম্পন্ন করিয়া ভোজনাদি করিবে। রাত্রিভোজন কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে করা উচিত। অনেকের ধারণা, রাত্রিতে কোন কাজকর্ম্ম করিতে হয় না, অতএব রাত্রিতে গুরুভোজনে দোষ নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সূর্য্যকিরণের সহিত পাকস্থলীর অতি নিকট সম্বন্ধ আছে,—দিবাভাগে যত সহজে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়, রাত্রিতে তত সহজে হয় না। বিশেষতঃ রাত্রিকালে বিশ্রামের সময়। এখন বুঝিতে হইবে, বিশ্রামের সময়

* সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥

কাহার? জীবদেহস্থ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নায়ুপেশী প্রভৃতি সকলেরই বিশ্রামের সময়। যদি তোমার উদরস্থ ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করাইবার জন্ম তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি পরিশ্রমেই কাটাইতে হয়, তাহারা বিশ্রাম করিবে কখন? তাহাদের বিশ্রামের অভাবে প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিবে, তোমার শরীর যেন কত খাটিয়াছে—তোমার ক্লান্তি যেন পূর্ণমাত্রার আসিয়াছে। জড়তা, অস্থিরতা, আলস্য প্রভৃতি তোমার দেহে পূর্ণমাত্রায় চাপিয়া রহিয়াছে। রাত্রিভোজন অল্পরূপেই করিতে হয়।

তৎপরে শয়ন করিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে।

শুচৌ দেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্প্লবনে চৈব সংবিশেত্তু সদা বুধঃ॥
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকং গারুড়ৈর্ম্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥

প্রাচীরাদিতে শয্যা অসংলগ্নভাবে পাতিয়া, গোময়লিপ্ত শুচি, পবিত্র, নির্ম্মল, নির্জ্জন স্থানে, শিয়রদেশে অর্থাৎ মস্তকের কিঞ্চিৎ দূরে জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া বৈদিকমন্ত্র ও গরুড়মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শয়ন করিতে হয়।

ন বিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাম্॥
ন শুক্রে নাপবিত্রে চ ন তৃণে ন চ ভূতলে।
তুলিকায়াং তথা বস্ত্রে শয্যাভাবে স্বপেদ্‌গৃহী॥
স্বপেন্ন পট্টবস্ত্রে চ কলঙ্কি-কম্বলেষু চ॥

অবিশাল, ভগ্ন, অসম, ছারপোকাদি জন্তুপূর্ণ, আস্তরণবিহীন এবং অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না। তৃণে, মাটিতে, পট্টবস্ত্রে অথবা

মলিন কম্বলে শয়ন করিবে না। খট্টাদি বা শয্যাদির অভাব হইলে, কার্পাসবস্ত্র মাটিতে পাতিয়া শয়ন করা বিধেয়।

ত্রিদোষশমনী খট্টা তুলী বাতকফাপহা।
ভূ-শয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী॥
সুশয্যাশয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতিপ্রদম্।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥

খাট বা রক্তপোষে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিলে, কফ, পিত্ত বায়ু এই ত্রিদোষের নাশ হয়। তুলানির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিলে, বাত ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মাটিতে শয়ন করিলে বাত বৃদ্ধি হয়, উহা রুক্ষ এবং পিত্ত ও নেত্রজলনাশক। উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিলে, তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা ও ধৈর্য্য-সঞ্চয় হয়, শ্রম এবং বায়ুবিনষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। কুশয্যা উহার বিপরীত।

ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচি স্বয়ম্।
আদ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ॥

ধান্য, গো, বিপ্র, দেবতা ও গুরু (গুরু, পুরোহিত, পিতা, মাতা মাতুল, শ্বশুর, পিতৃব্য, শিক্ষক প্রভৃতি), ইহাদিগের উপরিতলে শয়ন করিবে না। ভগ্ন বা অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না; অশুচি অবস্থায় উলঙ্গ হইয়া, আদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, উত্তরশিরা বা পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করিবে না।

শিষ্য। সংসারে থাকিতে হইলে নানা কারণে লোকের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ হইয়া থাকে, সে স্থলে কি করা বিধেয়?

গুরু। তুমি যদি কাহারও অনিষ্ট না কর, তুমি যদি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য না কর, তবে কেহই তোমার শত্রু হইবে না। রিপুর

বশীভূত হইয়া যদি কার্য্য না কর, তবে কথনই রিপু দ্বারা দুষ্ট হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই যে ছয়টি রিপু—শরীরস্থরিপু, ইহাদিগেরও একটা প্রবল শক্তি বা কম্পন আছে। ইহা বোধ হয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ যে, কোন ব্যক্তি বা জীবের ক্রোধ হইলে সে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। তাহার ক্রোধরিপুর কম্পন শরীরস্থ তাড়িতের সাহায্যে বাহির হইয়া লক্ষ্য ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইতে যায় বলিয়া, ঐ স্নায়বীয় কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সমস্ত রিপু সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে।

এখন দেখিতে হইবে, ঐ কম্পনগুলি কোথায় যায় এবং তাহারা কি পদার্থ। যাহার উপরে দ্বেষ বা হিংসা হয়, শরীরস্থ ঐ রিপুর কম্পন শরীর হইতে বাহির হইয়া, তাহার উপরে পতিত হয় ও তাহাকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া যায়। একজনের অনিষ্ট করিয়া আসিলে, তাহার কয়েকদিন পরেও দেহমধ্যে একরূপ জালা অনুভূত হয়। বলা বাহুল্য তথনই সেই ব্যক্তি তাহার অনিষ্ট জানিতে পারিয়া ক্রোধ করিয়াছে, সেই ক্রোধের কম্পন আসিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

রিপু-কম্পনের স্বভাবই এই যে, তাহা বাহির হইলেই এক স্থানে অবস্থান বা কার্য্য করিবে। মনে কর, রাম শ্যামের উপর হিংসা করিয়াছে। রামের হিংসা কম্পন শরীর হইতে বাহির হইয়া শ্যামের উপরে ধাবিত হইল, শ্যাম যদি রামের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহার হিংসা করিয়া থাকে, তবে হিংসা-কম্পন শ্যামের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু শ্যাম যদি রামের কিছু না করিয়া থাকে, তবে রামের রিপু-কম্পন শ্যামের শরীরে আদৌ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। পারে না এইজন্য যে, তাহার কোনও রিপু উত্তেজিত হইয়া, তাহা হইতে কম্পনপদার্থ বাহির হইয়া আধারশূন্য হয় নাই—স্থান না পাইয়া ঐ কম্পন ফিরিয়া আসিয়া আবার

রামের শরীরে প্রবেশ করে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে ঐ রিপুকম্পন কত নিকৃষ্ট পদার্থ—যাহার উদয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তাহা যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জ্বালাময় পদার্থ; তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া হিংস্রককেই দগ্ধ করিতে থাকে। রিপু কম্পন অবশ্য রিপু নহে, তাহা রাগাদি হইতেই উদ্ভূত হয়। তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ যে, ক্রোধী বা হিংস্রক ব্যক্তি রোগা ও খিট্‌খিটে হয়। যাহারা আজন্ম বিনা কারণে লোকের উপর হিংসা করিয়া আসিয়াছে, তাহারা শেষে পুনরাগত ও ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হিংসা-কম্পনে দগ্ধ হইয়া স্বয়ং বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় হয়।

তুমি যদি সর্ব্বপ্রকারে রিপুজয়ী হও—কেহ তোমার কিছু করিতে পারিবে না। জান না কি, রিপুজয়ী মুনির আশ্রমে বাঘে হরিণে খেলা করিয়া থাকে। হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তিকে হিংস্রক জন্তুতেও আক্রমণ করে না। হিংস্রক-জন্তুসমাকীর্ণ বনে মুনিঋষিগণ যে বিনা শস্ত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাহার ইহাই একমাত্র কারণ। যথার্থরূপে হৃদয় হইতে রিপুর উত্তেজনা দূরীভূত করিতে পারিলে, জগজ্জয়ী হইতে পারিবে।

প্রথম প্রথম কেহ তোমার অত্যাচার বা অনিষ্ট করিলে, তুমি তাহা গ্রাহ্য করিও না,—আপন রিপুর উত্তেজনা হইতেও দিও না। জানিও অত্যাচারী আপন রিপুর উত্তেজিত কম্পনে আপনিই দগ্ধ হইবে। ক্রমে অভ্যাসে আর তোমার রিপুর উত্তেজনা হইবে না, তখন তোমার অনিষ্টও কেহ করিবে না।

এ কথাও তোমার স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ কর্ম্মযোগ নহে। কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু "আমি আমার" রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তির বাহিরে যাইতে হইবে। যাহা কর কাজ বলিয়াই করিবে। পীড়কের হস্ত হইতে পীড়িতের রক্ষা, অধর্ম্মের কবল হইতে ধর্ম্মের উদ্ধার, অসাধুর আক্রোশ

হইতে সাধুর পরিত্রাণ,—করিতে হয় বলিয়াই করিবে। পারগতা, অপারগতা, মান, অপমান, বলাবল, কিছুরই বিচার করিবে না। আমিত্ব ভুলিয়া যাইবে। আমার কিছুই নহে, আমি কিছুই নহি,—বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যই করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দারাভিগমন।

গুরু। আর একটি বিষয় আছে, যাহাতে জীবজগৎ অত্যাকৃষ্ট। তাহা স্ত্রী জাতি। যে কোন জীবই হউক, তাহার পুরুষকে তাহার স্ত্রীজাতি মোহাকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছে—ইহাই অনেকের মত।

কিন্তু কথাটি সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন নহে। স্ত্রী ও পুরুষ চৈতন্যেরই বিকাশ—আধারভেদে, গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র। উভয়েরই অজ্ঞানতার অধীন হইলে রিপুর উত্তেজনায়—অজ্ঞানতার তাড়নায় নরক-বহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। কেহ কম কেহ বেশী নহে—বোধ হয় এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত না হইতে পারে। যাহাই হউক, জীবের পক্ষে—মানুষের পক্ষে ইহা যে একটি পাপাকর্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রবলাকর্ষণের মূলে মায়া বা অবিদ্যা নিহিত আছে। আর যাহা আছে, তাহা তোমাকে ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অবিদ্যাই নরনারীকে এই পথে আকর্ষণ করিয়া লয়। সেই মোহাকর্ষণেই নর-নারী কর্ত্তব্য পথ ভুলিয়া গিয়া শরীর, আয়ু, বল ও ধর্ম্ম নষ্ট করে।

নরনারী কি বুঝিতে পারে না যে, জগতে যত কিছু নিকৃষ্ট পদার্থ

আছে, তন্মধ্যে এই দৈহিক ক্রিয়াই সমধিক অপকৃষ্ট ? মানব এই নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের অযথা সেবা করিয়া রোগী, হীনবীর্য্য, অধার্ম্মিক হইয়া পড়ে। তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। এই আকর্ষণের একটি নেশা আছে, —সেই নেশায় তাহার সেবকদিগকে উন্মত্ত করিয়া রাখে। সে আর অন্য পথ দেখিতে পায় না। পানাতে যেমন জল ঢাকিয়া রাখে, মেঘ যেমন চন্দ্রকে আবৃত করিয়া রাখে, এই নেশার প্রাবল্যে তেমনি কর্ত্তব্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে। ন্যাবা রোগ হইলে যেমন রোগী হরিদ্রা রঙ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ এই নেশা লাগিলে এই আকর্ষণ ভিন্ন তাহারা অন্য কিছুই দেখিতে পায় না। মানব বা মানবী এই নেশায় মত্ত হইলে, তখন তাহাদিগের বুদ্ধি হীত হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহারা জানিতে পারে না যে, তাহাদের সর্ব্বনাশের একশেষ হইয়া গিয়াছে। পাগল বা ভূতগ্রস্ত রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহার প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিতে না পারিয়া যেমন বলে, "বেশ আছি", তদ্রূপ ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব-মানবীও ভাবে "বেশ আছি।"

এইরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে মানব-মানবীর হৃদ্বৃত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর তাহাদিগের বস্তুগত্যা জ্ঞান থাকে না। যাহাকে একজন ভদ্র নর বা নারী অপবিত্র অস্পর্শীয় বলিয়া জ্ঞান করে, অধঃপতিত নর বা নারী তাহাকেই প্রাণের প্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিবে। এইরূপ হইবার কারণও যাহার ভিতরে যেমন পদার্থ আছে, বস্তুগত্যা ভাব জ্ঞান তাহার তদ্রূপই হইবে।

সন্ধ্যার সময় সান্ধ্যপ্রকৃতির অমল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে ভগবানের ভাবে একজন মহাপুরুষ উন্মত্ত হইয়া পথিপার্শ্বে পতিত হইয়া ছিলেন, ভাবাবেশে মহাপুরুষ অজ্ঞান—সেই পথ দিয়া একজন সাধক গমন করিতে ছিলেন, তিনি মহাপুরুষের ভাবাবেশ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার ভাবময়

দেহের চরণধূলি মাথায় লইয়া সেবার জন্ম ভাবাবসানের অপেক্ষায় পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই পথ দিয়া এক মাতাল গমন করিতেছিল, মাতালের তখন অত্যন্ত মত্তাবস্থা; মদিরামত্ত চক্ষুতে চাহিয়া মহাপুরুষকে দেখিয়া বলিল,—"হু ভায়ারও দেখছি ফলার।"— যে, যে ভাবের লোক, সে সেই ভাবই অনুভব করিল। অতএব হৃদয়ে যেমন ভাবের সত্ত্বা থাকিবে, ভাল মন্দ, সৎ বা অসৎ সে সেইরূপেই গ্রহণ করিবে।

আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ। এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়, ইহা হইতে নিবৃত্তি। নিবৃত্তির উপায় সেই দুই প্রকার। প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ সহজ পথ নহে,—প্রবৃত্তিমার্গও জয় করিতে হইবে। এই জন্মই বোধ হয়, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে পঞ্চমকরের ব্যবস্থা ছিল। প্রবৃত্তিমার্গে এত বড় একটি আকর্ষণকে জয় করিতে হইবে, ইহা সহজ কথা নহে। কিন্তু অভ্যাস ও সংযমে সকলই হয়। অভ্যাস ও সংযম কেমন করিয়া করিতে হয়, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন:—

পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেহত্রাপি চায়ুষা।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ॥

"পরদার-রতি ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই ভীতিপ্রদ। ইহাদ্বারা পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং মরণান্তে মানব নরকগামী হইয়া থাকে। এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্বীয় স্ত্রীর ঋতুকালে পুত্রকামী হইয়া সঙ্গত হওয়াই বিধেয়।"

অভ্যাসে ইহা হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে যে, যাহা রোগের কারণ —যাহা নরকের কারণ—যাহা আত্মার অবনতির কারণ, সে কার্য্য করিব

কেন? মনের দৃঢ়বলের সহিত এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি সুসংযত হইয়া যাইবে।

তৎপরে আত্মদানের কথা; তোমার বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, জগতে আপন পর বলিতে কেহ নাই। তবে অনিয়মিত-ভাবে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ সাধন করিতে গেলে, সংক্রমণ দোষ, নানা বিধ রোগের উৎপত্তি, শুক্রধাতুর অধিকতর ক্ষয় হেতু পরমায়ু হ্রাস; আসক্তির জন্য নরক ইত্যাদি হয়। আর ধর্ম্মভাবে গ্রহণ করিয়া সমতড়িদ্-বিশিষ্ট স্বীয় দারাতে উপগত হইলে, গৃহীর পক্ষে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু তাহাও যেন অধিক বা ইন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে সম্পাদন করা না হয়। পুত্র কামনায়, বংশরক্ষার্থ—ভগবানের সৃষ্টি প্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারই কাজ করিবার উদ্দেশ্যে—অন্যান্য কাজের মধ্যে এই কার্য্যও করিবে। যেরূপভাবে,যেরূপ দেবতাদিগের অধীন থাকিয়া সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পুত্রোৎপাদন করিতে হয়, হিন্দু তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥
ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং সরস্বতি॥
গর্ভংতে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

সামবেদীয়-গর্ভাধান মন্ত্র।

গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,—"সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসব-সমর্থ করুণ। দেবশিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন; যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুণ, আদিত্যদেব পুত্রার্থে তোমার গর্ভ রক্ষা করুণ। হে ভগবতি সিনীবালি! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে সরস্বতি! তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর। যাহাদের অনুষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগণ-

দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়-নম্র, সত্ত্বগুণবান্, নারীবিভূষণ স্বরূপ সম্পদযুক্ত ও আনন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমার-যুগল তোমার গর্ভাধান করুণ।”

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, হিন্দুর গর্ভাধান ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে নহে। উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন, কিন্তু তাহাতেও দেবশক্তি ভগবানে আত্মনির্ভরতা; তাহাতেও অহঙ্কার নাশ।

হিন্দু জানে স্ত্রীপুরুষে সম্বন্ধ কেবল দৈহিক নহে,—এই সংযোগের এক মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। উভয়ে এক হইয়া গৃহস্থলীরূপ মহাযজ্ঞ নিষ্পাদন করাই দাম্পত্যমিলনের চরমোদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি লাভ করিতে বা মজিতে-মজিতে একখানি মুখের দিকে চাহিয়া জীবন-তরী ভাষানও উচিত নহে। সেরূপ হইলে মনে করা উচিত, যে স্ত্রীর জন্য কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইতেছি—সে স্ত্রী কি? কেন নারীবিশেষের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, তাহাকে আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আপনার জীবন ও মন অকপটে তাহার চরণে উৎসর্গ করিতে বাসনা? কেন তাহার সন্তোষ সাধন ও প্রসাধনই জীবনের ব্রত? কেন তাহার সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ভাবিয়া পরমানন্দ উপভোগ করা? কেন তাহার বিরহে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া মর্ম্মাহত ও অবসন্ন হওয়া? মনে ভাবিয়াছ কি, এই রমণী জন্মের পূর্ব্বে তোমার কে ছিল,—কোথায় ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর নাই; কেহই দিতে পারিবে না। সেই সুদূরে অতীতের সুস্থূল যবনিকা ভেদ করিতে কাহারও মন-নয়নের সাধ্য নাই। মরণের পরে সেই লোচনানন্দদায়িনী কামিনী কোথায় যাইবে, কি হইবে, তাহাও জানে না, ভবিষ্যত-গিরির তমসাচ্ছন্ন গুহায় কি ব্যবস্থা আছে, তাহাও নির্ণয় করিতে তাহার দুর্ব্বল দৃষ্টির সামর্থ্য নাই। তথাপি আশক্তি কেন? আশক্তিই সর্ব্বনাশের কারণ। আত্ম ইন্দ্রিয়ের

সুখ প্রেম নহে,—কাম। কামের তাড়নায় প্রেম ভুলিও না। এক-খানি মুখে আসক্ত হইও না। চিনি খাওয়াতে আনন্দ আছে, কিন্তু চিনিতে খাইলে আনন্দ নাই? ইন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখিয়া আপন ইচ্ছায় তাহার পরিচালনা সুখের,—দাস হওয়া দারুণ দুঃখের কথা।

সংযম অভ্যাসের ফল। তাই হিন্দু ব্যবস্থা দিয়াছেন, অমাবস্যা প্রভৃতি দিনে নিজ পত্নীতেও উপগত হইতে নাই,—অমুক কাজ অমুক দিনে করিতে নাই,—না করিলেই সংযম অভ্যাস করা হইল। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, হিন্দু ঋষিগণ সংযম সাধনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিধিব্যবস্থা মতে চলিলেই সংযমের অভ্যাস করা হইবে। হিন্দুশাস্ত্রের সেই বিধানের স্থূল মর্ম্মগুলি বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

যোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।

প্রতিমাসে রজোদর্শনের পর যোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত রজঃকাল ;—রজঃস্রাব বন্ধ হইলে, রজঃকালের মধ্যে পুত্রার্থী দম্পতী যুগ্ম-রাত্রিতে সহবাস করিবে।

"ষষ্ঠ্যষ্টম্যামমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াম্॥

ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী তিথিতে দম্পতীর মিলন নিষিদ্ধ। রবি-সংক্রান্তিও নিষিদ্ধ দিন।

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।"

যতদিন পুত্র না জন্মে, ততদিনই ঋতুকালে সহবাস বিধেয়। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, আর প্রয়োজন নাই। পুত্রার্থই সহবাস; নতুবা ইহার অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নাই। এই ক্রিয়ায় শরীর ও ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে, পরমায়ুঃ ও বুদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হয়। পুত্রোৎপাদনের জন্য সে ক্ষতি

স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু পুত্রোৎপত্তি হইলে তখন বন্ধ করা বিধেয়। অভ্যাস করিলে তাহা পারা যায়।

ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে * ঋতুর দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত বিহিত কালে স্নাত, চন্দন-লিপ্তাঙ্গ, সুগন্ধ-পুষ্প-মাল্যধারী, উত্তম বেশ, ভূষা ও বসন-শোভিত, বীর্য্যবর্দ্ধক-বস্তুভোজনশীল, পরস্পর অনুরাগযুক্ত কামবেগার্ত্ত, সন্তানার্থী, পূর্ণবয়স্ক দম্পতীর উত্তম শয্যায় সহবাস বিধেয়।

ঋতুমতীর প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত স্বামি-সহবাস বিশিষ্টরূপে অবৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ ঋতুর প্রথমাবস্থায় শ্রবমাণ রক্ত নিতান্ত তরল, অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও অপরিপক্ক,—সুতরাং দূষিত। প্রায়শঃ প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্তই আর্ত্তব রক্তের ঐরূপ দূষিতাবস্থা থাকে ; অতএব প্রথম দিবসে সহবাস করিলে রমণীর প্রদরাদি রোগ এবং উক্ত দূষিত রক্তের সংস্রবে পুরুষের উপদংশ, প্রমেহ ও শুক্রাশ্মরী প্রভৃতি রোগ সমুৎপন্ন হইয়া আয়ুঃক্ষয় করে এবং উক্ত দূষিত শোণিত রূপ বীজে গর্ভসঞ্চার হইলে, তদ্‌গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই গতাসু হয়। দ্বিতীয় দিবসেও তদ্রূপ ফল, অথবা সূতিকাগৃহে সন্তান বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসেও তদ্রূপ ফল, অথবা সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে।

অপিচ-ধর্ম্মার্থ ও পুত্রার্থ ভার্য্যাপরিগ্রাহী সংযতেন্দ্রিয় আর্য্যগণ ঋতুর প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত সহবাস না করিবার কারণ-স্বরূপ আরও বলিয়াছেন ; যে প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাশর হইতে তদধোমুখ দ্বারা সবেগে আর্ত্তব শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে। সুতরাং তদবস্থায় সহ-

* চতুর্থ দিবসেও অত্যন্ত আর্ত্তরক্তের অনুবৃত্তি থাকিলে, সহবাস বিধেয় নহে। কারণ তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত রূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আর্ত্তরক্তের বেগ নিবৃত্ত হইলেই সহবাস বিধেয়।

বাস করিলে, ক্ষরিত শুক্র উত্তমরূপে শোণিতস্রাবী জরায়ু মুখ দ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যেমন নদী-স্রোতের প্রতিকূলে চালাইবার অভিপ্রায়ে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহা প্রতিকূল গমনে অসমর্থ হইয়া, স্রোতের অনুকূলগামী হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় পতিত শুক্রও শোণিতস্রাবী গর্ভাশয় মুখ দ্বারা গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া স্রবমাণ শোণিত-বেগের সহিতই অধঃপ্রত্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং সেই বীজ দ্বারা গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না।

গর্ভাধানের পূর্ব্ব হইতেই দম্পতীর উত্তম আহার, ব্যবহার ও চিত্তের হৃষ্টতা থাকা আবশ্যক। কারণ সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে দম্পতী যাদৃশ আহার, ব্যবহার ও চেষ্টাশালী হইয়া গর্ভাধান করেন, তদ্‌গর্ভজ সন্তান প্রায়শঃই তাদৃশ আহার, ব্যবহার ও চেষ্টাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

সুশ্রুত-নামক চিকিৎসা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, অবিবেয় প্রথম তিন দিবস ভিন্ন ঋতুর যুগ্ম দিবসে (চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ দিবসে) সহবাস করিলে, পুত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা; এই অযুগ্ম দিবসে সহবাস (পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিবসে) সহবাসে কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। ত্রয়োদশ দিবস অবধি অবশিষ্ট কাল নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে, নপুংসক সন্তান হওয়ার কদাচিৎ আশঙ্কা থাকিতে পারে।

অত্যন্ত বৃদ্ধা কিংবা কোন রোগ-পীড়িতা স্ত্রী, কিংবা এবংবিধ পুরুষের সংযোগে গর্ভসঞ্চার হইলেও অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রায় সকলেই বেশ জানেন যে, রুগ্না স্ত্রীর সহিত সহবাস করা কোন মতেই উচিত নহে। কারণ, এরূপ সংসর্গে সন্তান উৎপন্ন হইলে, সেই সন্তানেরও উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সেই স্ত্রীরও রোগবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেইরূপ পীড়িত পুরুষের সম্বন্ধেও উক্তরূপ অনিষ্ট ঘটে।

শাস্ত্র এই জন্তই ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীর বা পুরুষের শরীর কোনরূপ অসুস্থ থাকিলে, কোন মতেই সংসর্গ বিধেয় নহে। এই সকল শাস্ত্রজ এবং বহুদর্শনজনিত জ্ঞানে প্রায় সকলেই এ অনিষ্টকারিতার বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু তথাপি কুলজ অথবা পৈতৃক রক্তপিত্ত, ক্ষয় বা যক্ষ্মাকাস, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বহুমূত্র এবং শ্বাশ ও কাস প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া কত শত হতভাগ্য অকালে জীবনলীলা শেষ করিতেছে। বস্তুতঃ পিতামাতা যদি ঐরূপ দুরন্ত রোগাক্রান্ত সময়ে সহবাস না করেন, তবে কি আর হতভাগ্য সন্তানের ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে? যাহা হউক এ সম্বন্ধে সকলেরই সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রতিপদ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী ও অষ্টমী তিথি এবং অশ্লেষা মঘা, মূলা, কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, রেবতী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া এবং পিতৃশ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি, রবিবার প্রভৃতি দিবসে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অনিষ্টাপরতন্ত্রা, অনভিমতরূপা, অনভিমত-কর্ম্মপরতন্ত্রা, অনিপুণা, অপ্রসন্না, অনভিলাষিণী, এবং অন্যাভিলাষিণী স্ত্রীতে গমন করিতে নাই। দেবালয়ে, চতুষ্পথে, উপবনে শ্মশানে, বধ্যভূমিতে, ঔষধালয়ে ব্রাহ্মণগৃহে, গুরুগৃহে, পুরোহিতাশ্রমে, দেবস্থানে, প্রাতে, সায়াহ্নে, অশুচি অবস্থায়, ঔষধ ভক্ষণান্তে, অপ্রণীতসঙ্কল্পাবস্থায়, অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে অভুক্ত অবস্থায়, অতি ভোজনান্তে, বন্ধুর শয্যায়, বিষ্ঠা—মূত্ররোগ-পীড়িতাবস্থায় এবং লোক-সমাকীর্ণ স্থানে, স্ত্রী সংসর্গ করিবে না। পরন্তু শ্রান্তি ব্যায়াম, উপবাস এবং ক্লান্তি পীড়িত হইয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করাও কোন মতে বিধেয় নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নবিকার।

শিষ্য। আপনি যে সকল নিয়মাদির কথা বলিলেন, তাহা অবগত হইলাম। কিন্তু নিবেদন এই যে, যাহারা অত্যাচারের নরক বহ্নিতে আত্মশক্তি বিনষ্ট করিয়া বসিয়াছেন,—তাহাদের উপায় কি? আত্মকৃত মহাপাতকে যাহাদের শুক্র অত্যন্ত তরল হইয়া গিয়াছে, ধারণাশক্তি একেবারেই নাই,—তাহারা যদি ইচ্ছা করে যে আমরা শুক্রধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব,—এবং যদি তাহারা প্রাণপণে সেই নিকৃষ্ট রিপুর সহিত যুদ্ধ করে, তথাপি জয়ী হইতে পারিবে না। তাহাদের তরল শুক্র তাহাদের অজ্ঞাতে নিদ্রাকালে পতিত হইয়া যাইবে,—এমত অবস্থায় কি করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে পারিবে?

গুরু। উপায় আছে, বলিতেছি শোন। শুক্র কি, তাহা তোমার নিকটে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছি। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া রসে পরিণত হয়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ' মেদ হইতে অস্থি' অস্থি হইতে মজ্জা; মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শুক্রই জীবের জীবন বা দেহের সার।

এখন কামরিপু এই শুক্রেতে চালিত করিয়া আনিয়া নিঃসারণ করিয়া দেয়। প্রলোভনের পদার্থ দেখিলে; এই কামরিপু উত্তেজিত হয় এবং অবিবেকী বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণে অক্ষম ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন এইরূপেই

সম্পাদিত হইয়া থাকে। রিপুর বশীভূত হইয়া যে মানব এই অতি কদর্য্য বিষয়ে অভ্যাস আরম্ভ করে, সে সেই অভ্যাসের অধীন হইয়া শরীর রক্ষার হেতুভূত—বল, বীর্য্য, উৎসাহ, সাহসের একমাত্র অবলম্বন শুক্র ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে। তারপরে অভ্যাসে অভ্যাসে এমন হইয়া যায় যে, প্রলোভনের বস্তু উপস্থিত না হইলেও কল্পনা দ্বারা রিপুগণ উত্তেজিত হয় এবং সেই হতভাগ্যকে শুক্রধারণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম করিয়া দেয়। চিকিৎসকেরা এই অক্ষম-পীড়াকে ধাতুদৌর্ব্বল্য বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

এই পীড়া জন্মিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগতে এমন কোন ব্যাধি নাই, যাহা এই পীড়ার মলিন সঙ্গী নহে। ধাতুদৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সকল পীড়াকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যাধির চিকিৎসা নাই, ঔষধে এ রোগ আরোগ্য হয় না। ইহার একমাত্র উপায়—একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ।

স্বপ্নবিকারও এইরূপ মহাপাতকে ঘটিয়া থাকে। একজন চিকিৎসক লিখিয়াছেন,—"মানুষের দেহের সহানুভূতির স্নায়ু * সকল উত্তেজিত হইয়া তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থ-পর্ব্বে উন্মুখ করিয়া দেয়। 'মন্থন'দণ্ডদ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃত অথবা সঙ্কল্পজ স্ত্রীলোক দর্শনাদি দ্বারা উক্ত স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হইয়া শুক্রোৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রী সঙ্গের অসত্ত্বে মনে যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় সহানুভূতিক স্নায়ু সকল ও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। অন্নরস

* দেহের সমস্ত বংশ সন্ধি-স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে গ্রন্থিময় স্নায়ু-শৃঙ্খল অবস্থিত করে। এই শৃঙ্খলদ্বয় হইতে সহানুভূতিক স্নায়ুসকল সমুদ্ভূত হয়। চিকিৎসা দর্পণ।

শুক্রের বীজ সহানুভূতিক স্নায়ু সকল তাহার উৎপাদক এবং সঙ্কল্প তৎপরিস্ফূর্ত্তির মূলীভূত কারণ। মূল শক্র সঙ্কল্পকে পরিত্যাগ করিলে স্বপ্নবিকারের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

স্বপ্নবিকার আর ধাতুদৌর্ব্বল্য এই দুইটি অবস্থা পাশাপাশি, অথবা এ-পিঠ, আর ও-পিঠ। এই অবস্থা যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সহিত নিম্নপ্রকারের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা ও অভ্যাস করার প্রয়োজন। নতুবা জানিতে হইবে, মরণ-যবনিকা তাহাদের জন্য উত্তোলিত হইয়া আছে। আর সেই অবস্থায় তাহারা যে সকল সন্তান জন্ম দিবে; তাহারা নিতান্ত অল্পায়ু এবং সমাজের দুঃখ ও যন্ত্রণাদায়করূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

শিষ্য। যে প্রকারে ঐ অবস্থায় লোকের ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা ও পালন করিতে হয়; তাহা বলুন।

গুরু। সর্ব্বপ্রকারেই মৈথুন পরিত্যাগ করিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার বলিবার কারণ এই যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও কল্পনা সম্বন্ধে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্পনাসম্ভূত ভাবাদিতেও শুক্র নির্গত হয়। শাস্ত্রে সাক্ষাৎ ও কল্পনাসম্ভূত ভাবকেও মৈথুন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে শুক্রকে উপস্থ-পর্ব্বে আনয়ন করে, তাহাকেই মৈথুন বলা হয়। যে প্রকারেই হউক, শরীর হইতে শুক্রক্ষরণ হইয়া আসিয়া উপস্থ-পর্ব্বে সঞ্চিত হইলে তাহা আর শরীরে যাইবে না। দুগ্ধ হইতে নবনীত উত্থিত হইলে আর কি কখনও তাহা দুগ্ধে মিশ্রিত হয়? শাস্ত্র বলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

সকামভাবে স্ত্রীলোকের রূপদর্শন করিবামাত্রেই বীর্য্যক্ষয় হয়। স্ত্রীলোকের রূপ-গুণাদির বর্ণনা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয়; স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া বা গোপনে কথোপকথন করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয় এবং রতিক্রিয়ার সঙ্কল্প করিবামাত্রই বীর্য্যক্ষয় হয়। কিন্তু এই সকল ক্ষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা না গেলেও শরীরের অভ্যন্তরে প্রথমে শোণিত-কোষ হইতে শুক্র বিচ্যুত হইয়া শুক্রাধারে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পরে প্রস্রাবের সহিত বা স্বপ্নদোষ সহকারে নির্গত হইয়া থাকে। ফলতঃ উক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুনই স্বপ্নদোষের কারণ এবং তাহাই ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র বাত ও যক্ষ্মাকাস প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগের নিদান।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এবং দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগে যত্নবান হইবে।

শিষ্য। উহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেও যে ত্যাগ করা যায়, তাহা নহে। যাহারা আবাল্য হইতে ঐ পাপপথ হইতে বিরত, হয়; ত তাহারা স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় চিন্তা হইতে মনকে দূরে রাখিতে পারে। কিন্তু যাহারা ঐ কুক্রিয়ায় একবার আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—তাহারা ইচ্ছা করিলেও সে চিন্তা হইতে মনকে সরাইতে পারে না। এমন কি কোন উপায় নাই, যাহা দ্বারা মনকে ঐ পাপ পথ হইতে দূরে রাখা যায়?

গুরু। আছে বৈ কি? শাস্ত্রকারগণ যেমন ব্যাধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তেমনি ব্যাধি আরোগ্যের উপায় এবং ঔষধ নির্ণয়ও করিয়াছেন।

শিষ্য। সেই উপায় কি, তাহা বিস্তৃতরূপে বলিয়া দিন।

গুরু। সে উপায় একটি নহে—অনেক। কএকটি এ স্থলে বলিতেছি শুনিয়া রাখ।

প্রথমতঃ—

বিপরীত চিন্তা দ্বারা কামিনীর কামরূপ হইতে মনকে সরাইয়া আনা। যে আশায় মন রমণীর উপর প্রধাবিত হয়,—সে ধিক্কারজনক নরক। স্তন-দ্বয় মাংসপিণ্ড—দেহ রক্তপূঁযাদির আধার। মল মূত্র তাহার চির সহচর। এই গুলির চিন্তা ও বিশ্লেষণে কামরিপু নিস্তেজ হয়,—আসক্তির আগুন নিবিয়া আসে।

দ্বিতীয়তঃ—

কামরিপুর বিপরীত চিন্তা স্নেহ। স্নেহরসে হৃদয় পূর্ণ কর,—সন্তান বা ছোট ভাইকে কাছে লইয়া শয়ন, ভোজন এবং তাহার বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিলে ঐ কু-অভ্যাস দূর হইতে পারে

তৃতীয়তঃ—

ধ্যানযোগ। ধ্যানযোগ দ্বারা কামরিপুর সম্যকপ্রকারে দমন হইয়া যাইতে পারে এবং অষ্টাঙ্গ মৈথুন বিনিবৃত্ত হয়,—স্বপ্নবিকার আর হয় না।

মনে করিও না, সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানযোগ অত্যন্ত কঠিন। সর্ব্বদা পারমার্থিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারে না বলিয়া কি তাহারা ধ্যানযোগের অধিকারী নহে,—তাহা চিন্তা করাও অবিধেয়।

ধ্যানযোগ কি তাহা বোধ হয়, তোমার মনে আছে। সংক্ষেপে এস্থলে পুনরপি তাহা বলিতেছি—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহাকেই ধ্যান বলে।

"যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং বস্তু তদাকারানন্তরিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি, তদা তৎ ধ্যানম্॥"

যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ,

সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মনোবৃত্তি-প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়।

শাস্ত্রে তিন প্রকারে ধ্যানের কথা উল্লেখ আছে।

স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ।
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ন্তথা।
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥

ধ্যান তিন প্রকার,—স্থূলধ্যান, সূক্ষ্মধ্যান ও জ্যোতির্ধ্যান। যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূলধ্যান, যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান বলা যায়।

স্থূলধ্যান,—যাঁহার যে ইষ্টদেবতা, তিনি সেই ইষ্টদেবতাকে হৃদয়-পদ্মমধ্যে সর্ব্বাভরণ-ভূষিতভাবে, সর্ব্বশোভাময়রূপে চিন্তা করিবেন, ইহাই স্থূলধ্যান।

তেজোধ্যান,—ভ্রূ-যুগলের মধ্যে এবং মনঃস্থানের ঊর্দ্ধে যে ওঁকারময় ও শিখাসমূহযুক্ত তেজঃ বিদ্যমান আছে, সেই তেজোরাশিকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে ইহাই তেজোধ্যান।

সূক্ষ্মধ্যান,—প্রথমে ভাবনা করিবে, ভুজগাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রৎ হইয়া জীবাত্মার সহিত ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক নেত্ররন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গে উপস্থিত হইয়াছেন। ওঁকারময় ব্যক্ত ব্রহ্মবীজ প্রকৃতি আর পুরুষ যুগল-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রস-তত্ত্বের বিহারে নিযুক্ত এবং কুণ্ডলিনী-গলিত রসধারা পানে বিভোর। মনকে কেবল সেই প্রকৃতি-পুরুষ বা রাধাকৃষ্ণের চরণে ধারণা করিয়া রাখিবে।

চিত্তকে এইরূপভাবে ধ্যানযোগে নিমগ্ন রাখিলে, সে কখনই নারীরূপ নরকের চিন্তায় মগ্ন হইতে পারিবে না; আর তাহা হইতে স্মরণাদিতে শুক্ররস নির্গত হইয়া উপস্থ-পর্ব্বে আসিয়া জমিতে পারিবে না এবং স্বপ্ন বিকারাদিতে তাহার স্খলনও হইবে না।

আর এক প্রকারে স্বপ্নবিকার নিবারণ করা যাইতে পারে। তাহা মুদ্রাবন্ধন।

যে মুদ্রা দ্বারা শুক্র স্থির হয়, দেহ লাবণ্যময় হয়, দীর্ঘজীবন ও সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে,—শাস্ত্রে তাহাকে মহামুদ্রা বলে। মুদ্রাবন্ধনের কথা একটু পরে বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধাতুদৌর্ব্বল্য।

শিষ্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহারা আত্মকৃত অপরাধে নির্ব্বীর্য্য হইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে,—যৌবনে জরাগ্রস্ত হইয়াছে,—শক্তির সম্পূর্ণ অপব্যবহার করিয়া শক্তিহারা হইয়া পড়িয়াছে;—তাহারা কি আবার ব্রহ্মচর্য্যের সুশীতল আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারে?

গুরু। তুমি কাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

শিষ্য। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিয়া যাহারা ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগগ্রস্ত হইয়াছে।

গুরু। ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের অবস্থাটা আমার নিকটে উত্তমরূপে বর্ণনা কর।

শিষ্য। কেন, ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের নিদান কি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে নাই ?

গুরু। না থাকিবারই কথা ; যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝেন নাই যে, তাঁহাদেরই বংশে এমন সন্তান জন্মিবে,—যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যার নরক-মধ্যে ডুবিয়া পড়িবে।

শিষ্য। তবে কি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ নাই ? তবে কি আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতে ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রতিকার নাই।

গুরু। নাই, কে বলিল ? শুক্ররক্ষণই যদি ঐ রোগের মূল কারণ হয়, তবে শুক্ররক্ষার উপায় হইলেই তাহার চিকিৎসা হইল,—সে উপায় ব্রহ্মচর্য্য সাধনারই অন্তর্গত। তবে উহার অবস্থাটা শুনিবার প্রয়োজন,—তুমি তাহা একবার বল।

শিষ্য। ধাতুদৌর্ব্বল্য-রোগের অবস্থা বলা সহজ কথা নহে। মানব-শরীরে যত প্রকার রোগ হইতে পারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যরোগীতে অল্লাধিক পরিমাণে তাহা সমস্তই প্রকাশ পাইয়া থাকে। মাথাধরা, মাথাঘোরা, চক্ষে বিন্দু দর্শন, ঘোলাটে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত সূত্রবৎ পদার্থ নির্গম, মলমূত্র ত্যাগের সময় শুক্রক্ষয়, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ, স্বপ্নবিকার, সঙ্গমশক্তির হীনতা, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধ, অনুৎসাহ, হাত-পায়ের জ্বালা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, খিটখিটেস্বভাব, প্রাণের ভিতর হু হু করা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, সার্ব্বাঙ্গিক বা স্থানিক বেদনা, বাত প্রভৃতি ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের লক্ষণ। কোথাও ইহার সমস্তগুলি, কোথাও ইহা হইতে অধিক, কোথাও বা ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ পায়। কাহারও কাহারও মূত্র দ্বারে সুড় সুড় করে, চুলকায় ও ক্ষত আছে বলিয়া অনুভব হয়।

গুরু। শুক্রব্যয় দ্বারা যতগুলি অবস্থা ঘটিতে পারে তাহারই বর্ণনা করিলে,—এক্ষণে এইগুলি সমস্ত দূর করিতে হইলে, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য

ব্রতধারণই ব্যবস্থা। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণও অত্যন্ত কঠিন কথা। কেন না, ধাতুদৌর্ব্বল্য যাহার ঘটিয়াছে, সে বহুদিন হইতে শুক্রব্যয় অভ্যাস করিয়াছে এবং স্ত্রীলোকের রূপধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যেমন মোদক-লোলুপ ব্যক্তিদের মোদকের ধ্যান করিলেই রসনা হইতে লালা ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ ঐরূপ অভ্যস্ত ব্যক্তিরা রমণীর ধ্যান করিলেই তাহাদের শোণিত-কোষ হইতে বীর্য্যবিন্দু সকল স্খলিত হইতে থাকে,—শুক্রব্যয় ও রমণীর ধ্যানে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে,—এই দুইটি অভ্যাসের বিপরীত অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অভ্যাস করিতে করিতে এদিকে অভ্যস্ত পাতকে তাহাদিগকে নির্ব্বীর্য্য ও নিঃস্বত্ব করিয়া জরাজীর্ণ ও মৃত্যু-পথে লইয়া যাইবে। অতএব তাহাদিগকে অধিকতর সংসাহস ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। যাহাতে তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক রোগগুলির নিবারণ হইতে পারে, এমন একটা ঔষধ সেবন করা মন্দ নহে।

শিষ্য। ঐ সমস্ত উপসর্গগুলি নিবারণ হইতে পারে, আপনি এমন কোন ঔষধ জানেন কি ?

গুরু। যাহাতে শুক্রবৃদ্ধি হয়, অথচ সত্ত্বগুণের প্রভাব বাড়ে, এমন ঔষধে উপকার হইতে পারে।

শিষ্য। আর কি উপায় আছে ?

গুরু। যোগশাস্ত্রান্তর্গত কতকগুলি নিয়ম আমি বলিয়া দিতেছি, সেইগুলির অনুষ্ঠানে সমূহ উপকার হইতে পারিবে।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। এক একটি উপসর্গে এক একটি নিয়ম বা যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, তাহাতে উপসর্গগুলিই আরোগ্য হইয়া থাকে, মূল ব্যাধি আরোগ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের অনুষ্ঠান গুলি

অবলম্বন করিতে হয় এবং শুক্রক্ষয় ও রমণীর ধ্যানের বিপরীত বৃত্তির সাধনা করিতে হয়।

শিষ্য। আগে উপসর্গগুলি নিবারণের উপায় বলুন। আমি এক একটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তৎসম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভাল তাহাই হউক।

শিষ্য। মূত্রযন্ত্রের মধ্যে যে ক্ষত হয় বা চুলকায়, সুড় সুড় করে, তাহা নিবারণের উপায় কি?

গুরু। জলবস্তি যোগদ্বারা এই রোগ আরোগ্য হয়। গুহ্যদ্বার হইতে লিঙ্গাগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানের ভিতর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল আক্রান্ত ও স্ফীত হইয়া ঐরূপ প্রদাহ উপস্থিত করে, এবং তাহাতে ক্ষতও হয়। জলবস্তি যোগদ্বারা তাহা আরোগ্য হয়। অধিকন্তু সেই রোগের আদি কারণও আরোগ্য হয়। জলবস্তি যোগ নিম্ন প্রকারে করিতে হয়। যথা;—

নাভিমগ্নজলে পায়ুং ন্যস্তবানুৎকটাসনম্।
আকুঞ্চনং প্রসারঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেৎ॥

জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকটাসন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে, ইহার নাম জলবস্তি।

প্রমেহঞ্চ উদাবর্ত্তং ক্রূরবায়ুং নিবারয়েৎ।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবসমো ভবেৎ॥

মেহ, উদাবর্ত্ত ও ক্রূরবায়ু জলবস্তিদ্বারা নিবারিত হয় এবং স্বচ্ছন্দশরীর ও কামদেবের সমান সুন্দর মূর্ত্তি হয়।

শিষ্য। উৎকটাসন কি প্রকার?

গুরু। যোগশাস্ত্রমতে—

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামবষ্টভ্য ধরাং গুল্‌ফে চ খে গতৌ।
তত্রোপরি গুদং ন্যস্য বিজ্ঞেয়মুৎকটাসনম্॥

দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক দুই গুল্ফ অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্ফের উপরে গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে,—উহাকে উৎকটাসন বলে।

শিষ্য। মাথাঘোরা ও মাথাধরা নিবারণের যোগ্য-শাস্ত্র-সম্মত উপায় বলুন।

গুরু। শিরোঘূর্ণন ও শিরঃশূলাদিতে নিম্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগিগণ নিরাময় হইবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকারন্ধ্র দিয়া শীতল জল পান করিবে,—ইহাতে মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাকিবে:—মাথা ধরিবে না, ঘুরিবে না বা সর্দ্দি লাগিবে না। ইহা কঠিন কার্য্যও নহে। একটি পাত্রে খানিক শীতল জল রাখিয়া তাহার মধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া দিয়া, গলার ভিতরে ধীরে ধীরে জল টানিতে হয়। ক্রমে ইহা সুন্দররূপে অভ্যাস হইয়া যাইবে।

শিষ্য। শুক্রক্ষয়কারী ব্যক্তির প্রায়ই শ্বাস-কাস (ব্রঙ্কাইটিস্ অবশেষে য়্যাজ্‌মা) রোগ হইয়া থাকে;—কোন ঔষধেই প্রায় ঐ রোগ আরোগ্য হয় না। ইহা নিবারণের উপায় কি?

গুরু। এই রোগ আরোগ্যের যোগশাস্ত্রসম্মত একটি উপায় তোমাকে বলিয়া দিতেছি। এই উপায়ে বহুলোক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। প্রক্রিয়াটি এই,—শ্বাস বা হাপানি যখন প্রবল হইবে, তখন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে, কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, তখন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে, সেই নাসিকার শ্বাস বন্ধ করিয়া অন্য নাসিকায় বায়ুর গতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তদর্থে যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, যে নাশিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা-দ্বারা শ্বাস টানিতে হইবে; তারপরে সেই নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া বিপরীত

নাসিকাদ্বারা ঐ শ্বাস পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে অন্যূন দশ মিনিট করিলে হাঁপানির টান কমিয়া যাইবে। তৎপরে প্রত্যহ ঐরূপ করিতে করিতে রোগ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

শিষ্য। ধাতুদৌর্ব্বল্যে স্মরণশক্তি কমিয়া যায়"—স্মরণশক্তির বৃদ্ধির সহজ উপায় কি?

গুরু। স্মরণশক্তি কম হইলে মাথার উপরে আর একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া, তাহার উপরে আর একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে আঘাত করিবে। কিছুদিন এইরূপ করিলে নষ্ট স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হয়।

শিষ্য। অনেকের তৃষ্ণারোগ হয়, অর্থাৎ ঘন ঘন এবং পুনঃ পুনঃ জলপানের ইচ্ছা হয় এবং জলপান না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। ঘন ঘন জলপান জন্য প্রস্রাবও অধিক হয়; অতএব তৃষ্ণা নিবারণের উপায় কি?

গুরু। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপরে অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য আছে, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন এইরূপ চিন্তাতেই তৃষ্ণারোগ সারিয়া যায়।

শিষ্য। কাহারও কোষ্ঠ, কাহারও উদরাময় হয়,—ইহা আরোগ্যের উপায় কি?

গুরু। দুইসপ্তাহ কাল নাভিকন্দ ধ্যান করিলে উদরাময় রোগ আরোগ্য হয়।

শিষ্য। ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীর স্বভাব অত্যন্ত খিট্ খিটে' হয়, ইহা নিবারণের উপায় বলুন।

গুরু। শুক্রক্ষয় জন্য দৈহিক সমস্ত ধাতুর বিকার উপস্থিত হয় এবং সেইজন্যই স্বভাব ঐরূপ 'খিট খিটে' হয়। তন্নিবারণার্থ প্রত্যহ একচিত্তে

শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণের ধ্যান করিবে। এইরূপে করিলে দেহস্থ সেই সেই বিকার বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার মূর্ত্তি ধ্যানেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

চিরযৌবন লাভের জন্য হঠযোগশাস্ত্রে নিম্ন উপায় কথিত হইয়াছে—যখন যে অঙ্গে যে নাড়ীতে শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই অঙ্গে নাড়ী রোধ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ এবং মোচন করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তি চিরজীবী ও চিরযৌবন লাভ করিতে পারে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের সর্ব্ববিধি নিবারণের যোগশাস্ত্রসম্মত একটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা এই—অভ্যাসদ্বারা দিবাভাগে বাম নাসিকার এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসবহন রাখিতে হয়,—এইরূপ করিলে শরীরে কোন প্রকার পীড়া জন্মে না,—আলস্য ও জড়তা বিদূরিত হয় এবং দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে ঐরূপ অভ্যাস করিতে পারা যায়?

গুরু। প্রথম দিবসের কিয়ৎ সময় দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসবহন বন্ধ রাখিতে হয় এবং রাত্রিকালে কিয়ৎ সময় দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসবহন বন্ধ রাখিতে হয়। এইরূপে করিতে হইলে নাসারন্ধ্রে তুলা রাখিতে হয়, অথবা অঙ্গুলীর চাপ দ্বারা বন্ধ রাখিতে হয়,—ক্রমে ক্রমে সময়ের বৃদ্ধি করিতে হয়। তৎপরে অভ্যাসে বিনা চাপে দীর্ঘ সময় ঐরূপ বন্ধ রাখা যায়।

এস্থলে তোমাকে বলিয়া রাখি, শুক্রক্ষয়ে ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্মে,—শুক্রক্ষয় নিবারণ না হইলে কোন প্রকারেই তাহা আরোগ্য হয় না। অতএব প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিবে,—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই গুলির অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। অত্যাচারে অনাচারে যাহাদের শুক্র পাতলা হইয়া গিয়াছে,—

তাহারা চেষ্টা করিলেও শুক্র ধারণ করিতে পারে না,—হয় স্বপ্নে, না হয় অন্য প্রকারে ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। প্রাণপণে অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমে তিনদিন রক্ষা করিয়া যদি চারিদিনে ব্রত ভঙ্গ হয়, আবার ভগবানকে স্মরণ করিয়া ব্রতধারণ করিবে, এবারে দেখিবে দশদিন রক্ষা হইবে,—এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধারণাশক্তি বাড়িয়া যাইবে। ব্রতভঙ্গ হইবে, তথাপি ব্রত রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এইরূপে করিতে করিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বায়ু-সাধনদ্বারা রোগ নিবারণ।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, বায়ু সাধন দ্বারা যোগিগণ নিজ দেহের রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া সে উপায়গুলি বলুন।

গুরু। দেহের সর্ব্বত্র বায়ুরই বিকাশ। প্রাণও বায়ু—অতএব বায়ুসাধনদ্বারা মানুষ নিরাময় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রোগোপশমন জন্য বায়ু সাধনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

ইদানীং ক্লেশহার্য্যার্থং বক্তব্যং বায়ু-সাধনম্।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ রোগহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

অধুনা সাধকের ক্লেশ দূর করিবার জন্য বায়ু-সাধন বলিতেছি।—এই বায়ুসাধনদ্বারা এই সংসারে দৈহিক নিখিল রোগ প্রশান্ত হয়।

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য রোগাণাং সংক্ষয়ো ভবেৎ॥

যে বুদ্ধিমান্ সাধক তালুমূলে রসনা রাখিয়া প্রাণবায়ু পান করিবেন, তাঁহার রোগ সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। জিহ্বাটি বক্র করিয়া তালুর মূলদেশে সংলগ্ন করিবে—তার পরে হৃদয়দেশে যে প্রাণবায়ু আছে, তাহা অশোধিত করিয়া পান করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নাসিকাদ্বারা ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলং বা বিচক্ষণঃ॥
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥

প্রাণাপানবিধানবিৎ ব্যক্তি যদি কাকচঞ্চুর ন্যায় ওষ্ঠাধর করিয়া তদ্দ্বারা শীতল বিশুদ্ধ বায়ু পান করেন, তবে তিনি উপস্থিত যে কোন পীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজ্বরাময়াঃ॥

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উক্ত বিধান মতে প্রত্যহ বিশুদ্ধ সরস (জলীয় বাষ্পমিশ্রিত) বায়ু পান করিবেন, তাঁহার শ্রমজ্বর, দাহজ্বর ও অপরাপর রোগ বিদূরিত হইবে।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চান্দ্রসলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং তরতি নিশ্চিতম্॥

যে যোগী জিহ্বা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলরক্ষিত সুধা পান করিবেন, তিনি একমাসমাত্র সাধন দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারিবেন।

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ॥

যিনি রসনা ব্যাবর্ত্তিত করিয়া রাজদন্তের (কসের দাঁত, আক্কেল দাঁত) নিকটস্থ বিবর দৃঢ়রূপে নিপীড়ন করিয়া দেবী কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান সহকারে যথাবিধি বিশুদ্ধ বায়ু পান করিবেন, তিনি ষণ্মাস সাধনদ্বারা কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে॥

কোন সাধকের ক্ষয়রোগ হইলে, তিনি তৎশান্তির নিমিত্ত কুণ্ডলিনীর মুখে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে কাকচঞ্চুবৎ ওষ্ঠাধর করিয়া মুখদ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু পান করিবেন; তাহা হইলে তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।

অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু॥

যে বুদ্ধিমান যোগী অহর্নিশ কাকচঞ্চুবৎ মুখদ্বারা বায়ু পান করিবেন, তাঁহার দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ও অদৃশ্যীকরণ সিদ্ধি হইবে।

দন্তৈর্দ্দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ॥

যে মেধাবী ব্যক্তি দন্তদ্বারা দন্ত নিপীড়ন করিয়া ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া ধীরে ধীরে বায়ু পান করিবেন, তিনি অচিরে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবেন।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ॥

যোগী ক্ষণকাল জিহ্বা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া (বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অবস্থান করিলে আশু ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

শিষ্য। এইরূপ প্রক্রিয়া কতদিন ব্যাপিয়া করিতে হয়?

গুরু। যোগশাস্ত্রে ছয় মাস হইতে বৎসরাধিক কালের ব্যবস্থা আছে,—আমার মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া করিলেই ভাল হয়। অভ্যাসের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা বোধ হইতে পারে, কিন্তু পরে—ক্রমাভ্যাসে সুন্দররূপে আয়ত্ত হইয়া যাইবে এবং ঐরূপ করিলে মনে আনন্দের উদয় হইবে। অতএব নিজের রোগ বা অবস্থা বিবেচনায় উহার যে কোন একটির অভ্যাস করা উচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রতিষেধক উপায়।

গুরু। এবার তোমাকে তোমার শোনা কথা পুনরায় শুনাইব। তুমি উত্তমরূপে স্মরণ রাখিও,—নিদানের বর্জ্জনবিধিই ব্যাধির চিকিৎসা! অতএব সর্ব্বপ্রকারে,—বুদ্ধি ও দৃঢ়তা সহকারে কাম ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিবে। তাহা হইলেই ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে। তদর্থে মনে করিয়া রাখিবে যে,—স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সংযোগই কেবল সহবাসকারীর চরম উদ্দেশ্য নহে;—ইহাতে মানসিক এবং নৈতিক বিষয়ের সংস্রবও আছে।

পরন্তু এই মিশ্রিত কার্য্যের বাসনা নিবৃত্তি করিতে আমাদিগের মিশ্রিত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন;—সেই হেতু কেবলমাত্র দৈহিক শাসন ঐ বিপদে আমাদিগকে সাহায্য করিবে না। ধর্ম্মবিধানে চিত্তকে সমুন্নত করিতে হইবে এবং মানুষ যে অবিনশ্বর ও দায়িত্বপূর্ণ জীব, তাহা ধারণা

করিবে ;—তাহা হইলেই তাহার স্বাভাবিক বলে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়া, অতি আশ্চর্য্যজনক ফল উৎপাদন করিবে। এ চিত্তরঞ্জন ও সর্ব্বকল্যাণদায়িনী চিন্তা যেন আমাদের মন হইতে কখনও বিচ্যুত না হয়।

পার্থিবদেহ সম্বন্ধেও সবিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনুশাসক যথার্থই বলিয়াছেন,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

বাস্তবিকই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার জন্য শরীরই প্রথম যন্ত্র,—আবার শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই সর্ব্বপ্রধান ; যেহেতু শারীরিক সমক্ষেত্রের কার্য্যকরণ জন্য মস্তিষ্কই স্বার্থ যন্ত্র। এই জন্য মস্তিষ্কই অতি উত্তম এবং কার্য্যক্ষমের নিয়মে রাখিতে হইলে 'আমিত্ব শাসন' করিতে হইবে এবং তাহার শুভফল মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া সমস্ত দেহে ব্যাপৃত হয় ও উহাতেই সমস্ত দেহ পবিত্রতার আধার হইয়া পড়ে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের নিদানভূত অকর্ত্তব্য সহবাস উত্তেজনা হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্ন উপায় অবলম্বন করা বিধেয় এবং তাহা হইলে দেহ সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

প্রথমতঃ আমরা যাহা আহার করি, সেই খাদ্যের উপরে উত্তমরূপেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঝাল (কটু), উত্তেজক এবং অতিশয় তৈলাক্ত (চর্ব্বিযুক্ত) খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। শরীরের পুষ্টির জন্য পরিষ্কৃত সহজপাচ্য টাট্‌কা খাদ্য যথোপযুক্ত পরিমাণে আহার করা বিধেয়। জান্তব মাংস ও মাদক দ্রব্য সেবন একান্ত অহিতকর। কারণ, তাহারা নিম্নস্তরের ক্ষুধা (কামাশক্তি) বৃদ্ধি করে এবং আত্মশাসনকে রক্ষা করা কঠিন করিয়া দেয়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে যাহাতে কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয়, তাহা করা উচিত।

কোষ্ঠ-পরিষ্কার না হইলে, পাকাশয় প্রভৃতির জড়তা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ম নিকটস্থ কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

প্রত্যহ পরিষ্কৃত মুক্ত বাতাসে নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে। এই নিয়ম সবিশেষ মনোযোগের সহিত সম্পাদন করা উচিত,—কারণ ইহাই বিশেষভাবে সহবাস ক্ষুধাকে বশীভূত রাখিতে এবং প্রতি প্রাতঃকালে নিয়মিত খোলসা দাস্ত করাইতে সাহায্য করিবে।

প্রতিদিন, বিশেষতঃ শয়ন করিবার সময় জনন-যন্ত্রকে শীতল জল দ্বারা বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করিবে। শয্যা যেন বিশেষভাবে পরিষ্কৃত রাখা হয়। শয্যা সাবশেষ কোমল হওয়া উচিত নহে। পরিমিত কঠিন শয্যায় শরীরকে অপেক্ষাকৃত উত্তম বিশ্রাম করান যায়, গাঢ় নিদ্রাও আগমন করে এবং কামচিন্তাকে দূরে রাখিয়া দেয়। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মস্তক শীতল জলে ধৌত করা অভ্যাস অতিশয় ভাল,—কারণ ইহাতে গাঢ় নিদ্রা আসিয়া থাকে। সকালে উপযুক্ত শীতল জলে স্নান দ্বারা এবং স্নানের পরে কর্কশ গামোছার ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মের কার্য্যোপযোগী ক্রিয়া রক্ষা করিবে।

দৈহিক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই যে, অসুস্থ সহবাস-অভিপ্রায় হইতে আত্মরক্ষা করা যাইবে, তাহা নহে। অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাদ্বারা নিজের মানসিক ও নৈতিক স্বভাবকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অলসতা এবং অজ্ঞতা আমাদের অতিশয় বলবান্ মন্দ শত্রু। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দ্বারা সর্ব্বসময়ে উপকারজনক কার্য্যে ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকিয়া মনকে পবিত্র রাখিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত যেন আলস্যে অতিবাহিত না হয়; সমস্তদিবস ব্যাপৃত থাকিবার জন্ম যথেষ্ট কর্ম্ম তোমার হাতে থাকিবে,—সেই সমস্ত কর্ম্ম এরূপ হওয়া চাই, যেন তাহারা তোমার মন এবং দেহকে অতিশয় ক্লান্ত করে। এই পার্থিব জীবন অল্পকাল স্থায়ী এবং কর্ম্ম করিবার জন্ম সংস্কারগুলি

এত বড় দীর্ঘ তালিকা লইয়া বসিয়াছে যে, পীড়াজনক কামাশক্তির জন্ত তুমি কদাচিৎ একমুহূর্ত্ত সময় দিতে না পার। মানুষ ক্রীড়ার পুত্তলী নহে,—এবং পাশবিক ক্রীড়া ও আমোদে যে ব্যক্তি জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে, সে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে। নিজের জন্ত—নিজের বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্ত এমন কি পৃথিবীর জন্ত—সামান্ত সীমাবিশিষ্ট সময়ের জীবনে তোমাকে অত্যধিক কার্য্য করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে যে, অধিক কার্য্য করিলে মানুষ ক্ষয় হইয়া যায় না; কিন্তু আলস্তই অধিক ধ্বংসের কার্য্য করিয়া থাকে।

কোন কার্য্য করা বা কোন বস্তু দুষ্প্রাপ্য বা ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে, তাহার জন্ত নিজকে চিন্তাগ্রস্থ করা নিতান্ত অন্তায় এবং আয়ু ক্ষয় করিবার তাহাই একটি প্রধান অস্ত্র। যখন যে কার্য্য হস্তে থাকে; তখন তাহার জন্ত যথাশক্তি মনোযোগ কর,—তারপরে নিজের জ্ঞান ও শক্তি-অনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তাহার জন্ত আর চিন্তা করিবে না।

আর একটি স্বর্ণ-নিয়ম অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। সেই নিয়মই সকলকে অসীম মানসিক বিশ্রাম প্রদান করিয়া থাকে। মানবের দ্বিতীয় শত্রু অজ্ঞতাকে দূরীকৃত করিতে হইবে। তদর্থে বিনয়ী হইবে এবং মনের প্রত্যেক অংশকে নূতন নূতন উপদেশ লাভের উপযুক্ত রাখিলে, অনায়াসে অজ্ঞতারূপ শত্রুকে বশীভূত করিতে পারিবে। জ্ঞানের জন্ত জ্ঞানলাভের দৃঢ় এবং গভীর পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিবে। নিজের কথোপকথন আমোদ-প্রমোদ এরূপ হইবে, যেন তাহাতে জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধি করে। নীচপ্রকৃতি লোকদিগের সহিত চপল সদর্থশূন্ত কথোপকথন এবং লোক-নিন্দা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিকৃষ্ট-চিন্তা কিংবা অভদ্র ভাষা ব্যবহার কখনই করিতে নাই,—চিন্তাই কর্ম্মের জনক। মানবের প্রিয় এবং

উচ্চ আশা ব্যয় করিয়া,নীচ আনন্দ ক্রয় করা কখনই উচিত নহে। সর্ব্বদা—যতদূর পারা যায়, ভাল লেখকের উচ্চ চিন্তা সকল পাঠ করিবে এবং তাহা হইতেই প্রত্যাদেশ সকল গ্রহণ করিবে। কখনই ধর্ম্ম এবং নীতিবিষয়ে উপহাস করিবে না,—কারণ, তাহা করিলে পবিত্র বস্তুর অপব্যয় করা হয়। চিন্তা বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা কখনই সাধুতা, ধর্ম্ম এবং সত্যপথ হইতে বিচলিত হইবে না। তোমার নিজের এবং তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রতি সমভাবে লক্ষ্য করিয়া, গৃহস্থলী এবং জনহিতৈষণা কার্য্যে চিত্তস্থাপন-পূর্ব্বক চালিত হও,— নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তোমার আর কাম-পীড়ার যন্ত্রণার অস্তিত্ব থাকিবে না।

আমি যে কথাগুলি বলিলাম,—তাহাতে আস্থা স্থাপন না করিলে, মনুষ্য নামের বাহিরে গিয়া পড়িতে হয়। স্ত্রীলোকের উপরে যে ভালবাসা লইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিকে জাগাইয়া বসা হয়,— সে ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইতে হয়। কেননা, কামকলুষিত জীবনে ছাগ-ছাগীর রমণে ভালবাসা কোথায়? পবিত্র দাম্পত্য জীবন ধর্ম্মময়,—প্রেমময়—আনন্দ-ময়। এ পবিত্রতা—এ স্বর্গীয়ভাব পবিত্র দম্পতীই লাভ করিতে পারে, নচেৎ যাহারা অপব্যবহার করে, তাহারা কখনই প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিবাহই ব্রহ্মচর্য্যের আদি এবং মূলীভূত কারণ। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অতি পবিত্র এবং স্বাধীন। হিন্দু ঋষি বলিলেন,—

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থানাং যতীনাং নৈষ্ঠিকস্য চ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথৈবারণ্যবাসিনাম্ ॥

ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্॥
যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থাতে মৈথুনত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রতাচরণার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সংস্থিত, যাহারা নৈষ্ঠিক এবং যাহারা নিরন্তর বনবাসী, তাহাদিগের সকলের পক্ষেই এই একরূপ ব্রহ্মচর্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথাবিধানে ঋতুকালে যে নিজ ভার্য্যাতে গমন, তাহাই গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত।

তোমরা ব্রহ্মচারী হও এবং শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিয়া ব্রত রক্ষা কর;—দেখিবে, আবার সেই আয়ু, সেই বল, সেই স্বাস্থ্য, সেই আনন্দ, সেই জীবন আগমন করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ।

শিষ্য। যাহারা ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কি ঔষধ সেবন করা বিধেয়?

গুরু। আমি চিকিৎসক নহি; সুতরাং সে সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে, আমি অনেকগুলি ঐ পীড়াগ্রস্ত মানবের সহিত কথোপকথন করিয়াছি,—তাহাতে জানিতে পারিয়াছি, চিকিৎসায় ও ঔষধ প্রয়োগে এ রোগের বড় একটা কিছু হয় না। আমার বিশ্বাস, কোন উত্তেজক ঔষধ এ অবস্থায় সেবন

করা কখনই উচিত নহে। দুর্ব্বল অশ্বকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিলে, সে যেমন মরণের-পথেরই পথিক হয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীরও উত্তেজক ঔষধ সেবন তদ্রূপ অপকারী। প্রাগুক্ত বিধানে আত্মশাসন করিয়া তন্ত্রোক্ত দুই একটি ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চিতই সুফল ফলিবে।

শিষ্য। আপনি তন্ত্রোক্ত দুই একটি ঔষধের কথা এস্থলে বলিয়া দিন।

গুরু। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া এবং তান্ত্রিকগণের নিকট শ্রুত হইয়া, যে ঔষধগুলি ফলপ্রদ বলিয়া জানিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

অশ্বিন্যাং বটবন্দাকং ক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা মহাবলঃ।
পুষ্যোদ্ধৃতং পিবেন্মূলং শ্বেতাকস্য প্রযত্নতঃ॥
সপ্তরাত্রন্তু গোক্ষীরৈর্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

অশ্বিনী নক্ষত্রে বটবৃক্ষের পরগাছা সংগ্রহ করিয়া, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে পুরুষ মহাবলশালী হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়' গব্য-দুগ্ধে পেষণ করিবে,—সেই ঔষধ সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ পুরুষও যুবা হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদাঋক্ষে বিম্বীমূলং পিবেদ্‌বুধঃ।

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে তেলাকুচের মূল আহরণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণে জলের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহাতে পুরুষ মহাবলশালী হয়।

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ স্বরসেন তস্যা
বিভাবিতং ভাস্কররশ্মিজালৈঃ।
মধ্বাজ্যসম্মিশ্রিতমেব লীঢ্বা
দশ স্ত্রিয়ো গচ্ছতি নির্ব্বিশঙ্কঃ।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসদ্বারা রৌদ্রে ভাবনা দিয়া, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে, ইহাতে পুরুষ অধিক বলবান্ হয়।

> ভূয়ো বিভাব্যামলকস্য চূর্ণং
> রসেন তস্যৈব সিতাজ্যমিশ্রম্।
> সক্ষৌদ্রমালিহ্য নিশামুখে যো
> নূনং স বৃদ্ধস্তরুণত্বমেতি ॥

আমলকী চূর্ণ আমলকী স্বরস দ্বারা ভাবনা দিয়া শর্করা ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ঐ ঔষধ রাত্রির প্রথমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হইতে পারে।

> কর্ষপ্রমাণং মধুকস্য চূর্ণং
> ক্ষৌদ্রাজ্যসংমিশ্রিতমেব লীঢ্বা।
> ক্ষীরাপশ্চপানং রমতে তু তাবদ্-
> যাবন্নরাণামুদস্থরস্থমেতৎ ॥

যষ্টিমধুর চূর্ণ দুই তোলা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে, পুরুষ অধিক বলশালী হয়।

> সিতপিকতরুবীজং তণ্ডুলা যষ্টিকানাং,
> সঘৃতমধুসমেতং প্রত্যহং যোঽবলেঢ়ি।
> জঠরকুহরমধ্যে যাতি পাকং ন যাবৎ,
> রময়তি কৃশদেহোঽপ্যঙ্গনানাং সমূহম্ ॥

শ্বেতবর্ণ কুলিয়াখাড়ার বীজ ও ষাইটা ধান্যের তণ্ডুল, ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে ॥ যাবৎ কাল উদরমধ্যে এই ঔষধ পরিপাক না হয়, তাবৎ কাল কৃশ ব্যক্তি ও অধিক বলবানের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া পিবেৎ।

এতৎ-প্রয়োগাৎ সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽশুদ্ধিঃ॥

অতি প্রাচীন শাল্মলিবৃক্ষের মূলের রস শর্করার সহিত পান করিলে মনুষ্যের শরীরে অধিক বল জন্মে।

লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্।

সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ভবেৎ॥

তরুণ শাল্মলিবৃক্ষের মূল ও তালমূলী চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে, মনুষ্যের শরীরে অধিক বীর্য্য হয়।

বিদারীফলকন্দস্য ঘৃতেন পয়সা নরঃ।

ঔড়ুম্বরসমং খাদেদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের ফল ও মূল চূর্ণ করিয়া দুইতোলা পরিমাণে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তি ও যুবার ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বাস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।

সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥

পিপ্পলী ও সৈন্ধব লবণের সহিত ছাগমাংস, ঘৃত ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে মনুষ্য বলবান্ হয়।

বস্তাম্বুসিদ্ধান্ পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্।

যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥

ছাগদুগ্ধে বার বার তিল ভাব্না দিয়া সেই তিল ভক্ষণ করিলে পুরুষের শুক্র বৃদ্ধি হয়।

শ্রীমদনমোদক।

সিদ্ধিপত্র ও সিদ্ধিবীজ ঘৃতে ভাজিয়া লইবে এবং ত্রিকুট, ত্রিফলা, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধব, ধনিয়া, শুণ্ঠী, তালিশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর,

জীরা, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, কৃষ্ণজীরা, তেজপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। সর্ব্বচূর্ণ সমান শর্করা মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক করিবে। তৎপরে ঘৃতে তিল ভাজিয়া তাহার চূর্ণ এই মোদকের উপরি দিবে। পরে দারুচিনি, এলাচি এবং তেজ পত্র চূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা মোদক সুগন্ধি করিয়া লইতে হইবে। এই মোদক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইহার একটী করিয়া মোদক ভক্ষণ করিবে। পরিমাণে এক আনা। এই মোদক ভক্ষণে বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ নাশ হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং কৃশ ব্যক্তির শরীর পুষ্ট ও রুক্ষ ব্যক্তির শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং কাস, সর্ব্বপ্রকার শূল, মেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য ও আমবাত নিবারণ হয়। মাত্রা সহ্যমত কমও করিতে হয়।

বি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড ব্রাদার্দের 'সোমরস' স্নায়ু-পীড়া, মেহধাতু-দৌর্ব্বল্যের পরীক্ষিত মহৌষধ। ধাতুদৌর্ব্বল্যরোগে যাঁহারা জীর্ণ-দীর্ণ হইয়া এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, 'সোমরস" সেবন করিয়াই তাঁহারা আরোগ্য হইয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডোর কৌপীন।

গুরু। এইবার তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার তৃতীয় স্তরের কথা বলিব। এগুলি সমস্ত যোগাঙ্গ; হৃতবীর্য্য ব্যক্তিগণের পক্ষে এগুলি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। হৃতবীর্য্য ও ব্রহ্মচারী এ গুলির আচরণে সমধিক ফল পাইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে কৌপীন পরিধান অত্যন্ত উপকারী। এই জন্যই বোধ হয়, নিবৃত্তিমার্গের সাধক বৈষ্ণবগণ ডোর-কৌপীন পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কৌপীন পরিধান করিয়া তদুপরি দেশাচার সম্মত দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করিবে।

অনতিপ্রসর একখণ্ড বস্ত্র কৌপীনরূপে ব্যহার করিবে। ঐ বস্ত্রখণ্ড কটিদেশ হইতে টানিয়া জননেন্দ্রিয়ের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ইহাতে শিরা সমুদয় স্থিরভাবে থাকে এবং তাহাদের উত্তেজনা হইতে পারে না।

অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রস্থ এবং সার্দ্ধ দুই হস্ত পরিমিত দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডে কৌপীন প্রস্তুত করিবে। তৎপরে কোমল সূত্রগুচ্ছ দ্বারা একগাছি ডোর প্রস্তুত করিবে। ডোরগাছটি কোমরে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া তাহার মধ্যভাগে কৌপীনের অগ্রভাগ বন্ধন করিবে, এবং পশ্চাদ্দিকে কৌপীন

লম্বমান রাখিয়া নাভিমূলের নিম্নে এবং লিঙ্গমূলের কিছু উপরে ডোর বাঁধিবে, তৎপরে গুহ্যদেশের নিম্ন দিয়া কৌপীন সম্মুখে আনিবে এবং অণ্ডদ্বয়কে নিম্নে দোলায়মান অবস্থায় ও লিঙ্গকে ঊর্দ্ধভাবে স্থাপিত করিয়া ডোরের মধ্য দিয়া কৌপীন ঊর্দ্ধদিকে লইয়া পুনরায় গুহ্যদেশের নিম্ন দিয়া লইয়া পশ্চাদ্দিকে ডোরের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। কৌপীন ধারণ অসুবিধাজনক হইলে 'ল্যাঙ্গেট' ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পরিধান-প্রণালী ঐরূপভাবে অবলম্বন করিবে।

কৌপীন বস্ত্র কদাচ ভিজা ব্যবহার করিতে নাই। শুষ্ক ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। যদি দৈবাৎ স্বপ্নদোষ আদি হয়, তবে কৌপীন খুলিয়া গোময় দ্বারা অথবা সাবান দ্বারা কিংবা রজক দ্বারা ধৌত করিয়া তবে পরিধান করিবে এবং সে দিবস নূতন কৌপীন ব্যবহার করিবে।

প্রত্যেক রাত্রি শয়নকালে দিবসের পরিধেয় কৌপীন খুলিয়া ফেলিয়া শীতলজলে উদর হইতে নিম্নাঙ্গ ধৌত করিয়া ফেলিবে,—তৎপরে আর একখানি ধৌত বস্ত্রখণ্ড বা কৌপীন উত্তমরূপে ও দৃঢ়ভাবে পরিধান করিয়া শয়ন করিবে।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবানিদ্রা অত্যন্ত অবিধেয়। কদাচ দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না।

রাত্রিকালে শয়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে,—ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক ভগবানের রূপ-লীলা প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। শয়ন করিয়া কখনই স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করিবে না। যদি ভগবানে অধিকক্ষণ চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া রাখিতে না পারা-যায়, তবে স্নেহময় পুত্রকন্যাগুলির কথা চিন্তা করিবে এবং কিসে তাহাদের সুন্দররূপে শিক্ষা দীক্ষা হইবে, কিসে তাহাদের স্বাস্থ্য-সুস্থ ও আনন্দ বজায় থাকিবে, তদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিবে। স্নেহ, কামের বিপরীত বৃত্তি,—স্নেহের উদয়ে কামরিপুর

দমন হয়। অতএব কামরিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্নেহ-বৃত্তির উত্থাপন করা বিধেয়।

সন্তান না হইলে দেশের হিতকর কথা আলোচনা করা উচিত। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া স্বদেশের হিতচিন্তা করা সকলেরই বিধেয়। যে দেশের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে, যে দেশের জলবায়ুতে নিত্য পুষ্ট হওয়া যাইতেছে,—সে দেশের উন্নতি চিন্তা না করিলে অবশ্যই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। একটি মানব জন্মগ্রহণ করিলে দেশের এবং দশের কত আনন্দ সমুপস্থিত হইয়া থাকে,—সেই মানব যদি দশের এবং দেশের কোন কার্য্য না করিয়া মৃত্যু-পথের পথিক হয়, তবে তাহার না জন্মানই ভাল ছিল। অধিকন্তু দেশের হিতকামনায় চিত্ত অর্পণ করিলে, কামাদি নিকৃষ্ট রিপু কোন মতে আক্রমন করিতে পারে না।

শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচারীই দেশের মঙ্গল সাধক। যে ধৃতবীর্য্য, সে উদ্যম ও উৎসাহশীল। উদ্যম ও উৎসাহশীল ব্যক্তি ব্যতিরেকে কখনই স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের উন্নতিকল্পে চিত্ত ও দেহ সমর্পণ করিতে পারে না।

কাম দমনের অন্য আর একটি উপায় আছে,—তাহা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-ধারীর অবশ্য শিক্ষণীয়। উপায়টি এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

নিতান্ত নিরভিমান হইয়া, অন্তঃকরণে পরোপকার বৃত্তির শুভ ভার সংস্থাপন করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ, কীর্ত্তন ও পূজাদি করিলে কাম বারণ হইয়া থাকে। কাম নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় প্রেম, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কাম নিবারণ করিয়া প্রেম-উপার্জ্জনের নিম্নপ্রকার উপায় বর্ণিত হইয়াছে,—

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপচয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপরামরায়॥

উত্তম হৈঞা আপনাকে মান তৃণাধম।
দুই প্রকারের সহিষ্ণুতা কর বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহি মানবেরে করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হৈঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তা'র প্রেম উপচয় ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ শঃ পঃ।

এইরূপে ভগবানের নাম লইলে কাম রিপুর দমন হয় এবং প্রেমের উদয় হওয়ায় চিত্ত আনন্দময় হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভগবানের নাম এইরূপেই করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আসন।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, যোগাঙ্গদ্বারা যেরূপে কাম দমন হয় তাহা বলিবেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। না, আমি অন্য কথার অবতারণা বা আলোচনা করি নাই,

যাহা বলিলাম, উহাও যোগাঙ্গ ;—অতঃপর আরও বলিতেছি। এইবার আসনের কথা বলিব। ব্রহ্মচারীর পক্ষে কুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদমতে কুশ, বায়ু, পিত্ত, ও কফনাশক ;—মধুর, এবং স্নিগ্ধকর। দীর্ঘকাল উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক উচ্চতর এবং মহত্তর বিষয়ে চিন্তা করিলে, দৈহিক রোগ উপস্থিত হইতে পারে ;—যোগিগণের মতে কুশাশন, তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে, অথবা সে সকল উপস্থিতই হইতে পারে না। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ এবং প্রদরাদি পীড়া আরোগ্য হয়। আসনের পরিমাণ দীর্ঘে দুইহাত ও প্রস্থে দেড়হাত হইবে। কুশাশন সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়,—নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে, অন্য আসন গ্রহণ করিবে ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় চর্ম্মাসন বা কম্বলাসন ব্যবহার করিতে নাই। সতরঞ্চ, কার্পেট বা মাদুরের আসন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

যোগশাস্ত্রমতে হস্তপদাদির ক্রিয়া-কৌশল দ্বারা আসন করা হয়। ঐরূপ আসনের কতকগুলি অভ্যাস ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পক্ষে সহায়তা করে। কতকগুলির অভ্যাসে শুক্রক্ষরণ নিবারিত হয় ; কতকগুলির অভ্যাসে শরীর কষ্টসহিষ্ণু, নিরাময় হয় এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঐরূপ আসনের অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে গুলি অভ্যাস করিলে আশু উপকার হয় ;—এস্থলে তাহাই বলিতেছি। দিবসের মধ্যে প্রাতঃকালে একবার অন্ততঃ আধঘণ্টাকাল এবং রাত্রির মধ্যাবস্থায় অন্ততঃ একঘণ্টা কাল, প্রয়োজনবোধে দুই একটি আসনের অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। প্রয়োজনবোধে, এস্থলে কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যাহার যেরূপ অসুখ, যাহার যে বিষয় প্রয়োজন, তাহার তদনুরূপ আসনের অভ্যাস ও অনুষ্ঠান করা উচিত। সকলেরই কিছু একই একই প্রকার অসুখ বা আবশ্যক নহে,—তাই প্রয়োজনবোধে বলিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারীর প্রয়োজনীয় সাধারণতঃ কতকগুলি আসনের কথা এস্থলে বলিতেছি।

শরীর কম্পিত না হয়, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোন প্রকার উদ্বেগ না জন্মে; বা চিত্ত চঞ্চল না হয়,—এই প্রকার ভাবে উপবেশনের নাম আসন। ইহা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথম অভ্যাসের সময়ে একটু অসুবিধা ও কষ্ট অনুভূত হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে, ইহা দ্বারা আনন্দলাভ হইয়া থাকে। অভ্যাস করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, ঐরূপ আসন করিলে, মনে একপ্রকার আনন্দের উদয় হইতেছে, তখনই জানিবে যে, আসন করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আসন করিলে যখন সুখজনক ভাব আসিবে, তখনই তাহা উপকারী হইবে,—নতুবা নহে।

আসন অভ্যাস করিতে হইলে, গুরুর নিকটে একবার দেখাইয়া লওয়া ভাল। কারণ, উহার সামান্য ব্যতিক্রমেও সুখলাভ করিতে পারা যায় না।

শিষ্য। উপদেশে যতদূর হইতে পারে, সেই প্রকারে আপনি বলুন।

গুরু। আসন বহু প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রহ্মচারীর যেগুলির প্রয়োজন, সেইগুলিরই উল্লেখ এস্থলে করিতেছি।

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহম্॥
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকম্॥

শিবসংহিতা, ৩য় পটল।

যোগশাস্ত্রে চৌরাশি প্রকার আসনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরমযোগী মহাদেব বলিতেছেন,—তাহার মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন—এই চারিপ্রকার আসনের কথা আমি বলিব।

সিদ্ধাসন,—

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেদ্ যোগবিৎ সদা॥
ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্॥

শিবসংহিতা, ৩য় পটল

গুহ্যদ্বারের উপরে ও জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে ঠিক মাঝামাঝি স্থানে যোনিমণ্ডল আছে; এক পায়ের গোড়ালী (গুড়মুড়া) দ্বারা ঐ যোনি প্রদেশ নিপীড়ন করিবে, অর্থাৎ চাপিয়া রাখিবে, এবং অপর পায়ের গোড়ালী দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উপর (ঠিক গোড়ায়) চাপিয়া রাখিবে। তৎপরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইযা ভ্রূমধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। শরীরটি অবক্র অবস্থায় রাখিতে হইবে, হেলিয়া ঢুলিয়া বা কোনস্থানে বাকান ভাবে থাকিবে না এবং মানসিক উদ্বেগাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে,—ইহা সিদ্ধিলাভের পক্ষে সহজ ও সরল আসন।

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিস্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ সুখম্॥

সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে অতিশীঘ্র যোগ নিষ্পত্তি লাভ হয়। প্রাণায়াম করিতে হইলে, এই সিদ্ধাসনই প্রশস্ত। সিদ্ধাসন করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, তাহাতে খুব শীঘ্রই ফললাভ করা যাইতে পারে।

তাহার কারণ এই যে, লিঙ্গমূলে জীব ও কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। সিদ্ধাসনের দ্বারা বায়ুর পথ সরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের তড়িৎশক্তি চলাচলের সুবিধা হয়।

পদ্মাসন—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেচ্ছ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্তি সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্তি ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।

শিবসংহিতা, ৩য় পটল।

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিবে, তারপর দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ ও দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া রাখিবে। অতঃপর নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিবে ও দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে। আর চিবুক এবং বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি বায়ু অল্পে অল্পে পূরণ পূর্ব্বক অবিরোধে যথাশক্তি ধারণ করিয়া পশ্চাৎ যথাশক্তি রেচন করিবে। এই পদ্মাসন,—ইহাতে শরীরের ব্যাধিসমুদয় বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ জড়তা, আলস্য, নিদ্রালুতা প্রভৃতি যোগবিঘ্নকর ব্যাধি দূরীভূত হয়।

শিষ্য। কয়েকটী বিষয় জানিবার আছে।

গুরু। কি কি?

শিষ্য। একে একে বলিতেছি। চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া

অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিতে হইবে,—কোথা দিয়া বায়ু পূরণ করিতে হইবে?

গুরু। নাসিকা দ্বারা।

শিষ্য। অবিরোধে যথাশক্তি ধারণের অর্থ কি?

গুরু। যাহাতে কষ্ট না হয়, যখন যতটুকু শক্তি, তখন ততটুকু সময়ের জন্য ধারণা করিতে হইবে।

শিষ্য। বায়ুর ধারণা অর্থে বোধ হয় কুম্ভক?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। হাত দুইখানি, ঐ সময় বদ্ধ থাকিবে, নাসিকারন্ধ্র ধারণ করিবার কোন উপায় থাকিবে না?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে উহা নিষ্পন্ন হইবে কি প্রকারে?

গুরু। অভ্যাস বশতঃ হস্তদ্বারা নাসিকাপুট না ধরিয়াও রেচক পূরক, কুম্ভক হইতে পারে। তুমি একবার নিশ্বাস টান দেখি,—দুই মিনিট ধরিয়া টান।

শিষ্য। এই টানিলাম।

গুরু। নিশ্বাস ছাড়িও না,—বায়ুটুকু বুকের মধ্যে লও, যতটুকু থাকিতে পার, থাক; তার পরে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দাও।

শিষ্য। হাঁ,- এইত প্রায় তিন মিনিট কুম্ভক করিয়াছিলাম।

গুরু। অভ্যাসে তিন ঘণ্টা,—অবশেষে তিন দিনও থাকিতে পারিবে।

শিষ্য। পদ্মাসন করিলে নিদ্রা, আলস্য, জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি ও ব্যাধি দূরীভূত হয়,—কি প্রকারে এবং কেন?

গুরু। যে প্রকার ভাবে দেহাদিকে রাখা হয়, তাহাতে দূষিত বায়ু

বাহিরে যাইতে ও বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে আসিতে অত্যন্ত সুবিধা পায়। তৎপরে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করায়, ঐ কার্য্য আরও সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে। মানুষ জলে ডুবিলে তাহার শরীরস্থ জল বাহির করিতে ও শীঘ্র চৈতন্য উৎপাদন করিতে এই আসন বড় উপকারী। কেবল অচৈতন্য বা নিশ্বাস বন্ধ হইলে, তাহার মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দিতে হয়, আর রোগীর হাত দুইখানি একবার উঁচু ও একবার নিচু করিতে হয়, তাহাতে ঐরূপ পূরক, রেচক ও কুম্ভকের কাজ হয়।

ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রমাণের বলে তুমি বুঝিয়া লইতে পার, আমাদের দেহ হইতেও ঐরূপ যে ভূতের আধিক্য হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত ও নির্ম্মুক্ত এবং বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের জড়তাদি দূরীভূত করিয়া দিতে সক্ষম হয়।

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ॥

পূর্ব্বকথিত পদ্মাসনের অনুষ্ঠানে প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ী ছিদ্রে চলিতে থাকে,—ইহাতে সাধকের পরম হিত সাধিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ॥

পদ্মাসনস্থ যোগী যথাবিধানে প্রাণ ও অপান বায়ুর পূরণ রেচনাদি করিতে সক্ষম হয়েন এবং শুভ ও অশুভ সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

উগ্রাসন,—

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতম্।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরো ন্যসেৎ॥

আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনম্।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকম্॥
য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবম্॥

শিবসংহিতা, ৩য় পটল।

উভয় চরণ প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে রাখিবে। তারপরে উভয় হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ঐ উভয় পদ ধারণ করিয়া জানুর উপরে নিজের মস্তক স্থাপন করিবে। ইহা বায়ুর উদ্দীপক,—এই জন্য ইহার নাম উগ্রাসন। শরীরের সমস্ত প্রকার অবসাদ নিবারণ করে। উপুর হইয়া সাধনা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পশ্চিমোত্তান। যে সাধক এই শ্রেষ্ঠাসনের নিত্য অভ্যাস করে, তাহার পশ্চিম পথে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥

পূর্ব্বকথিত প্রকারে উগ্রাসন করিয়া, তাহাতে অভ্যাসশীল হইলে, সাধকের সমস্ত যোগে সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অতএব যত্নের সহিত এই আসনের অভ্যাস করা বিধেয়।

স্বস্তিকাসন,—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

শিবসংহিতা, ৩য় পটল।

জানু ও উরু উভয়ের মধ্যস্থলে পাদতলদ্বয়কে সম্যক্ প্রকারে সংস্থাপন পূর্ব্বক সমকায়বিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবেশন করিবে। ইহাকেই স্বস্তিকাসন বলে।

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্য বায়ুশ্চ সিধ্যতি॥

প্রাগুক্ত-বিধানে আসন করিয়া বায়ু সাধন করিলে, এই স্বস্তিকাসনের প্রভাবে সাধক অল্প সময়ের মধ্যেই বায়ু সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন এবং বায়ুসাধন জনিত ব্যভিচারেও কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

শিষ্য। আপনি যে চারিপ্রকার আসনের কথা বলিলেন, এতদ্ভিন্ন হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মে আরও অনেক প্রকার আসনের নাম উল্লেখ আছে। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিতে হইলে, তাহাও জানা উচিত। অনুগ্রহ করিয়া যেগুলি সর্ব্বদা প্রয়োজন, এমন কতকগুলি আসনের কথা আমাকে উপদেশ দিন।

গুরু। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আসন চৌরাশী প্রকার আছে, যাহা হউক, তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কয়েকটি আসনের বিষয় জানিতে চাহিতেছ, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর

বীরাসন,—

একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতীরিতম্॥

ঘেরণ্ডসংহিতা, দ্বিতীয়োপদেশ।

একটী উরুর উপর একটি পা রাখিয়া অপর পা পশ্চাৎ দিকে রাখিলেই তাহাকে বীরাসন বলে।

মণ্ডুকাসন,—

পাদতলৌ পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠে দ্বে চ সংস্পৃশেৎ।
জানুযুগ্মং পুরস্কৃত্য সাধয়েন্মণ্ডুকাসনম্॥

দুই পদতল পৃষ্ঠ দেশে গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিবে ও উভয় জানু সম্মুখভাগে রাখিবে,—ইহাকে মণ্ডুকাসন বলে।

কূর্ম্মাসন,—

গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতৌ।
ঋজুকায়শিরোগ্রীবং কূর্ম্মাসনমিতীরিতম্॥

অণ্ডকোষের নিম্নে দুই গুল্ফ পরস্পর বিপরীত ক্রমে রাখিয়া গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল করিয়া উপবিষ্ট হইবে,—তাহাকে কূর্ম্মাসন বলে।

কুক্কুটাসন,—

পদ্মাসনং সমাসাদ্য জানূর্ব্বোরন্তরে করৌ।
কূর্পরাভ্যাং সমাসীনো মঞ্চস্থঃ কুক্কুটাসনম্॥

কোন মঞ্চের উপরে মুক্ত পদ্মাসন করিয়া উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক দুই কূর্পর অর্থাৎ কনুইয়ের দ্বারা উপবিষ্ট হইবে,—ইহার নাম কুক্কুটাসন।

যোগাসন,—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা সংস্থাপ্য জানুনোপরি॥
আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুগ্মকম্॥
পূরকৈর্ব্বায়ুমাকৃষ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
যোগাসনং ভবেদেতদ্ যোগিনাং যোগসাধনে॥

উভয় চরণ চিৎ করিয়া হাঁটুর উপরে সংস্থাপন পূর্ব্বক দুই হস্ত চিৎ করিয়া ঐ আসনের উপরে রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক করণ পূর্ব্বক নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে,—ইহার নাম যোগাসন।

গুপ্তাসন,—

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃত্বা পাদৌ চ গোপয়েৎ।
পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুহ্যং গুপ্তাসনং বিদুঃ॥

উভয় জানুর (হাঁটুর) মধ্যে উভয় চরণ অতি গোপন করিয়া রাখিবে এবং উভয় পদের উপরে গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে,—ইহাকে গুপ্তাসন বলে।

শবাসন,—

উত্তানশববদ্ভূমৌ শয়নন্তু শবাসনম্।
শবাসনং শ্রমহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারকম্॥

শবের মত চিৎ হইয়া মাটিতে শয়ন করিলেই শবাসন হয়। এই আসন দ্বারা শ্রম দূর হয় ও চিত্তের বিশ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার অন্য নাম মৃতাসন।

সিংহাসন,—

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণোর্দ্ধাতাং গতঃ।
চিতিমূলো ভূমিসংস্থঃ কৃত্বা চ জানুনোপরি॥
ব্যক্তবক্ত্রো জলন্ধরঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

উভয় গুল্‌ফ অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঊর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে এবং উভয় জানু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক জলন্ধরবন্ধ অবলম্বন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। ইহার নাম সিংহাসন; ইহার দ্বারা সকল রোগের নাশ হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে, এই আসনের অনুষ্ঠান মঙ্গলজনক।

শিষ্য। আপনি যতগুলি আসন পূর্ব্বে বলিয়াছেন অর্থাৎ, সিদ্ধাসন,

পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন,—এই চারি প্রকার আসনই কি প্রত্যেক ব্রহ্মচারী ব্যক্তিকে শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হইবে?

গুরু। না। উহার মধ্যে যে কোন একটি আসন অভ্যাস করিয়া, সেইরূপে বসিয়া উচ্চতর চিন্তা ও মহত্তর কার্য্য করিলেই হইবে। সকল গুলি শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তবে যাঁহারা গৃহত্যাগী যোগী,—তাঁহারা বহুপ্রকার আসনই অভ্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সকলগুলি অভ্যাসের প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। উচ্চতর চিন্তা ও মহত্তর কার্য্য কি?

গুরু। ভগবানের চিন্তা ও শারীরিক এবং মানসিক শক্তি-বর্দ্ধনের জন্য প্রাণায়ামাদি মহত্তর কার্য্য সাধন।

শিষ্য। আসন অভ্যাস না করিয়া প্রণায়ামাদি করিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হয় না?

গুরু। সুবিধা হয় না। আসনসিদ্ধি এমন কঠিনও ত কিছু নহে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। এই চারি প্রকার আসনের মধ্যে যাঁহার যে প্রকার সুবিধা, তিনি সেই প্রকার আসন অভ্যাস করিতে পারেন,—তাহাতে কোন বিঘ্ন বা হানি নাই।

শিষ্য। আসন অভ্যাস করিলে কি উপকার হইয়া থাকে?

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইলে, কি শারীরিক কি মানসিক উভয়ের গতি যে প্রকারে হইতেছে, তাহার বিপরীতকরণ করা আবশ্যক। স্নায়ুসমূহের মধ্যে যে শক্তি প্রবাহ রাত্রিদিন প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রবাহ বা গতি ফিরাইয়া, অপর এক নূতন পথে তাহাদের গতিকে পরিচালিত করিতে হইবে; কাজেই এই বিপরীত গতিতে শরীরের মধ্যে নূতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়ারম্ভ হইবে; এই কারণেই ব্রহ্মচারীর শরীর নূতন প্রকারে গঠিত হইয়া থাকে।

দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা স্নায়ুপ্রবাহ নূতন প্রবাহে ও নূতন পথে চালিত হয়, তাহা মেরুদণ্ডের মধ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদণ্ড যে ভাবে ও যে অবস্থায় রাখিলে, ঐ ক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই আসন প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মেরুদণ্ড বল, বক্ষোদেশ বল, গ্রীবা, মস্তক বা পঞ্জরাস্থিই বল, আসনের দ্বারা সকলগুলি যে ভাবে রাখা আবশ্যক, তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত আসন চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন একটি আসন নির্ব্বাচন করিয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে যেমন কোন ফল দর্শন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে কিনা জানা যায়;—আসন অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিলে, সে প্রকার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না?

গুরু। হাঁ পায় বৈ কি।

শিষ্য। কি হইয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। আসন সিদ্ধি হইলে, আসন করিয়া বসিলেই মনে একরূপ অননুভূত আনন্দের উদয় হয়। আরও,—

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।

"আসন জয় হইলে, দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগল পদার্থের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। আসন সিদ্ধি হইলে তখন এমন এক সহ্য-শক্তি জন্মিয়া থাকে যে, তাহা অন্য কোন প্রকারে জন্মিতে পারে না। আসনসিদ্ধি হইলে ঐ মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; তখন শীত এবং গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সমস্তই সহ্য করিবার শক্তি আসিবে। সে শক্তি এরূপ যে, জোর করিয়া রৌদ্রে বসিয়া থাকিলে যে শক্তি বলা যায়, তাহা সে প্রকার নহে। ব্রহ্মচারীর নিকটে তখন ছায়া ও রৌদ্র সমান জ্ঞান হয়। ভোজন ও উপবাস একই রূপ বোধ হইয়া থাকে।

শিষ্য। ব্রহ্মচারীর প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিতে হয় কেন?

গুরু। কামরিপুর প্রবল গ্রাস হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে, প্রাণায়ামাদির সাধন করা একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয়দিগকে স্ববশে রাখিতে হইলে, শক্তিকে বশীভূত করিতে হয়; প্রাণায়ামাদি দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, যোগশিক্ষাতেই প্রাণায়ামাদির প্রয়োজন।

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ—ব্রহ্মচর্য্যও যোগ। যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ, ব্রহ্মচর্য্যও চিত্তবৃত্তির নিরোধ;—সে কথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি। অতএব যোগ আর ব্রহ্মচর্য্য পৃথক ভাবিও না, ব্রহ্মচর্য্যও যোগান্তর্গত। পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি যোগশাস্ত্রেও সে কথার উল্লেখ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুদ্রাবন্ধন।

গুরু। ব্রহ্মচারীর পক্ষে মুদ্রাবন্ধন অতিশয় হিতকর। মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অনুরূপ। দেহস্থিত বায়ু প্রভৃতিকে শরীরের সঙ্কোচন-বিকোচনের দ্বারা ইচ্ছামত পরিচালনা করাকে মুদ্রা বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মুদ্রাবন্ধনের দ্বারা শুক্র ধাতুকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করা যায়,—ইহাদ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন হয়;—মুদ্রাবন্ধনের কৌশলে উপস্থ-পর্ব্ব হইতে শুক্রধাতু মেরুদণ্ডের পথ দিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। সেই জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে মুদ্রা অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

শিষ্য। মুদ্রা কতপ্রকার?

গুরু। মুদ্রা বহু প্রকার,—ব্রহ্মচারীর যে যে মুদ্রা শিক্ষা করা প্রয়োজন, আমি তোমাকে এস্থলে তাহাই বলিয়া দিব।

শিষ্য। আপনি যেগুলি বলিবেন, প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে কি সে সমস্ত-গুলিই শিক্ষা করিতে হইবে ?

গুরু। যে যতগুলি শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে পারিবে, সে সেইমতই ফল পাইবে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে মুদ্রার কথা বলুন।

গুরু। আমি তোমার নিকট এস্থলে যে কয়টি মুদ্রার কথা বলিব, তন্মধ্যে কয়েকটি প্রাণায়ামাদি সাধন জন্য প্রয়োজন এবং অপর কয়টি শুক্রধারণ-ক্ষমতা লাভের জন্য প্রয়োজন।

মহামুদ্রা,—

> পাদমূলেন বামেন যোনিং সংপীড্য দক্ষিণম্।
> পাদং প্রসারিতং কৃত্বা করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ম্॥
> কণ্ঠে বক্ত্রং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ুমূর্দ্ধতঃ।
> যথা দণ্ডাহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে॥
> ঋজ্বীভূতা তথা শক্তিঃ কুণ্ডলী সহসা ভবেৎ॥
> তদা সা মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটাশ্রিতা।
> অতঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েত্তং ন বেগতঃ॥

বাম পায়ের গোড়ালি দ্বারা যোনিদেশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দক্ষিণ পা ঠিক সরল ও সোজাভাবে ছড়াইয়া দিবে। তারপরে ঐ দক্ষিণ পা দুই হাত দিয়া সজোরে ধরিয়া রাখিবে এবং কণ্ঠে মুখ স্থাপিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিবে। পরে প্রাণায়ামের প্রণালীক্রমে ধীরে ধীরে ঐ বায়ু রেচন করিবে। এইরূপ করিলে মহামুদ্রা করা হইল। দণ্ড দ্বারা আহত

হইলে সর্প যেমন দণ্ডের ন্যায় সরল আকার ধারণ করে, তেমনি এই মহামুদ্রা দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি ঋজুভাব ধারণ করে।

শিষ্য। মুদ্রা অভ্যাস করা তবে সহজ নহে?

গুরু। কোন কাজই সহজ নহে। একদিনে কি হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছিলে, না একদিনে বি, এ, পাশ করিয়াছিলে? কিছু-দিন অভ্যাস করিলেই মুদ্রাভ্যাস করিতে পারিবে।

শিষ্য। তারপর অন্য মুদ্রার কথা বলুন।

গুরু। বলিতেছি,—

শক্তিচালনী মুদ্রা,—

মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
শয়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা॥
যাবৎ সা নিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবঃ পশুর্যথা।
জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ॥
উদ্ঘাটয়েৎ কপাটঞ্চ যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ।
কুণ্ডলিন্যাঃ প্রবোধেন ব্রহ্মদ্বারং বিভেদয়েৎ॥
নাভিবৃহদ্বেষ্টনঞ্চ ন চ লগ্নং বহিঃস্থিতম্।
গোপনীয়গৃহে স্থিত্বা শক্তিচালনমভ্যসেৎ॥
বিতস্তিপ্রমিতং দীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলম্।
মৃদুলং ধবলং সূক্ষ্মং বেষ্টনাম্বরলক্ষণম্॥
এবমম্বরযুক্তঞ্চ কটিসূত্রেণ যোজয়েৎ।
ভস্মনা গাত্রসংলিপ্তং সিদ্ধাসনো যথা চরেৎ॥
নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েদ্ বলাৎ।
তাবদাকুঞ্চয়েদ্ গুহ্যং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া॥

যাবদ্‌গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ।
তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুম্ভিকা চ ভুজঙ্গিনী।
বদ্ধশ্বাসস্ততো ভূত্বা উর্দ্ধমার্গং প্রপদ্যতে।
শক্তিদ্বয়ং ফলৈকন্তু যোনিমুদ্রা চ চালনম্ ॥
বিনা শক্তিচালনেন যোনিমুদ্রা ন সিধ্যতি।
আদৌ চালনমভ্যস্য যোনিমুদ্রাং সমভ্যসেৎ ॥

মূলাধারপথে পরদেবতা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা (সাড়ে তিন পাক যুক্ত) হইয়া সর্পীর আকারে নিদ্রিত আছেন। যাবৎ তিনি দেহে নিদ্রিত থাকেন, তাবৎ জীব পশুবৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকেন,—তাবৎ কোটি কোটি যোগ-অভ্যাস দ্বারাও তাহার জ্ঞান জন্মে না। যেমন চাবি দ্বারা কুলুপ খুলিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা যায়, তেমন কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া, উর্দ্ধদেশে সহস্রারপথে আনয়ন করিলেই ব্রহ্মদ্বার ভেদ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-পথ উন্মুক্ত হয়! ইহাতেই জীবের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

নগ্নাবস্থায় বহির্দ্দেশে অবস্থিত হইয়া এই যোগ সাধনা করিবে না। গোপনীয় গৃহে থাকিয়া, নাভিদেশে বেষ্টন পূর্ব্বক শক্তিচালনী মুদ্রা অভ্যাস করিবে। বিতস্তি-(বিঘত) প্রমাণ দীর্ঘ, চতুরঙ্গুল বিস্তৃত কোমল, শ্বেতবর্ণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করিবে। এই নাভি-বেষ্টন-বস্ত্রখণ্ডকে কটিসূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ভস্মদ্বারা গাত্রলেপন করিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বকউভয় নাসিকা-দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক অপান বায়ুতে যুক্ত করিবে এবং যে পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত গুহ্যদেশকে ক্রমশঃ অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা আকুঞ্চিত করিবে। এইরূপ বদ্ধশ্বাস হইয়া কুম্ভক যোগ দ্বারা বায়ু আবদ্ধ করিলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত ও উর্দ্ধমার্গে চালিত হইয়া সহস্রার পরমাত্মার সহিত আবদ্ধ হয়েন,

শক্তিচালনী মুদ্রা সিদ্ধি ব্যতিরেকে যোনিমুদ্রা সাধিত হয় না: এই নিমিত্ত প্রথমে শক্তিচালনী মুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে যোনিমুদ্রার অভ্যাস করিবে। ইহা ক্রমে ক্রমে দিন দিন অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। অশ্বিনীমুদ্রা কিরূপে করিতে হয়?

গুরু। বলিতেছি—

আকুঞ্চয়েদ্‌গুহ্যদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ।
সা ভবেদশ্বিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী॥

বারংবার গুহ্যদ্বারকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে। ইহাকে অশ্বিনীমুদ্রা বলে। ইহাদ্বারা শক্তি প্রবোধিত হয়।

অতঃপর যোনিমুদ্রার কথা শোন।

যোনিমুদ্রা,—

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥
ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্॥
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥
গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেন লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং ভাবিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্॥
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণম্।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্॥
পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমাখ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতা॥
পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি-শিবাত্মকম্।

যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

প্রথমে পূরকযোগ দ্বারা স্বীয় মূলাধার পদ্মমধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিবে। গুহ্যদ্বার অবধি উপস্থ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনিদেশ বলে। এই যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা বন্ধনে প্রবৃত্ত হইবে। তারপরে ব্রহ্মযোনিমধ্যে, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ; কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল কামদেব অবস্থিত আছেন.—এইরূপ কামদেবকে ধ্যান করিয়া, তাহার উর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপা পরমা শক্তি পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া আছেন,—ইহা চিন্তা করিবে। প্রাণায়াম-যোগ প্রভাবে বায়ুর সহযোগে তিনি লিঙ্গ অর্থাৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট জীবাত্মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রমধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। শিরঃস্থিত অধোমুখ কমল কর্ণিকামধ্যে সেই কুণ্ডলিনী শক্তি পরমাত্মার সহিত আছেন। তাহা হইতে পরমানন্দময় তেজোবিশিষ্ট পাটলবর্ণ অমৃতধারা গলিত হইতেছে। জীবাত্মা যোগপ্রভাবে মূলাধার হইতে উর্দ্ধদেশে অবতারিত হইয়া সেই মূলাধারস্থ ব্রহ্মযোনি মণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করেন। সাধক জীবাত্মার পুনর্ব্বার উর্দ্ধভাগে এবং অধোভাগে ব্রহ্মযোনিতে গমন এবং আগমনরূপ প্রাণায়াম মাত্রাযোগেই করিবে,—এইরূপ গমনাগমন ও সুধাপানরূপ প্রাণায়াম তিনবার করিবে ;—সেই মূলাধারপদ্মে ব্রহ্ম-যোনি স্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পরমাত্মার প্রাণ স্বরূপ হইয়া আছেন,-এইরূপ গমনাগমনের পর পুনর্ব্বার ঐ জীবাত্মার কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন হইতেছেন,—ইহাই চিন্তা করিবে; ইহারই নাম যোনিমুদ্রা। ইহা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠ মুদ্রা,—ইহার বন্ধন

মাত্রেই সাধক এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন।

শিষ্য। এই সকল মুদ্রার মধ্যে প্রাণায়ামের আবশ্যক,—তাহা হইলে ব্রহ্মচারিকে প্রাণায়ামও শিখিতে হয়?

গুরু। প্রণায়াম শিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর অবশ্য উচিত কর্ম্ম,— প্রাণায়ামের দ্বারা ব্রহ্মচারী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে,—সে কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য মুদ্রাগুলির কথা আলোচনা করা যাউক।

মহাবেধ মুদ্রা,—

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা॥
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতো ময়া॥
বেধেনানেন সংবিদ্ধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেন ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতম্।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী॥
চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তে বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যাপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে॥
মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ॥
এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
এতত্ত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ;
অন্যথা চ ন সিদ্ধিঃ স্যান্মুদ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ॥

প্রাণ ও অপানের যোগ পূর্ব্বক ঐ বায়ুদ্বারা জঠর পূরণ করিয়া মহাবেধ অবলম্বন পূর্ব্বক (উদরের পার্শ্বদ্বয়ে যে হস্তদ্বয় স্থাপিত আছে, তাহার) সেই পার্শ্বদ্বয় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্তাড়িত করিবে, (কিংবা উদর পার্শ্বে ঐ হস্তমধ্যদ্বারা অল্পে অল্পে চাপ দিতে থাকিবে) ইহাকে মহাবেধ বলে। যোগিগণ এই মহাবেধ সহকারে বায়ু দ্বারা সুষুম্নাগ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া দুর্ভেদ্য ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে পারেন (পরে ইহা দ্বারাই বিষ্ণুগ্রন্থি ও ভেদ হইলে, অনায়াসে, রুদ্রগ্রন্থি সহস্রধারে কুণ্ডলিনীর গমনাগমন হইতে থাকে)। যিনি প্রত্যহ (তিন সন্ধ্যা, দুই সন্ধ্যা, বা এক সন্ধ্যা) অতি গোপন ভাবে এই মহাবেধ অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হইবে এবং জরা মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। "মাবেধস্থিত যোগীর মূলাধার স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা বায়ুদ্বারা সন্তাড়িত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। মহামায়া কুণ্ডলিনীও পরমশিবে লয় প্রাপ্ত হয়েন।

মহাবেধ ব্যতীত কেবল মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ বিফল, এই হেতু যোগী যত্ন সহকারে যথাক্রমে এই ত্রিতয়ই সাধন করেন। (এই হেতু ইহার নাম বাজত্রয় যোগ। ইহা যথাবিধি সাধন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবা হইতে পারে এবং এই বাজত্রয় যোগ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায় ও দেহে কোন রোগ থাকে না)। যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সয়ংকালে এবং নিশাকালে এই চারি সময় এই বন্ধত্রয় যোগ সাধন করিবেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবেন,—সংশয় নাই। এই বন্ধত্রয়ের মাহাত্ম্য সিদ্ধ ব্যক্তিই জানেন, অন্য কেহ জানে না।

সাধকগণ ইহা বিদিত হইলে উত্তম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি যত্ন সহকারে এই বন্ধত্রয়-যোগ গোপন করিবেন; না করিলে, তাঁহার এই বন্ধত্রয় সিদ্ধির হানি হইবে,—সংশয় নাই।

শিষ্য। আপনি প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুর কথা বলিলেন, ঐ সকল বায়ু কি অবস্থায় এবং কোথায় থাকে?

গুরু। জীবসমূহের হৃদয়াভ্যন্তরে দিব্য-লিঙ্গি-সমলঙ্কৃত একটি মনোরম দিব্য দ্বাদশদল পদ্ম আছে, ইহার প্রত্যেক দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশবর্ণের এক একটি বর্ণ বিরাজ করিতেছে। এই দ্বাদশদল পদ্মমধ্যে অনাদি কর্ম্মপরম্পরায় সংশ্লিষ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা-ভূষিত আত্মাভিমান প্রাণবায়ু অবস্থান করে।

বৃত্তিভেদে এই প্রাণবায়ু নানাবিধ নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই পাঁচটি—সমুদয় এই দশসংখ্যক প্রাণবায়ুই প্রধান। এই দশ প্রাণবায়ু নিজ নিজ কর্ম্ম বশতঃ পরিচালিত হইয়া দেহকে কার্য্যসম্পাদক করিতেছে।

এই দশ বায়ুর মধ্যে আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটি বায়ু শ্রেষ্ঠ। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যেও আবার প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ই শ্রেষ্ঠতম;—কেন না, এই দুইটিই দেহের প্রধান কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিমণ্ডলে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান সঞ্চারিত হইয়া, নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। নাগ প্রভৃতি শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগের কার্য্য উদগার, কূর্ম্মের উন্মীলন (প্রসারণ ও সঙ্কোচ), কৃকরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের কার্য্য হিক্কা।

এইবার তোমাকে একটি মুদ্রার কথা বলিব, তাহার অভ্যাসে হৃতশুক্র ব্যক্তি অতি অল্পদিনের মধ্যে পুনঃ স্বাস্থ্য ও বল প্রাপ্ত হয়েন। সেই মুদ্রার নাম উড্ডানবন্ধ।

উড্ডানবন্ধ মুদ্রা,—

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানবন্ধ এষ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনং॥
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
উড্ডানাখ্যো হ্যয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥
নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্ যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ॥
ষণ্মাসানভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্।
তস্যোদরাগ্নির্জ্জলতি রসবৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥
অনেন সুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥
গুরোর্লব্ধা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশ বন্ধং পরমদুর্লভম্॥

নাভির উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পশ্চিমতান করিবে ;—ইহাকেই উড্ডানবন্ধ বলে, ইহা দ্বারা অনন্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়। অথবা নাভির উর্দ্ধভাগ এরূপ পশ্চিমতান করিবে, যেন মেরুদণ্ডে উদরে চর্ম্ম স্পৃষ্টপ্রায় হয় ;—ইহাকে উড্ডানবন্ধ বলা যায়। ইহা মৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহ স্বরূপ। যিনি প্রত্যহ চারিবার করিয়া এই উড্ডানবন্ধ করিবেন, তাঁহার নাভিশুদ্ধ ও বায়ু শোধন হইবে। ছয়মাস পর্য্যন্ত ইহা অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ তাঁহার জঠরাগ্নি সমুজ্জ্বল

হয় ও রস বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বিচক্ষণ সাধক গুরুসমীপে এই পরম দুর্লভ বন্ধের উপদেশ লাভ করিয়া, যে স্থলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, তাদৃশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যত্নসহকারে অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন, মুদ্রা বিশেষের অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মচারী ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে,—কিন্তু সেরূপ মুদ্রার কথা আমাকে এ পর্য্যন্ত বলেন নাই।

গুরু। না, তাহা বলি নাই। অহি, অগ্নি, আর স্ত্রীলোক লইয়া যে কার্য্য, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। সেই জন্য তাহা বলিনাই!

শিষ্য। সেই মুদ্রায় কি স্ত্রীলোকের প্রয়োজন?

গুরু। হাঁ, ব্রহ্মচারীর রুদ্ধ শুক্র স্ত্রীলোকের সহযোগে চালনা করিয়া মুদ্রাযোগে ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিতে হয়।

শিষ্য। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যখন সুমহান্ এবং তদ্দ্বারা যখন শুক্রধারণই হয়, তখন তাহাতে ভয় কি?

গুরু। ভয় এই যে, ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া না বসা হয়।

শিষ্য। আপনি সে মুদ্রার কথা বলুন,—অতি সাবধানে তাহার অনুষ্ঠানে যত্ন করা যাইবে।

গুরু। বলিতেছি শোন। ঐ মুদ্রার নাম বজ্রোলী মুদ্রা। তদ্ভিন্ন আরও দুইটি আছে। প্রথমে বজ্রোলীর কথাই বলি।

বজ্রোলী মুদ্রা,—

বজ্রোলীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীম্।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমামপি॥
স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোঽপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তো ভবেদ্‌গৃহস্থোঽপি বজ্রোল্যভ্যাসযোগতঃ॥

বজ্রোল্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নের কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা॥
আদৌ বজ্রঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ॥
স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচয়েৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া॥
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতোঽয়ং পুমাংশ্চালনমাচরেৎ॥
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ।
অনেন বিধিন যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে
গব্যভুক্ কুরুতে যোগং গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
বিন্দুর্ব্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥
অহং বিন্দুরজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনবত্তাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥
বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখ-দুঃখঞ্চ সংস্থিতম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্॥

অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোঽপি মানবঃ॥
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে।
ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতম্॥
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবম্।
সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ॥

ভক্তগণের জন্য বজ্রোলী মুদ্রা কথিত হইতেছে;—এই বজ্রোলী মুদ্রাদ্বারা সংসারান্ধকার বিদূরিত হয় এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। যে সাধক কেবল একমাত্র বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তিনি গৃহস্থই হউন, অথবা যোগশাস্ত্রানুসারে কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হউন,—তথাপি মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস করিলে সাধক ভোগযুক্ত থাকিলেও তাঁহার মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে, অতএব যোগীদের সর্ব্বদা যত্ন সহকারে এই মুদ্রা অভ্যাস করা বিধেয়। বুদ্ধিমান সাধক প্রথমতঃ যত্ন সহকারে লিঙ্গবিবর দ্বারা যোনিকুহর হইতে যথাবিধি রজঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে প্রবেশিত করিবেন। পরে তাহাতে নিজ শুক্র সংবদ্ধ করিয়া লিঙ্গ পরিচালন করিতে থাকিবেন;—এই সময়ে যদি যোনিমুদ্রা দ্বারা ঊর্দ্ধে বিন্দু [শুক্র] স্খলনোন্মুখ হয়, তাহা হইলে বামভাগে ইড়া নাড়ীতে সঞ্চারিত করিয়া ক্ষণমাত্র যোনিকুহরে লিঙ্গ চালন বন্ধ করিবেন। তদনন্তর সেই যোগী পুরুষ গুরূপদেশ অনুসারে হুং হুং কার শব্দ সহকারে অপান বায়ু আকুঞ্চন করিয়া বলপূর্ব্বক যোনিমধ্য হইতে রজঃ আকর্ষণানন্তর পুনর্ব্বার লিঙ্গ চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে যোগী ঝটিতি যোগসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুপাদপদ্ম পূজা পূর্ব্বক প্রত্যহ যথানিয়মে, গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সেবন সহকারে এইবিধি অনুসারে যোগ সাধনা করিতে

থাকিবেন। বিন্দু চন্দ্রস্বরূপ এবং রজঃ সূর্য্যস্বরূপ;—অতএব যত্ন-সহকারে নিজদেহে চন্দ্র সূর্য্যের সেবন করা যোগীর উচিত। বিন্দু আমি (শিব) স্বরূপ; রজঃ শক্তি-স্বরূপ; সুতরাং যখন সাধন দ্বারা যোগীর দেহে এই প্রকারে শিব-শক্তির মেলন হয়, তখন তাঁহার দিব্য দেহ হইয়া থাকে।

বিন্দুপাত মৃত্যুর হেতু এবং বিন্দু ধারণই চিরজীবনের কারণ; এই নিমিত্ত যোগীরা অতি যত্নে বিন্দু ধারণ করিয়া থাকেন। লোকে বিন্দু হইতে জন্মগ্রহণ করে, বিন্দু হইতেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যোগীরা ইহা বিদিত হইয়া নিরন্তর বিন্দু ধারণ করিবেন। এই জগতে মহারত্ন স্বরূপ বিন্দু সিদ্ধ হইলে কি না সিদ্ধ হইল? এই বিন্দুধারণ প্রভাবেই আমার (শিবের) এতদূর মহিমা হইয়াছে। এই বিন্দুই জরামরণশীল বিমূঢ় সংসারিগণের সুখ ও দুঃখের হেতু; অর্থাৎ বিন্দুই তাহাদিগকে সুখ-সম্পন্ন ও দুঃখ-মগ্ন করিতেছে। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ যোগিগণের পক্ষে সম্পূর্ণ শুভপ্রদ। মনুষ্য ভোগযুক্ত হইয়াও অভ্যাস দ্বারা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সাধক এই যোগবলে ভূমণ্ডল মধ্যে অশেষ-ভোগ্য দ্রব্য সম্ভোগপূর্ব্বক যথাকালে ভোগবিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াও পরম সিদ্ধিলাভ করেন। এই যোগ সাধন প্রভাবে যোগিগণ অশেষ সুখ-সহকারে নিশ্চয়ই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন;—অতএব এই যোগ অভ্যাস করা সর্ব্বথা বিধেয়।

অমরোলী ও সহজোলী মুদ্রা,—

সহজোল্যমরোলী চ বজ্রোল্যা ভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ॥

সহজোলী ও অমরোলী মুদ্রা বজ্রোলী মুদ্রারই প্রকারভেদ মাত্র; অতএব যে কোনরূপে বিন্দু ধারণ করাই যোগীর বিধেয়।

অমরোলী মুদ্রার উপদেশ,—

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরোলিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ॥

যদি রমণী-সহযোগে বেগবশতঃ দৈবাৎ বিন্দু পতিত হয়, তাহা হইলে সেই মিলিত চন্দ্রসূর্য্য লিঙ্গনাল দ্বারা শোষণ করিয়া নিজ দেহে পুনঃ প্রবেশিত করিবে। ইহারই নাম অমরোলী মুদ্রা।

সহজোলী মুদ্রার উপদেশ,—

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েদ্ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোলিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

যোগী স্খলিতপ্রায় স্বীয় বিন্দুকে যদি যোনিমুদ্রা দ্বারা নিজ দেহে রুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাহাকে সহজোলী মুদ্রা বলা যায়, এই সহজোলী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেই সুগোপিত আছে।

বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী মুদ্রার একতা ও তদভ্যাসের উপায়।

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা॥
অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ পরম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ॥
এতদ্‌গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ॥
স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ॥

গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥
ষণ্মাসমভ্যসেদ্যো বৈ প্রত্যহং গুরু-শিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
ঈশ্বরত্বং যৎপ্রসাদান্ মমাপি দুর্লভং ভবেৎ॥

বজ্রোলী মুদ্রা, অমরোলী মুদ্রা ও সহজোলী মুদ্রা, এই তিন মুদ্রার ভেদ, সংজ্ঞাভেদ মাত্রেই ঘটিয়াছে। ফলতঃ এই ত্রিতয়ের কার্য্য ও গ ত সমান; এই জন্য যোগীরা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা এই মুদ্রাত্রিতয়ের অথবা তন্মধ্যে অন্যতমের সাধন করিয়া থাকেন। আমি (শিব) কেবল ভক্ত-বর্গের প্রতি পরমস্নেহ বশতঃই তোমার নিকট এই যোগ কহিলাম; পরন্তু ইহা যত্ন সহকারে গোপন করাই উচিত; যে কোন ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। এই যোগ অত্যন্ত গুহ্য; উহার সদৃশ গুহ্যতম যোগ আর হয় নাই এবং হইবেও না;—অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি-দিগের উচিত এই যে, সর্ব্বদা অতীব যত্ন সহকারে ইহা গোপন করিয়া নিজ মূত্র পরিত্যাগকালে বলপূর্ব্বক অপান বায়ুদ্বারা, ধীরে ধীরে ঐ মূত্র আকর্ষণ করিয়া লইবে। যে সাধক গুরূপদেশ অনুসারে প্রত্যহ এইরূপ সাধন করিবেন, তাঁহার ক্রমশঃ বিন্দুসিদ্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মহাসিদ্ধি ও হইয়া উঠিবে। যিনি গুরূপদেশ অনুসারে ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিবেন, শত শত রমণী সম্ভোগেও তাঁহার বিন্দুপাত হইবে না। মহারত্ন স্বরূপ এই বিন্দুসিদ্ধি হইলে ভূমণ্ডল মধ্যে কি না সিদ্ধি হইল? এই বিন্দুসিদ্ধি-প্রসাদেই আমার (শিবের) এই অনন্তসুলভ ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়াছে।

তোমার নিকটে শাস্ত্রীয় মুদ্রা-বন্ধনের কথা বলিলাম। ইহার মধ্যে পূর্ব্বগুলি অভ্যাস করিলে ব্রহ্মচারী সাধারণতঃ বলবীর্য্য লাভ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার শুক্রধারণের ক্ষমতা জন্মিবে। অবশিষ্ট কয়টি দ্বারা বিন্দু জয় ও ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়; কিন্তু ব্যাপার বড় কঠিন—সাপ লইয়া খেলা করা; অতএব প্রথম সাধকের এ পথে না আসাই মঙ্গল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাণায়াম।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারীরও প্রাণায়াম শিক্ষা করা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য শুক্রধারণ,—তাহার সহিত প্রাণায়ামের কি সম্বন্ধ, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ শুক্রধারণ হইলেও শুক্রধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহাও বুঝা আবশ্যক। শুক্রধারণ করিলে দেহ বলিষ্ঠ এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয়। তখন ব্রহ্মচারী মহত্তর চিন্তা ও উচ্চতর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। অতএব উচ্চতর কার্য্য ও মহত্তর চিন্তা সম্পাদন করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করা বিধেয়; ব্রহ্মচারীকে তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রাণায়াম শিক্ষা না করিলে, রমণীর আকর্ষণ হইতে, লোভমোহের আকর্ষণ হইতে মনকে সরান যায় না। অসৎকার্য্য করিও না, এ উপদেশ সকলেই দেয়; কিন্তু অসৎকার্য্যে, মন যাইবে না, এমন উপদেশ বা ক্রিয়া শিক্ষা চাই,—নতুবা কেবল

উপদেশে কি হইতে পারে? প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণসংযম হয়। প্রাণায়ামের অপর নাম প্রাণসংযম।

দাশুরায় তাঁহার পাঁচালীর মধ্যে একস্থানে বলিয়াছেন—

"ঘাটে গিয়ে এক শিব গড়িয়ে
মিছে মরেন ধ্যান পড়িয়ে,
প্রাণ পড়িয়ে থাকে রমণী-পানে।"

কথাটার রচনা তিনি যে ভাবেই করুন, কিন্তু অতি সত্য। প্রাণ যদি অন্যত্র পড়িয়া থাকে, তবে পূজা, জপ, ধ্যান, ধারণা, কিছুই হয় না। ইচ্ছা করিলেই প্রাণকে সংযম করা যায় না,—ক্রিয়া চাই,—সেই ক্রিয়া প্রাণায়াম।

প্রাণসংযমনং নাম দেহে প্রাণবিধারণম্।
এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্ব্বমৃত্যুপ্রঘাতকঃ॥

প্রাণবায়ুকে শরীরমধ্যে নিরুদ্ধ রাখার নামই প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম। ইহা মরণ-বারণ।

প্রাণায়াম দ্বারা রোগ বারণও হয়।

শিষ্য। প্রাণায়াম দ্বারা বাহিরের প্রাণ ভিতরে আসে, অর্থাৎ প্রাণসংযম হয় কি প্রকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, আমরা যাহাকে প্রাণ বলিয়া জানি, তাহা বায়ুমাত্র। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়,—এই দশটি বায়ুর নাম। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদান, সর্ব্ব শরীরে ব্যান এই সকল বায়ু নিত্য বহিতেছে। প্রাণ, অপান প্রভৃতি এই পাঁচটি বায়ুই প্রধান ও বিখ্যাত। নাগাদি আর পাঁচটি বায়ুর স্থান এই—উদগারে নাগ বায়ু, চক্ষু উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাঁচিতে) কৃকর, বিজৃম্ভনে (হাই-

তোলায়) দেবদত্ত এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয়,—এই পাঁচটী বায়ু এই পঞ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু দেহ পরিত্যাগ করে না। জীবদিগের জীবনরূপী এই সকল বায়ু সমস্ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে।

শিষ্য। আমি ঐ কথাগুলি ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। পুনরপি বলিতেছি, যে বায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত যে বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভি-মণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, সেইকালেই অপানবায়ুও যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্রে ও যোনিস্থানে উভয় দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ু পূরক-কালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে তুই বায়ু তুই দিকে গমন করে। যোগী বলেন—

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
তথা চৈতৌ বিসংবাদে সংবাদে সন্ত্যজেদিদম্॥

ষট্‌চক্রভেদটীকায়াম্।

অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে উড্ডীন হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ প্রাণ বায়ুও নাসারন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইলেও অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে। এই তুই বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয় যখন ঐ বায়ু নাভি গ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন

ক্ষরে, তখন তাহারা এই দেহ ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস বলে। এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্ত্তী নাভিমণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমান বায়ু বলে।

আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে,—প্রধান বায়ু পাঁচটি এবং উপবায়ু পাঁচটি। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণবায়ুই তাহার মধ্যে প্রধান। স্থানভেদে এই প্রাণবায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেহস্থ কুণ্ডলিনীনাম্নী শক্তি হইতে সেই প্রাণবায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া,এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া, কি বাহেন্দ্রিয়ের কার্য্য, কি আন্তরিক যন্ত্রকার্য্য, দেহস্থ সমস্ত কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। অসংখ্য শূন্য অথবা বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান-শক্তিবাহিনী, ইচ্ছাশক্তিবাহিনী এবং ক্রিয়াশক্তিবাহিনী এই তিন নাড়ী প্রধানা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনী-পথে তড়িন্ময় সূক্ষ্মবায়ু, সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি দেহে দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়। *

প্রাণায়ামদ্বারা এই প্রাণবায়ুর সংযম হয়; কাজেই জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি স্ববশে আইসে।

প্রাণায়ামকারীর প্রাণ সংযম অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু ইচ্ছামত ত্যাগ ও গ্রহণ ক্ষমতা জন্মে,—কাজেই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া তদধীন হইয়া পড়ে। তখন বাহিরের রূপে প্রাণকে টানিয়া লইতে পারে না।

শিষ্য। এক্ষণে প্রাণায়াম কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা বলুন।

---

* ডাক্তার ডড্ সাহেব তাঁহার তাড়িত-তত্ত্ব গ্রন্থে শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হইবার হেতু সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যে একটি শিরা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছেদন মাত্রেই রক্তের সঞ্চালন এককালে রহিত হয়। ইহাতেই তিনি অনুমান

গুরু। যোগশাস্ত্রের আচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। *

শ্বাস প্রশ্বাসের গতি যাহা জীবের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, সেই গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা ও স্থানবিশেষে ধারণ করার নাম প্রাণায়াম। আগে আসন সিদ্ধ করিয়া, তৎপরে প্রাণায়াম-সাধন করিলে, অতি সহজে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শ-প্রাণায়ামেন যোগপুঙ্গবঃ॥

শিবসংহিতা,—৩য় পটল।

ষোড়শ প্রাণায়াম করিয়া সাধক পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মকৃত জ্ঞানাজ্ঞান, বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য বিনষ্ট করিবেন।

শিষ্য। পুণ্য ও বিনষ্ট করিবেন।

গুরু। নিশ্চয়ই। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, পাপ বা পুণ্য উভয়ই বন্ধনের হেতু;—তবে সোণার শিকল, আর লোহার শিকল।

করেন যে, ঐ ধমনীর দ্বারাই হৃদয়ের রক্তসঞ্চালনী শক্তি সংযোজিত হয়। শারীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কুম্ব বলেন যে,—মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে জ্ঞানশক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী শিরা আছে, তিনি সেই শিরা ছেদন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে সেই মেরুদণ্ডাশ্রিত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে সকল বায়বীয় শক্তি আছে, ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস আদি যে সকল বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্যগণের দ্বারা মূল বায়ু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

* তস্মিন্ আসনসিদ্ধৌ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্বাহ্যকোষ্ঠবায়োর্যা অন্তর্বাহিগতিঃ তস্যা যো বিচ্ছেদঃ স প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ সুখেন সেৎস্যতীতি বিভাবনীয়ম্।—রাজমার্ত্তণ্ড।

শিষ্য। হাঁ, তারপর প্রাণায়ামের বিষয় যাহা বলিতেছিলেন, তাহা বলুন।

গুরু। প্রাণায়াম-সাধনে সাধকের কর্ম্মবীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতম্।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ॥

শিবসংহিতা,—৩য় পটল।

প্রাণায়াম দ্বারা সাধকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, ও ইহজন্মার্জ্জিত, কর্ম্ম সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পাপ-তুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥

শিবসংহিতা,—৩য় পটল।

প্রলয়ের আগুন যেমন তুলারাশিকে দগ্ধ করে, সাধক সেই প্রকার প্রাণায়ামরূপ অগ্নি দ্বারা পাতকরাশিকে বিদগ্ধ করিয়া, সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যরাশিকে বিনাশ করিবেন।

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥

শিবসংহিতা'—৩য় পটল।

যোগীন্দ্র ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া, পাপ-পুণ্যরূপ মহাসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোকমধ্যে পর্য্যটন করিতে থাকেন।

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকা-ত্রিতয়া ভবেৎ।
যেনস্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বীপ্সিতা ধ্রুবম্॥

পূর্ব্বকথিত অবস্থার পরে তিন ঘণ্টা মাত্র বায়ুধারণের অভ্যাস করিলে, যোগী ব্যক্তির সমস্ত অভিলষিত পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

বাক্যসিদ্ধঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়-প্রবেশনম্॥
বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্॥

শিবসংহিতা—৩য় পটল।

সাধক তখন স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন। তাঁহার বাক্য সিদ্ধ হয়, এবং দূরদৃষ্টি হয়। দূর শ্রবণ, অতি সূক্ষ্মদর্শন ও পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে। বিন্মূত্র লেপনে স্বর্ণাদি ধাত্বন্তর হয় এবং অন্তর্দ্ধান করিবার ক্ষমতা জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ হয় এবং অবিরোধে শূন্যপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে।

যদা ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

শিবসংহিতা,—৩য় পটল।

প্রাণায়ামাভ্যাসী যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন ইহসংসারে এমত বস্তু কিছুই নাই, যাহা, তাঁহার অলভ্য হইতে পারে।

প্রাণাপাননাদবিন্দু-জীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥

প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন হয়, এই জন্য এই অবস্থাকে ঘট অবস্থা বলা হয়।

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতম্।
প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবম্॥

যোগীর এক প্রহর মাত্র বায়ু ধারণের সামর্থ্য হইলে এবং প্রত্যাহারেও ঐ প্রকার সামর্থ্য জন্মিলে, সেই সাধক একপ্রকার অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতীয়মান হন—এবং তাঁহার সাধনান্তর বা মুক্ত হইবার বিলম্ব থাকে না।

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ॥

যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিশ্বের সমস্ত পদার্থ জানিতে পারেন,—তিনি বিশ্বস্থ পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা করেন—আত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, ইহাই চিন্তা করেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান, তাহা জ্ঞাত হইলে সেই ইন্দ্রিয় ও তদ্বিধান দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের জয় সমাধা করিতে পারেন।

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত তদা যোগী চ কুম্ভকম্॥
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥

শিবসংহিতা, ৩য় পটল।

যখন অভ্যাস বশতঃ পূর্ণ এক প্রহর মাত্র বায়ু বন্ধ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন একবার মাত্র কুম্ভক করিলে হইতে পারে। এক প্রহরকাল যোগীর শরীরে প্রাণবায়ু যদি নিশ্চল হয়, তবে ঐ যোগী স্বকীয় সামর্থ্যে বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলম্।
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না-ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ॥

এতদবস্থার অন্তে অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হয়। যখন ইড়া পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই পরিচয় অবস্থা বলে।

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতম্।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী সদা পশ্যতি নিশ্চিতম্॥

উক্ত বায়ু ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করিয়া সমস্ত চক্রভেদ করিয়া, যখন অভ্যাসযোগে সুনিশ্চিত পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের নিশ্চিত কর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপের অনুভব হয়, উহাদিগের স্বরূপ দর্শন হইয়া প্রকৃত বুঝিতে পারা যায়।

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥

যোগী প্রণব (ওঁ) দ্বারা ঐ কর্ম্মকূটের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। যদি কর্ম্মজন্য বহু জন্ম গ্রহণের আবশ্যক হয়, তবে যোগী নিজ যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা কায়ব্যূহ ধারণ করিয়া এক জন্মেই বহুজন্ম গ্রহণ করিয়া; কর্ম্মফলের শেষ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রাণায়াম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

গুরু। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণের সংযম।

শিষ্য। প্রাণায়ামের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের “স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উহাদিগের শাস্ত্রোক্ত-নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা” একথা পাতঞ্জলদর্শনোক্তি এবং আপনিও তাহাই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—শ্বাস প্রশ্বাসের ঐরূপ ক্রিয়াতে দৈহিক উপকার আদি হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত প্রাণসংযমের কি সম্বন্ধ, আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

গুরু। শ্বাস প্রশ্বাসটা কি, আগে তাহাই বুঝিয়া লও।

নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ।
তস্মাদাকাশমুৎপন্নমাকাদ্বায়ুসম্ভবঃ।
বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ॥

ঈশ্বর বলিলেন,—এক মহেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিরঞ্জন এবং আকার শূন্য। আকাশ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হইয়াছে।

এই আকাশকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের নয়নে যে কোন বস্তু দৃষ্ট হইবে, যাহার আকার আছে, তাহাই এই আকাশ বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং আকাশ বা ঈশ্বরকেই জড় বস্তুর জনয়িতা বলা হইতে পারে। আকাশ একটি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, গ্রহ নক্ষত্র বল, পর্ব্বত বল, নদ নদী বল, বৃক্ষ বল, লতা মানুষ বল, তৃণ বল, বালুকা বল,—যাহা কিছু বল, তৎসমস্তই ঐ আকাশের এক এক বিন্দু স্বরূপ। কাহারই পৃথক্ সত্তা নাই,—সকলই এক। কেবল ঘুরা ফেরা মাত্র। ফলকথা, সমস্ত জগতই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জড়রাশি মাত্র,—আমরা উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তনস্বরূপ। এই আবর্ত্ত কোথায়, কি প্রকারে গিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কতকগুলি ভূতসমষ্টি এই জগৎরূপ মহা-আবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন ঐ আবর্ত্তে ঘুরিয়া হয়ত মানবদেহ প্রকাশ করিল পরে হয়ত উহা জন্তুরূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর একপ্রকার আবর্ত্তের আকার ধারণ করিল,—ক্রমাগত পরিবর্ত্তন। এই মহাপরিবর্ত্তনের পরিণাম কোথায়; তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

আকাশই সাকাররূপে দৃষ্ট পদার্থ হইয়াছে, যাহা বহিঃপ্রকৃতিতে,

অন্তঃপ্রকৃতি বা অন্তর্জ্জগতেও তাহাই। প্রাণের সূক্ষ্ম স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ঈশ্বরই মনের স্বরূপ। যোগবলে যদি কেহ আপন মনের মধ্যে সূক্ষ্ম কম্পন উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সমগ্র জগৎ কেবল সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। কোন কোন ঔষধের শক্তিতে আমাদিগকে (ইন্দ্রিয়গণকে) অতীতরাজ্যে লইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় আমরা এই সূক্ষ্মকম্পন (Subtle vibrttion) স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।

তুমি বোধ হয়, বিশেষরূপে অবগত আছ; যে বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং এমন কি, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছেন যে,—জগতের সমস্ত পদার্থে এক অখণ্ড শক্তি বিরাজিত আছে; এই শক্তি-সমষ্টি দুই প্রকারে অনুভব করা যাইতে পারে; এক—স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থা; দ্বিতীয় স্ফুটিত বা ব্যক্ত অবস্থা। ঐ যে শক্তির কথা উল্লিখিত হইল, উহা প্রাণ,—সেই প্রাণের সংযমই প্রাণায়াম।

শিষ্য। অপেক্ষা করুণ। অনেকগুলি বিষয় জানিবার আবশ্যক। আপনি বলিলেন প্রাণের সংযম—প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থে শক্তিসমষ্টি বলিলেন। তাহা হইলে কি, শক্তি-সংযম করাকেই প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে?

গুরু। মূলতঃ তাহাই ধরিয়া লও।

শিষ্য। শক্তি-সংযম করিবার আবশ্যকতা কি?

গুরু। সংযম করিলে, তাহাকে নিজ আয়ত্তীভূত করা যাইবে। সংযম অর্থেই আয়ত্ত। আমাদের শক্তি যদি আমাদের আয়ত্তীভূত হইল, তখন আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারি; দেবতা-দিগকে হুকুমে নিকটে আনিতে পারি; পিতৃগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর লইতে পারি; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলের দ্বারাই যাহা

ইচ্ছা কার্য্য করাইয়া লইতে পারি। শক্তি এক অখণ্ড সমুদ্রবৎ। তোমার শক্তি, আমার শক্তি, সূর্য্যের শক্তি, চন্দ্রের শক্তি এমন কিছু প্রভেদ নাই,—তবে ঘটস্থ হইয়া প্রভেদ হইয়াছে। প্রাণায়াম বা প্রাণসংযমের দ্বারা সেই ভেদ বিনষ্ট করিতে পারিলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়া যায়।

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।
সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়তে তত্ত্বযোগিভিঃ॥
অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থস্বরোদরম্।
হংসাচারস্বরূপেণ ভবেজ্জ্ঞানং ত্রিকালগম্॥

পবনবিজয় স্বরোদয়।

পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে পাঁচটি তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানিগণ অবগত আছেন। অধুনা শরীরস্থ স্বরোদয় বলিব,—"হংস" এই প্রকার জীবের শরীরে সর্ব্বদা শ্বাস বহন হইতেছে। তাহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালের জ্ঞানলাভ করা যায়।

শ্বাস প্রশ্বাসে "হংস" উচ্চারণ হয়। শ্বাস গ্রহণ সময়ে "হং" এবং ত্যাগকালে "স" এই শব্দ উচ্চারণ হয়। "হং" কারে শিব এবং "স" কারে শক্তি। শ্বাস গ্রহণ করিয়া যদি পরিত্যাগ করা না গেল' তবে তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে,—অতএব "হং" শিবস্বরূপ বা মৃত্যু। সকারে প্রশ্বাস বা ত্যাগ, ইহাই শক্তিস্বরূপ। যাবৎ শ্বাস পরিত্যাগ হয়, তাবৎ জীবের মৃত্যু হয় না,—শ্বাসরোধেই মৃত্যু। এই শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবের জীবত্ব। মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্রাদপি কীট পর্য্যন্ত—এই "হংস"; দিবা রাত্রির মধ্যে মানুষের শ্বাস ২১৬০০ বার প্রবাহিত হয়।

"হংস" জীবাত্মা' শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে,—ভূতশুদ্ধির মধ্যে আছে—"হংস ইতি জীবাত্মানং" —"হংস" এই জীবাত্মা।

কিন্তু বাস্তবিকই কি, আমরা যে স্থূল বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভব করি, তাহাই জীবাত্মা? যদি তাহাই হয়, তবে বাতাসই আমাদের জীবাত্মা— কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। তুমি বোধ হয়, আমাদের যোগশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়াছ,—তাঁহারা প্রাণশব্দের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাসই করিয়াছেন,—আত্মোদ্দেশে অনেক আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় শ্বাস-প্রশ্বাসকেই প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের না বুঝিতে পারিবারই ফল।

আসল কথা, প্রাণ জীবনশক্তি। জগৎ সংরক্ষণশক্তি,—শ্বাস তাহার স্থূলস্বরূপ,—অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা জীবদেহের সর্ব্বত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়,—শ্বাস প্রশ্বাস শক্তির গমনাগমনের পথ। এই স্থূলপথে সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া বশে আনার নামই প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম নহে। তবে রন্ধন করিতে বা চাউলকে স্বেচ্ছামত কোমল করিয়া লইতে হইলে যেমন স্থূল অগ্নিশক্তির সাহায্য আবশ্যক,—তদ্রূপ প্রাণশক্তিকে সংযমে আনিতে শ্বাসক্রিয়ার স্থূল সাহায্য আবশ্যক। শ্বাস-প্রশ্বাসকে দেহযন্ত্রের গতিনিয়ামক মূলযন্ত্র (Fly wheel) বলিতে পার, এই মূলযন্ত্র চালনা করিয়া, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তাহা হইতেও সূক্ষ্মতম জীবনীশক্তি বা প্রাণে ঐ ক্রিয়া করানর নামই প্রাণায়াম।

শিষ্য। ঐ প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হয়, এক্ষণে তাহা বলুন।

গুরু। প্রাণায়াম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, যেমন জীব নর-দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তেমনি আবার ইহার সাধনাও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলেও অভ্যাসে, ইহা সকলেই আয়ত্ত করিতে পারেন। আবার যেমন অল্প অল্প অভ্যাস বা আয়ত্ত হইবে, অমনি যোগের ফল দর্শন করিতে পারিবেন।

যতপ্রকার যোগবিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে সন্দেহই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আমি এত খাটিতেছি, ইহাতে ফল হইবে কি না, এই সন্দেহই ঘোরতর

যোগ-বিঘ্নকর,— কিন্তু প্রাণায়ামে তাহা হইবে না। যতটুকু অভ্যাস করিবে, ততটুকুরই ফল পাইবে। তবে ইহা যে কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যে সাধনায় সংযম আছে, তাহাই কঠিন। অন্য বিষয়ে প্রাণায়াম কিছুই কঠিন নহে,—কেবল সংযমই কঠিন। অতএব প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কি কি কর্ত্তব্য ;—তোমাকে তাহাই আগে বলি।

প্রাণায়ামশিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য,—

ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ॥
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥

প্রাণায়াম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে, সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রথম-শিক্ষার্থী ইহা গুরূপদেশ লইয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে ; কেন না—প্রাণ লইয়া ইহার কার্য্য ; বায়ুর ব্যতিক্রমে এবং অযুক্ত অনভ্যাসের কারণে, ইহাতে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরোবেদনা, অক্ষিবেদনা, কর্ণবেদনা প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

সুযুক্তঞ্চ ত্যজেৎ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদিত্থং সিধ্যতি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥
ততঃ প্রত্যর্পিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যো গজো লজারির্বা ক্রমেণ বশ্যতামিয়াৎ॥

শ্বাস পরিত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচককালে উপযুক্তরূপে পরিত্যাগ

করিবে এবং পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ করিবে। কুম্ভক-সময়েও উপযুক্তরূপে কুম্ভক করিবে, অর্থাৎ প্রবিষ্ট বায়ুর বেগ ধারণ করিবে। ক্রমে ক্রমে এবং উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই, তাহা শীঘ্র আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়;—ইহার অন্যথা করিলে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলতা ঘটাইয়া ফেলিলে অনিষ্ট উপস্থিত হয়। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, সেই বদ্ধবায়ু রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্দ্বারা দেহ বিদীর্ণ হইতে পারে। অতএব আরণ্য-হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করা বিধেয়। বন্যহস্তী ও সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদু ও বশ্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে ক্রমে বশ্য ও মৃদু হয়,—একেবারে হয় না।

শিষ্য। উপযুক্তরূপে রেচক, উপযুক্তরূপে পূরক, উপযুক্তরূপে কুম্ভক করিবার কথা বলিলেন,—কিন্তু সেই উপযুক্ত কিরূপ, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হাঁ, সে উপযুক্ততার কথা বলিতেছি,—

ন প্রাণং নাপ্যপানং বা বেগৈর্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ শ্বাসবেগৈর্ন চালয়েৎ॥
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্নতু বেগতঃ।
ন কম্পয়েচ্ছরীরন্তু স যোগী পরমো মতঃ॥

প্রাণ অথবা অপান বায়ু কখনই সবেগে পরিত্যাগ করিবে না। এরূপ অল্পবেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন নিশ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়, অর্থাৎ হাতের তেলোয় ছাতু (ধূলি হইলেও হয়) কিঞ্চিৎ লইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে; এমন ধীরে ধীরে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, ঐ সূক্ষ্মচূর্ণ যেন না উড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, উভয়ই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিবে—কদাচ

বেগের সহিত করিবে না। রেচক, পূরক বা কুম্ভক করিতে কোন সময়েই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত বা বক্র করিবে না॥

শিষ্য। নিশ্বাস বায়ুর স্বাভাবিক গতি কি, অর্থাৎ নিশ্বাসবায়ু যখন বাহির হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক গতি কি এবং কোন কর্ম্মাদি করিতে হইবে, তাহার গতির পরিমাণই বা কি,—তাহা জানা না থাকিলে, প্রাণায়াম দ্বারা কি প্রকারে ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে, তাহা জানিতে পারা যাইবে না। অতএব তাহা জানিবার যদি কোন সুবিধা থাকে, তবে আমাকে তাহা বলুন।

গুরু। হাঁ, তাহা জানিবার উপায় আছে বৈ কি।

দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌ মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত গমন করাই স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিশ্বাস পড়িয়া তাহার স্বাভাবিক গতি এই যে সে বার অঙ্গুল পর্য্যন্ত যায়। নাসিকারন্ধ্র হইতে একটা কাঠিদ্বারা বার আঙ্গুল মাপিয়া সেই স্থলে একটু তূলা ধরিয়া দেখিবে, যদি তাহা ছাড়াইয়াও বায়ু যায়, তবে তুলা সরাইয়া মাপিয়া দেখিবে, কতদূর তাহার গতি হইল,—স্বাভাবিক অবস্থায় বার অঙ্গুলির অধিক গতি হইলেই বুঝিতে হইবে, তাহার জীবন ক্ষয়ের পথে গিয়াছে। প্রাণায়াম জানা থাকিলে, সহজেই সেই ক্ষয় নিবারণ করা যাইতে পারিবে।

গান করিবার সময়ে ষোল অঙ্গুলি, আহার করিবার সময়ে কুড়ি

অঙ্গুলি, গমনকালে চব্বিশ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ত্রিশ অঙ্গুলি এবং স্ত্রীসংসর্গ-কালে ছত্রিশ অঙ্গুলি নিশ্বাস পড়িয়া থাকে। শ্রমজনক ব্যায়ামকার্য্যে তাহারও অধিক নিশ্বাস-পাত হইতে থাকে।

স্মরণ রাখিও,—স্বাভাবিক বার অঙ্গুলির অধিক নিশ্বাসের গতি হইলেই প্রাণের ক্ষয় হইতেছে, বুঝিতে হইবে। যে কোন কার্য্যকালেই হউক, বার অঙ্গুলির অধিক নিশ্বাসের গতি হইলেই জীবনীশক্তি বা প্রাণের ক্ষয় হইতেছে বুঝিবে। প্রাণায়ামের দ্বারা এই অস্বাভাবিকী গতিকে স্বভাবে রাখাই বিধেয়। মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়, তাহার প্রধান কারণ এই নিশ্বাসের গতির দীর্ঘতা। আবার যাহাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে, অর্থাৎ চলতি কথায় ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিয়াছে,—বোধ হয় তাহাদের নিশ্বাস অতি ঘন ঘন ও অশীতি অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া পাত হয়,—কাজেই তাহাদিগকে আরও শীঘ্র মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া থাকে।

প্রাণায়ামের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ঐ নিশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যে, সকল সময় বার অঙ্গুলির মধ্যে রাখাই জীবনীশক্তি রক্ষার একমাত্র উপায়; কিন্তু প্রাণায়ামের উচ্চাবস্থায় উপনীত হইলে, তখন যোগী একেবারে বায়ু-নিরোধ করিয়া বহুদিন কাটাইয়া দিতে পারেন।

যাহা হউক, প্রাণায়ামের প্রথম শিক্ষার্থী শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রাণ-সাধনা অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবেন। প্রথম শিক্ষার্থী যখন কুম্ভকের পর রেচক করিবেন, অর্থাৎ আকৃষ্যমাণ বাহ্য বায়ুকে যখন পরিত্যাগ করিবেন, তখন আরও অধিকতর সতর্ক ও সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

শিষ্য। কিরূপ করিয়া প্রথমে প্রাণায়াম আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা আপনি আমাকে শিখাইয়া দিন।

গুরু। প্রাণায়াম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নাড়ীশোধন করিতে হয়।

শিষ্য। নাড়ীশোধন কেমন করিয়া করিতে হয়?

গুরু। হঠযোগে নেতি, ধৌতি প্রভৃতি বহিঃক্রিয়ার দ্বারা নাড়ী-শোধনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু সে সকল গৃহত্যাগী সাধু মহান্তেরই সাজে,—গৃহীর পক্ষে তাহা বড় কষ্টকর। আন্তর প্রয়োগ দ্বারা যেরূপে নাড়ী-শোধন করিতে হয়, তাহাই তুমি শিখিয়া লও, ইহা সকলের পক্ষে সুলভ। পরমযোগী শঙ্করাচার্য্য নাড়ীশুদ্ধির যে প্রকরণ বলিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহাই তোমাকে বলিতেছি।

আগে আসন সিদ্ধি করিতে হইবে; আসন-সিদ্ধি হইলে, তারপরে নাড়ীশুদ্ধ করিতে হয়।

নাড়ী-শোধন—

প্রাণায়াম-ক্ষয়িতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দ্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্ত্তব্যং, ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসা-পুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি, ততোঽনন্তর-মুৎসৃজ্যৈব দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ, পুনর্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেদ্ যথাশক্তি, ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যসতঃ সবন-চতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্ব্বরাত্রেঽর্দ্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি; *

অর্থাৎ—প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের-মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়, এই জন্যই শাস্ত্র প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীশোধন কর্ত্তব্য। নাড়ীশুদ্ধ হইলে, প্রাণায়াম করিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট অল্প চাপিয়া ধরিয়া বামনাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে এবং বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ২য় অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য।

না করিয়া বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে, অর্থাৎ ছাড়িয়া দিবে; আবার দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা ঐ বায়ু রেচন করিবে; কিন্তু গ্রহণ করা সমাপ্ত হইলে রেচন করিতে বিন্দুমাত্রকালও বিলম্ব করিবে না।

সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে এই প্রকার চারিবার করিতে হয়।

শিষ্য। কোন্ কোন্ সময় করিতে হয়, তাহার কোন নিয়ম আছে কি?

গুরু। হাঁ,—সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে একবার উষাকালে, একবার মধ্যাহ্নকালে, একবার সায়াহ্ন সময়ে ও একবার নিশীথ কালে ঐরূপ ক্রিয়া করিবে।

শিষ্য। একবার নিশ্বাস টানা, একবার ছাড়া;—প্রতিবার এইরূপ কয়বার করিতে হইবে?

গুরু। একবার বায়ু গ্রহণ, একবার রেচন,—আবার গ্রহণ ও আবার রেচন,—এইরূপে এই ক্রিয়া একবার হইল। প্রথমে প্রতিবারে এইরূপ যে একবার তাহার তিনবার করিও; তারপরে তিনবার অভ্যাস বেশ হইলে, পাঁচ বার, তারপরে প্রতিবারে সাতবার করিও।

শিষ্য। কত দিন ঐরূপ করিলে, নাড়ীশোধনে সিদ্ধিলাভ করা যাইবে?

গুরু। যত্নের সহিত অভ্যাস করিলে, এক মাসের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হইবে। কখন কখন দেড় কি দুই মাস সময় লাগিতে পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে জানিতে পারা যাইবে যে আমার নাড়ীশোধন হইয়াছে?

গুরু। নাড়ীশোধনে সিদ্ধিলাভ করিলে বুঝিতে পারিবে, দেহ যেন খুব হাল্‌কা হইয়াছে। নিদ্রা, আলস্য, জড়তা দুরীভূত হইয়াছে।

শিষ্য। ইহাই কি চরম অভিজ্ঞতা?

গুরু। না আরও আছে।

শিষ্য। সে কি?

গুরু। তোমার ইন্দ্রিয়াদির একটি সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

শিষ্য। তাহাতে কি হইবে?

গুরু। কিছু কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে।

শিষ্য। এ সামান্য সাধনা দ্বারাতেই লোকাতীত ব্যাপার দর্শন করিতে সক্ষম হইব?

গুরু। কার্য্য কি সামান্য কিছু আছে? পাড়াগাঁয়ে রাত্রিকালে প্রদীপের কাছে একপ্রকার কালো পোকা (গোবরে পোকা) উড়িয়া আইসে; তাহারা অনাচ্ছাদিত প্রদীপকে নিবাইয়া দেয়; কিন্তু সেখানে যে কয়জন লোক থাকে, সকলেই যদি দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করে, তবে পোকা মুহূর্ত্ত মধ্যে আড়ষ্টপক্ষ হইয়া দপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। পাড়াগ্রামের জলাভূমিতে তৃণের উপর আশ্রয় করিয়া একরূপ কীট থাকে; তাহারা মানুষের গায়েও লাগে,—উহাদিগকে 'ছিনে জোঁক' বলে। ছিনে জোঁক এক তৃণ হইতে অন্য তৃণে যাইতেছে, সেই সময় তুমি তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দৃঢ়রূপে টিপিয়া রাখ,—দেখিবে সেই জোঁকের গতিশক্তি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ ছাড়িয়া না দিলে, জোঁকের আর যাইবার শক্তি হইবে না। তোমাদের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ইহার কোন হেতুবাদ বা বিজ্ঞান আছে, বলিতে পার?

শিষ্য। না, ইহার আবার কি বিজ্ঞান থাকিবে? বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করিতেই পশ্চাৎপদ।

গুরু। কিন্তু চাক্ষুষ দেখিলে কি বলিবে?

শিষ্য। হাঁ— চাক্ষুষ দেখিলে নিরুত্তর।

গুরু। ইহাও যোগশক্তি।

শিষ্য। যোগের অলৌকিক শক্তি,—যোগশক্তি দর্শন করিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানও অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, নাড়ীশোধন হইলে লোকাতীত কি বিজ্ঞান হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। সামান্য জ্ঞান,—কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানেই বুঝা যাইবে যে, যোগসাধনায় আমাদের সাধারণ জ্ঞানের কোন অতীত জ্ঞানে পঁহুছান যাইবে। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহাতে বিশ্বাস করা অতিশয় দুর্ঘট,—কোন বস্তু দেখিতে না শুনিতে না পাইলে, তাহাতে ভাল লোকেরও বিশ্বাস হয় না। যাহার হয়, সেও হয় ত অন্ধবিশ্বাসী। এই নাড়ীশোধনে সিদ্ধিলাভ করিলে,—অনেক প্রমাণ দেখিতেও শুনিতে পাইবে। মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল আনন্দে মন পূরিয়া উঠিবে, মধ্যে মধ্যে সুগন্ধে নাসিকা পূর্ণ হইবে। আরও কিছু সাধন করিলে, তুমি অপরের মনের ভাব বুঝিবে,—অপরের মনের ভাবগুলি ছবির আকারে বসিবে; হয় ত অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই উহা তুমি শুনিতে পাইবে; কিন্তু কেবল নাড়ী শোধন হইলেই ইহা যে সকল সময়েই ঘটিবে, তাহা নহে; সময়ে সময়ে এরূপ হইবে। তারপর প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিলে, যে বিভূতি লাভ করিবে,—তাহা পূর্ব্বেও কতক বলিয়াছি,—আবার পরেও বলিব। কিন্তু বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও,—যোগের বিভূতিলাভ যোগের উদ্দেশ্য নহে। যোগের উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি। দীর্ঘজীবী হওয়া নীরোগ হওয়া, বীর্য্য-স্তম্ভন করা, কায়ব্যূহ গ্রহণ করা—এ সকল ত ভোজের বাজি। যোগ-সাধন করিলে, উহা আপনিই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু উহাতেই যেন আসক্ত হইয়া ভুলিয়া যাইও না। তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে,—চিনি

ফেলিয়া চিটের আদর করা হইবে, অথবা জালবিমুক্ত হইতে গিয়া কণ্টক-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইবে।

শিষ্য। জীবের জীবনী-শক্তি বা শক্তিকেন্দ্র কাহাকে বলে?

গুরু। জীবনীশক্তি প্রাণকে বলে। প্রাণের শক্তিকেন্দ্র কুণ্ডলিনী শক্তি

শিষ্য। কুণ্ডলিনীশক্তি কোথায় থাকেন?

গুরু। যোগিগণের যোগশক্তি-দৃষ্ট অভিজ্ঞতার ফলে, তাঁহারা যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়,—মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে; এই শূন্য নালীর নিম্নদেশে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম অবস্থিত। ঐ পদ্ম ত্রিকোণাকার, চতুর্দ্দলবিশিষ্ট এবং সর্পের আকৃতি-বিশিষ্ট—যোগিগণ তাঁহার স্বরূপ ক্রিয়া প্রভৃতি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

কুণ্ডলিনী,—

পশ্চিমাভিমুখী যোনিগুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা॥
সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ।
মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না-বিবরে স্থিতা॥

গুহ্য ও লিঙ্গ এই দুয়ের মধ্যস্থানে পশ্চাদভিমুখী যোনিমণ্ডল আছে; সেই যোনিমণ্ডলকে কন্দও বলা হয়। যোনিমণ্ডলের মধ্যে কুণ্ডলিনীশক্তি নাড়ী সকলকে বেষ্টন করিয়া সার্দ্ধত্রিকুটিলকার, সর্পরূপ, আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্দেবী বীজসংজ্ঞিকা॥

ভুজঙ্গীর আকারে প্রাগুক্ত স্থানে কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিত থাকেন; কিন্তু নিজ-দীপ্তিতে তিনি সর্ব্বদাই দীপ্তিমতী। সর্পবৎ সন্ধিস্থানস্থ এবং তিনি বাক্যের বীজস্বরূপ বাগিন্দ্রিয়।

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভয়া স্বর্ণভাস্বরা।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা॥

কুণ্ডলীশক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপ দীপ্তিমতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি।

তত্র বন্ধুকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতম্।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণীম্॥

কুণ্ডলী যেখানে আছেন, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধুকপুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ আছে। সেই বীজ ধৌত স্বর্ণবর্ণ অক্ষররূপী যোগাকারে চিন্তনীয়।

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতম্।
শরচ্চন্দ্রনিভস্তেজশ্চয়মেতৎ স্ফুরৎ স্থিতম্॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
বীজসংজ্ঞং পরং তেজস্তদেব পরিকীর্ত্তিতম্॥

সুষুম্না নাড়ী তাহাতে আলিঙ্গিতা—সেই বীজ যোনিদেশে সংস্থিত হইয়াছে; শরৎকালের সম্পূর্ণ উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ শোভান্বিত অথচ মহাতেজোবিশিষ্ট দীপ্তিমান্ রূপে সংস্থিত, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক; অথচ চন্দ্রকোটি সম সুশীতল, অতএব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, অথবা লং বং ঠং এতত্রয় একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুরভৈরবী দেবী, ঐ কামবীজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরম তেজঃস্বরূপ বীজসংজ্ঞাপ্রাপ্তা দেবী মূলাধারে ত্রিপুরা স্থিতি করেন।

ক্রিয়াবিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎ পরিতো ভ্রমৎ।
উত্তিষ্ঠদ্বিশতস্ত্বন্তঃ সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতম্।
যোনিস্থং তৎপরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংজ্ঞিতম্॥

ঐ বীজ ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বশরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করে; কখন ঊর্দ্ধে থাকেন, কখন লিঙ্গস্থ অধঃস্থিত জলে প্রবিষ্ট হন। অতি সূক্ষ্মস্বরূপ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট যোনিমণ্ডলস্থ পরম তেজঃস্বরূপ স্বয়ম্ভু-সংজ্ঞক লিঙ্গের অধিষ্ঠান।

তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই শক্তিই আমাদের জীবনী-শক্তি। এই শক্তিকে আয়ত্তীভূত করিতে পারিলেই এবং শক্তির সহিত শিবের অর্থাৎ আত্মার সংযোজনা করিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি হইবে।

শক্তিই জীবাত্মা,—কেননা বাসনাই শক্তি; কিন্তু এই শক্তি অতীব সূক্ষ্মশক্তি,—বা ইহা শক্তিকেন্দ্র; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে বলিতে-ছেন যে,—molecules দিয়া এই স্থূল বিশ্বশরীর সৃষ্ট, তাহাদের পশ্চাতে আরও সূক্ষ্মশক্তি এবং তৎপশ্চাতে সূক্ষ্মতম শক্তি বর্ত্তমান,—এক অদৃশ্য শক্তি তৎপরবর্ত্তী শক্তিপুঞ্জকে সজীবিত করিয়া রাখিয়াছে।"

এই শক্তিই প্রাণ,—সেই প্রাণের সংযমই প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম শিখিবার সহজ উপায়—

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরদৃষ্টো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি, স্তম্ভবৃত্তি,—প্রাণায়াম এই তিন প্রকার। দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণায়াম একপ্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প; অর্থাৎ প্রাণবায়ু যে

---

* The Unseen Universe P, P, 193, 196.

স্বাভাবিকরূপে সদা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, ক্রিয়া যন্ত্রবিশেষের দ্বারা সেই স্বাভাবিকীগতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য এক প্রকার নূতনভাবের অধীন করা।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে যে মুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মুদ্রাগুলি অভ্যাস না করিলে কি প্রাণায়াম অভ্যাস করা যায় না?

গুরু। প্রাণায়াম অভ্যাস না করিলে, মুদ্রাভ্যাস করা যায় না। আগে মুদ্রা অভ্যাস করা যায় না, মুদ্রা প্রাণায়ামেরই সাধন-বিশেষ; কিন্তু মুদ্রা অভ্যাস না করিয়াই কেবল প্রাণায়ামের দ্বারাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও ষট্‌চক্রের ভেদ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রথম হইতে যেরূপ ভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

গুরু। আগে যে আসনের কথা বলিয়াছি, সেইরূপ আসন করিয়া কোন নির্জ্জন এবং পুষ্প ধূপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত গৃহে উপবেশন করিবে; তৎপরে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিবে।

প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। "ওঁ" অথবা ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করাকে সগর্ভ প্রাণায়াম এবং মন্ত্রাদিহীন কেবল এক দুই এইরূপ সংখ্যা রাখিয়া প্রাণায়াম করাকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলে। "ওঁ" বা কোন বীজমন্ত্র সংযোগে যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহা অতি শীঘ্র ফলদায়ক হয়, আর নির্গর্ভ প্রাণায়ামে একটু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদের মন্ত্র সহযোগে প্রাণায়াম করিবার সুবিধা আছে, তাঁহারা তাহাই করিবেন, তবে যাঁহাদিগের সুবিধা নাই, তাঁহারা এক দুই তিন এইরূপ সংখ্যার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবেন; কিন্তু মন্ত্র বা সংখ্যা না রাখিয়া প্রাণায়াম করিলে, ফলপ্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয়,—অথবা ফল হয় না। কেন না—তালে তালে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ব্বায়ুং ধারয়েচ্চতুগুণৈঃ। রেচয়েচ্চ তদর্দ্ধেন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ। তদশক্তো তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্য সংযমঃ। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্ প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমা বিনা।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক বায়ুরোধ করিয়া "ওঁ" অথবা ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ু রোধ পূর্ব্বক "ওঁ" বা মূলমন্ত্র প্রথমবারে চতুর্গুণ অর্থাৎ চৌষট্টি বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ নাসাপুট হইতে তুলিয়া "ওঁ" বা মূলমন্ত্র বত্রিশ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমে বায়ু রেচন করিবে। বাম হস্তে কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবে।

এই ভাবে পুনরায় বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শ্বাস-ত্যাগের পর ঐ দক্ষিণ নাসা দ্বারাই পূর্ব্ববৎ "ওঁ" অথবা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুম্ভক ও শেষে রেচক করিতে হইবে। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথমবারের ন্যায় নাসা ধারণ ক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক করিবে।

প্রথমে যদি প্রাগুক্ত সংখ্যা জপ করিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে যথাক্রমে ৮।৩২।১৬ অথবা ৪।১৬।৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবে।

তোমাকে যে প্রাণায়ামের হ্রস্ব দীর্ঘ ও সূক্ষ্মের কথা বলিয়াছিলাম,—তাহা এই যে, শ্বাস প্রশ্বাসের অতি দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সূক্ষ্ম তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন যে শ্বাস, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

প্রাণয়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষের দ্বারা জানা যায়। প্রথমে তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তোমার পরিত্যাগ

করা শ্বাসবায়ু কতদূর পর্য্যন্ত যায়,—তুলা পিঁজিয়া খুব পাতলা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরে সরাইয়া দেখিবে, নিশ্বাসবায়ুতে উহা কতদূর পর্য্যন্ত নড়িতেছে। তাহাতেই হ্রস্ব-দীর্ঘতা জানা যাইবে। আর কুম্ভকের দীর্ঘ ও হ্রস্বতা জানিবার উপায় এই যে, কুম্ভককালে যদি জানা যায় যে, সর্ব্ব শরীরে বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে,—তবে তাহা দীর্ঘ; প্রাণায়ামের সর্ব্বত্রই দীর্ঘ ভাল, হ্রস্ব হইলে দীর্ঘ করিবে।

এইরূপ হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিবার উপায় "ওঁ" কার বা বীজমন্ত্রের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে দেহের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ ও বাহিরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই সমভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। প্রাণায়াম করিবার সময় মনে মনে ভাবিবে যে, "ওঁ"কার বা বীজমন্ত্র তালে তালে পূরকের সময় ভিতরে যাইতেছে, কুম্ভকের সময় তালে তালে শিরায় শিরায় স্নায়বীয় সমস্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, সমস্ত শরীরের মধ্যে পূরিত হইয়া ঘুরিতেছে, আর রেচকের সময় তালে তালে বাহিরে যাইতেছে।

এইরূপ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, ইহার ফলে প্রথমেই তুমি অত্যন্ত শান্তি বোধ করিবে।—প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিবে। সারাদিন খাটিয়া আসিয়া একবার প্রাণায়াম করিলে, অত্যন্ত বিশ্রামসুখ অনুভব করিবে—সে বিশ্রামসুখ জীবনে কখনও অনুভব করিতে পার নাই। তারপর, আরও অভ্যাসে তোমার মুখে জ্যোতিঃ ফুটিবে। শুষ্ক দাগ, চিন্তার রেখা তোমার মুখ হইতে দূর হইবে। গলার স্বর মোহন হইবে। যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিবে।

এইরূপে কিছুদিন প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, তারপরে আরও একটু উচ্চস্তরের কার্য্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকার দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু

আকর্ষণ করিয়া ফুসফুসে বায়ু পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ সময়েই স্নায়ুপ্রবাহ মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, যেন তুমি ঐ স্নায়ুপ্রবাহটিকে ইড়া নাড়ীর ভিতর দিয়া নিম্নদিকে নামাইয়া দিয়া, কুণ্ডলিনী শক্তির আধারভূত মূলাধারে সেই ত্রিকোণ পদ্মের উপর অতিশয় দৃঢ়রূপে আঘাত করিতেছ ; এইরূপ করিয়া পরে স্নায়ুপ্রবাহকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তদনন্তর কল্পনা কর যে, সেই সমস্ত স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহকে শ্বাসের সহিত অপর দিকে টানিয়া লইতেছ। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে বাহির করিয়া দিবে, এইরূপ প্রক্রিয়ার অন্তে আর একটি ব্যাপার আছে সেটী কুম্ভক।

অর্দ্ধরাত্রিকালে ঐ প্রকার ফুসফুসে বায়ু পূরণ করিয়া লইয়া উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে। ক্রমাভ্যাসে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে। প্রথমে ঝিল্লিরব (ঝি ঝি পোকা যেমন ডাকে) শুনিতে পাইবে। আরও কিয়দ্দিনের সাধনায় পরে ক্রমে ক্রমে বংশীরব, মেঘগর্জ্জন, ঝর্ঝরি (ঝাঝরী) বাদ্যের ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন, ঘণ্টাকাংস্য তূরী-ভেরী মৃদঙ্গ-আনক-দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে পাওয়া যায়। নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল বাদ্যশব্দ শ্রুত হওয়া যায়। তৎপরে, আরও অভ্যাসে, হৃদয়স্থিত অনাহত নামক চক্রের অভ্যন্তর হইতে অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও তাহা হইতে ঐ শ্রুত প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে। অবশেষে যোগী নয়ন নিমীলন অবস্থায় অন্তরমধ্যে সেই অনাহত পদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিবে। সেই দীপকলিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে যোগিজনের মনঃসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরমপদে লীন হইতে ক্ষমতা জন্মিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাহার।

শিষ্য। প্রত্যাহার কাহাকে বলে ?

গুরু। মহর্ষি পাতঞ্জল বলেন,—

স্ব-স্ব-বিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। ততঃপরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণে নিযুক্ত করার নাম প্রত্যাহার ; অর্থাৎ "চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় (সমাসক্ত হয়), তাহাদিগকে তদ্রূপ বাহ্যগতি (আসক্তিরূপ মুখ) ফিরাইয়া আনার বা তাহাদিগকে সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার।"

"সাধু হও" "আসক্তি পরিত্যাগ কর"—একথা বিশ্বময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। সকল দেশের সকলেই ভাবে,—"আমি সাধু হইব।" স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা সাধু হইবে, এ ইচ্ছাও সকলেরই ; কিন্তু তা হয় কৈ ? নিজেই বা সাধু হওয়া যায় না কেন ? তাহা জান কি ? ইচ্ছা আছে, তথাপি তাহা হয় না কেন ? দুদিন দশদিন—না হয় দুই মাস সাধু হইয়া থাকিতে পার, তারপর কোন এক অমঙ্গল-মুহূর্ত্তে একটি কামিনীর কটাক্ষশরে সাধুত্ব পরিহার করিয়া ফেলিতে হয় ; নয় ত টাকার প্রলোভনে, কি স্নেহের আতিশয্যে সাধুত্ব দূরীভূত হইয়া যায়। যাহা দ্বারা ঐরূপ না হইতে পারে, যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদিগের আসক্তি হইতে ফিরাইয়া আনা যায়, তাহাই প্রত্যাহার।

"অসৎকর্ম্ম করিও না, তাহা হইলে দুঃখ পাইবে"—এই কথাই আমরা শুনিতে পাই ; কিন্তু অসৎকর্ম্ম হইতে কি প্রকারে নিবৃত্ত

হওয়া যায়, তাহা কেহই কাহাকেও শিক্ষা প্রদান করেন না। "করিও না" বলিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকেন। "করিও না"র সঙ্গে যাহা করিবার উপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ কাজ হইত, প্রত্যাহার সেই উপদেশ।

যখন মন, ইন্দ্রিয়-নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই সমুদয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, মানুষ নিজ নিজ মনকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-নামধেয় কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করে এবং তাহার ফলে শেষে কষ্ট পাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্ববশে না থাকিলে, কেবল 'অসৎকর্ম্ম করিব না" এরূপ সামান্য ইচ্ছাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সমূহের দাসস্বরূপ,—তাহাদিগকে পাইলে উহাদিগের কোন জ্ঞান থাকে না। রূপ দেখিলে নয়ন ঝাঁপাইয়া পড়িবেই পড়িবে,—আকৃষ্ট হইবেই হইবে, সে আকৃষ্ট হইলেই মনও তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া মাতিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয় ত মনেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র। মনে কর, তুমি ঐ ফুলটি দেখিতেছ; বাস্তবিক ঐ ফুলের আকৃতি বাহিরে নাই; উহা কেবল মনে অবস্থিত। বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতিটিকে জাগাইয়া দেয় মাত্র—প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মনেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি যাহা তাহাদের সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের আকার গ্রহণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের ঐই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ নিবারণ করাই প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয়গুলিকে এইরূপ আকার ধারণ করিতে না দিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম করা হইবে, অর্থাৎ চিত্তে কোন প্রকার সংস্কারের দাগ পড়িবে না। মনে কর চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে,—

ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপ-রহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ সমর্পণ না করে, সেইরূপ যত্ন করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যাহাতে আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে,—তাহাই করার নাম প্রত্যাহার এবং ইহা অভ্যাসের নামই প্রত্যাহার-সাধনা। যাঁহাদের ভগবানে প্রেম হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই একমুখ হইয়া ভগবানের অনুগত হইয়াছে,—তাঁহাদের তাহাই প্রত্যাহার।

শিষ্য। প্রত্যাহার সাধনায় যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, তাহা বলুন?

গুরু। দৃঢ় বিশ্বাসে ইহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। মেস্‌মেরিজিয়মে রোগ আরোগ্য করিতে দেখিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ, দেখিয়াছি।

গুরু। কোন্ শক্তিবলে তাঁহারা রোগ আরোগ্য করেন, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি,—স্থূল কথা—দুঃখ, কষ্ট, অশুভ একেবারেই ঐ বিদ্যায় অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াই ঐরূপ করিতেছেন। বশীকরণ বিদ্যাবিদ্‌গণও (Hypnotists) পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সদৃশ উপায় অবলম্বনে ইঙ্গিতবলে (আজ্ঞা, Hypnotic suggestion) কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাদের বশ্য ব্যক্তিগণের ভিতরে একরূপ অস্বাভাবিক প্রত্যাহার আনয়ন করেন, তাঁহাদের কথায় ইহাকে সচরাচর বশীকরণ-ইঙ্গিত বলা যাইতে পারে, এই বশীকরণ-ইঙ্গিত কেবল বিশ্বাসের অভ্যাসেই সাধনা হয়।

গুরুর নিকটে প্রত্যাহারের এই বশীকরণ-ইঙ্গিত লাভ করিয়া

চিত্তকে দৃঢ় করিতে হয়, আর অভ্যাসে স্থির করিতে হয়; রূপ গ্রহণ করিয়া আমি কি করিব? রূপ আমার নিজেরই আছে,—রূপের অনন্ত আধার ভগবান্ আমার হৃদয়ে। ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমুদয় সেই স্থলেই মিলে; ইহা কঠোর বিশ্বাস ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাসের ফল, এই অভ্যাসের ফলেই মেস্‌মেরিজম্, হিপ্‌নটিজম্ প্রভৃতি বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে।

প্রত্যাহার সাধনা বিশ্বাসের সহিত চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতার কাজ। চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপ দেখিলে, কিন্তু তাহাকে রূপাকারে পরিণত হইয়া মনের নিকট আসিতে দেওয়া হইবে না,—এইরূপ, দৃঢ় বিশ্বাস অভ্যাস করার নামই প্রত্যাহার-সাধনা। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে। কিছুদিন পরে যখন ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির রাখিতে পারিবে,—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের অনুবর্ত্তী হইবে। যখন ঐরূপ হইবে, তখন তুমি চিত্তকে যেমন ইচ্ছা, তেমনই ধৃত ও স্থির করিতে পারিবে। চিত্ত যখন তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে, কোন প্রকার রূপ তখন আর তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিবে না,—কোন প্রকার শব্দ তখন তোমার কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না,—এইরূপ সর্ব্বত্র।

প্রত্যাহারপরায়ণ যোগী প্রকৃতিকে চিত্তের বশে আনয়ন করিয়া পরম স্থৈর্য্যলাভ করিবেন; ইহাতেই বহিঃপ্রকৃতি বশীভূতা হইবে। তখন প্রকৃতি সেই প্রত্যাহার-পরায়ণ যোগীর নিকট আপনার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দিবে; তিনি প্রকৃতি এবং প্রকৃতির জড়, অজড়, চেতন, অচেতন সমস্ত ক্রীড়াপুত্তলী করিয়া লইয়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারী এই প্রত্যাহার-সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বপ্রকারে রমণীর আকর্ষণ হইতে ইন্দ্রিয় ও মনকে দূরে রাখিতে সক্ষম হইবেন, চিত্তশুদ্ধি জয় হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধারণা।

গুরু। ধারণা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ় হয়।

শিষ্য। কিসের ধারণা? ধারণাই বা কি?

গুরু। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধ করার নাম ধারণা।

শিষ্য। চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধ কিরূপ—তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। রাগ দ্বেষাদি শূন্য ও চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করার নাম ধারণা। এইরূপে ধারণা দৃঢ় হইলে, চিত্ত আর কাম-ক্ষুধায় আকৃষ্ট হয় না। পার্থিব লালসা-বাসনাতেও মন আর ঘুরিয়া বেড়ায় না।

শিষ্য। কি প্রকারে উহার সাধনা করিতে হয়?

গুরু। চিত্তকে বিষয়ান্তরচিন্তা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক তাহাতে বাঁধিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে এক বস্তুতে চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই চিত্ত একমুখী হইবে,—ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাকেই ধ্যানে পরিণত করিতে হইবে।

প্রথম প্রথম একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া একরূপ ধারণা করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথম দুই মিনিট, তারপরে চারি মিনিট, তারপরে পাঁচ মিনিট

—এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিবে,—দিবারাত্রির মধ্যে চারি পাঁচবার এইরূপ করিবে।

আমাদের জীবন-সমুদ্রের স্বর্গ-তরণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্রহ্মচর্য্য যোগ সম্বন্ধে যে অমৃতবাণী ডাকিয়া—বলিতেছেন,—মনঃসংযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ ও পালন করিও। ঐ শুন জলদগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইতেছে,—

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃশনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

সঙ্কল্প-সমুৎপন্ন কামনা সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে —অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চলস্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে বশীভূত করিবে।

কার্য্য-কারণাত্মক হেতু প্রয়োজন ও ইচ্ছার সমবায়কে সঙ্কল্প বলা যাইতে পারে। এই সঙ্কল্পের ফল যে কোন কার্য্যসিদ্ধি,—যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার সঙ্কল্প—ইহার হেতু রসনা তৃপ্তি, প্রয়োজন শরীর পোষণ, ইচ্ছা —আনন্দলাভ, এই সমুদয়ের সমবেত শক্তিতে যে কামনা উদ্ভূত হয়, সেই কামনাকে নিঃশেষিত করিতে হইবে। কেননা, যথার্থ কামনা পরিত্যাগ করিতে হইলে, সঙ্কল্পজ কামনা পরিত্যাগই পরিত্যাগ। প্রয়োজন জ্ঞান কিছুতেই না থাকিলে, তবেই যথার্থ কামনা দূর হইবে, তবে অভ্যাসের

দ্বারা তুমি তাহা করিবার চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় বড় বিষম পদার্থ। অন্তঃকরণকে সে বিষয় বোধ করাইয়া তাহাকে স্ববশে আনিয়া বড় উচ্ছৃঙ্খল—বড় আকুল করিয়া তুলে। বলবতী চেষ্টায় তুমি যাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তাহারা তার শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। যাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি সুখী হইবে ভাবিয়াছিলে, তাহাই আবার আসিয়া জুটিল। অতএব অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে।

মনের অপর নামই অন্তঃকরণ। যেহেতু ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আন্তরিক ক্যর্য্যে মন স্বাধীন এবং বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় পরাধীন। আর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হয়, অথবা যাহাদিগকে লইয়া কার্য্য করা যায়, তৎসমুদয়ের নাম বিষয়। ঐ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণে অর্পিত হইলে সেই পূর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন তাহাদিগের দোষ ও গুণ বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মনের সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনপ্রকার যে গুণ আছে, সেই সকল গুণদ্বারা মন বিকৃত হয়, বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি মনের সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক প্রযত্ন ইত্যাদি মনের রজোগুণের বিকার। কাম, ক্রোধাদি দোষবিশিষ্ট মনই পাপকার্য্য করে; মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনো ভূত্বা ন পুণ্যৈর্নচ পাতকৈঃ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

কেন না, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের জ্ঞানমাত্র মনের কাছে লইয়া পঁহুছাইয়া দেয়; মনই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে গীতায় বলা হইয়াছে, অন্তঃকরণের দ্বারায় ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিতে হইবে। তাহার

ভাবার্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়গণ কেবল বিষয়ের বোধ আনিয়া মনের কাছে উপস্থিত করে,—এইমাত্র; ইন্দ্রিয়গণ কিছু নিজে নিজে বিষয় উপভোগ করে না। তবে তাহারা বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি দেখিলে মাতিয়া উঠে, তাহার উপরে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া তাহাদিগের জ্ঞান টানিয়া মনের কাছে পঁহুছাইয়া দেয়; কিন্তু মন যদি তাহা গ্রহণ না করে, তবে তাহারা কি করিবে? দশদিন যদি তাহাদিগকে এইরূপে প্রত্যাহার করা যায়, তবে তাহারা বিষয়ে উদাসীন হইয়া যাইবে। যাহার জন্য আনয়ন করা, সেই যদি তাহা গ্রহণ না করিল সেই যদি তাহাতে প্রীতিলাভ না করিল, তবে কাহার জন্য কি করা? তুমি তোমার পুত্রের জন্য রসগোল্লা আনিলে, সে যদি তাহা না খায়, তবে তোমার আনিবার কখনই প্রয়োজন হয় না। অতএব অন্তঃকরণের দ্বারায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে বুঝিতে হইবে, অন্তঃকরণ তাহাদিগের সমানীত বিষয়জ্ঞান গ্রহণ করিবে না। অন্তঃকরণ জানিবে,—উহারা যাহা আনিয়া দিতেছে, তাহাতে আমার অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই,—কাচ দিয়া আমাকে কাঞ্চন হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সহজ পাত্র নহে, তাহারা সহজে ছাড়িবার নহে। বড় সাবধানে—বড় সতর্কতায় তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ॥

ইন্দ্রিয় স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিলে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ॥

ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে রাগ দ্বেষাদিরূপ দোষ সকল প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥

যেমন সারথি অশ্বগণের নিয়ামক হয়, সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তিগণ আকর্ষণকারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে (দমনে) যত্নবান্ হইবেন।

রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টমাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।

তৈরপ্রমত্তঃ কুশলৈঃ সদশ্বৈর্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত (বশীকৃত) সদশ্ব-সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন।

যন্নামাত্মনি মুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম্।

যো ধীরো ধারয়েদ্রশ্মীন্ স স্যাৎ পরমসারথিঃ ॥

যে বীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ এবং যিনি একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।

ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥

যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য বিধেয়।

ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিলে, মানব কিছুতেই শান্তচিত্ত হইতে পারে না। অতএব অন্তঃকরণের দ্বারাতেই অন্তঃকরণাধীন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবে।

শিষ্য। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না,—ইহার ভাবার্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। পূর্ব্বে শুনিয়াছ, অন্তঃকরণ বা মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে,—কি প্রকারে তাহা হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে,—কিন্তু মন সে কথা শুনিবে কেন? মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়, কিন্তু মনই যে আর একটি ইন্দ্রিয়,—সে যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় উপভোগ করিতে ভালবাসে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার পুত্রের জন্য তোমার রসগোল্লা আনা; কিন্তু সে যদি তাহা খাইতে না চায়, তবে তুমি অবশ্য তা আর আন না; কিন্তু বালক রসগোল্লার লোভ ছাড়ে কি? এদিকে নিত্য বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়া তাহার যদি অসুখের কারণ হয়, তবে তাহার মাতা তাহাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিলে, সে রসগোল্লার আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া, স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না,—আত্মা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্ব রসের আধার—ক্রমে ক্রমে মানবকে তাঁহাতে লিপ্ত করাইতে পারিলে, মন বিষয়-সুখ ভুলিয়া যাইবে। সে তখনই সেই চিদ্ঘনানন্দে নিরত হইবে,—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সমানীত বিষয় সুখে কখনই আকৃষ্ট হইবে না। মনে কর, তুমি সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছ, এতদবস্থায় একটা গর্দ্দভ ডাকিয়া উঠিলে, তাহাতে তোমার বিরক্তিই ঘটিয়া থাকে,—কখনই সে দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখ,—দুঃখশূন্য সুখ আত্মানন্দ উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে, মন আর কখনই জড় প্রকৃতির বিষয়-সুখে আকৃষ্ট হইবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জপ।

গুরু। আর একটি অতি সহজ ও সংক্ষেপ উপদেশ তোমাকে প্রদান করিব। নিত্য ইহার অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সংযম, প্রাণ স্থির, দেহ সুদৃঢ় ও চৈতন্যের বিকাশ হইবে—এবং ইষ্টদর্শন প্রভৃতি ঘটিবে। ইন্দ্রিয়ের নিকৃষ্ট ক্ষুধা, শারীরিক জড়ালস্য ও সর্ব্বাপদ বিদূরিত হইবে।

যিনি যে মন্ত্রের উপাসক, ত্রি-সন্ধ্যা সেই দেবতার রূপ ধ্যান সহকারে সেই দেবতার মন্ত্রজপ করিলে, প্রাগুক্ত ফল লাভ হইবে।

শিষ্য। আমার বোধ হয়, অনেকেই তাহা করিয়া থাকে। কিন্তু সাফল্য লাভ কয়জনে করিয়া থাকে।

গুরু। ঐ জপ ব্যাপারে একটু নিয়ম আছে। অনেকে তাহা অবগত নহেন বলিয়া, সাফল্য লাভে সক্ষম হইতে পারেন না। আমি তাহা বলিয়া দিতেছি। এইরূপ ভাবে ত্রিসন্ধ্যা জপ করিলে, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ও প্রাণসংযম এবং ইষ্টদর্শন ঘটিয়া থাকে।

প্রতি সন্ধ্যাতে চারিশত বত্রিশবার জপ করিবার নিয়ম করিবে। করাঙ্গুলীতে বা মালাদ্বারা জপ করিবে।

মলমূত্র ত্যাগের উদ্বেগ সত্ত্বে জপ করিতে নাই। মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, মুখ-দৌর্গন্ধযুক্ত হইয়া জপ করা নিষিদ্ধ।

জপের সময় আলস্য, হাইতোলা, আড়ামোড়া করা, নিদ্রার্ত্ত হওয়া, হাঁচি বা থুথু ফেলা ভয়ার্ত্ত হওয়া বা নাভির নীচে যে কোন স্থান স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

মনঃ সংহৃত্য বিষয়াৎ মন্ত্রার্থগতমানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকপঙ্‌ক্তিবৎ॥

চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মন্ত্রের অর্থে (যে দেবতার মন্ত্র বা নাম জপ করিবে, সেই দেবতার) নিমগ্ন রাখিয়া দ্রুত না হয় ও বিলম্বিত না হয় এরূপ ভাবে মুক্তাপংক্তির ন্যায় একে একে জপ করিবে।

এখন আর একটি কাজ করিতে হইবে। মন্ত্রটিকে (যাহার যে মন্ত্র বা দেবতার নাম) অনুমানে তিনভাগ করিয়া লইয়া যেমন রাম, (র —আ—ম) প্রতিবার জপ করিবার সময় মন্ত্রটি পূর্ব্বোক্ত ভাবে জপ করিতে করিতে একভাগে বাম নাসিকায় টানিবে, দ্বিতীয় ভাগে কুম্ভক করিবে, তৃতীয় ভাগে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসের সঙ্গে পরিত্যাগ করিবে। যতক্ষণ বিনা কষ্টে ঐরূপ রেচক-পূরক-কুম্ভক করিতে পারিবে, ততক্ষণ করিবে। প্রথমে যদি চারিশত বত্রিশবার জপ করিতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে, অভ্যাসে শেষে চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিবে। ইহাতেই বাহিরের বায়ু সংযত হইয়া প্রাণ সংস্থান হইবে। প্রাণায়ামাদি করিবার সমস্ত ফল ইহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বিষয়ীর পক্ষে—গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর পক্ষে জপ-যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ফলকথা সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাতা, সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ন্তা ও পাতা ভগবানে সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিলে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের নিকৃষ্ট ক্ষুধা নিবারিত হইবে এবং মানব জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণ।